যে যাই বলুক

এক

শেষ রাতের দিকে বৃষ্টি নেমে এল। অনেকক্ষণ ধরে হবার মতো বৃষ্টি। তামসী আরাম পেল খানিকটা।

লিচুগাছের তলায় তক্তপোষে শুয়ে যে-লোকটা থেকে থেকে দড়ি টেনে উপর ডালে-বাঁধা টিনের মধ্যে শব্দ করছিল সেও পাহারা ফেলে পালাল এবার। সমস্ত কেমন ঝাপসা হয়ে এসেছে—নির্জন, নির্ভয়।

না, বৃষ্টিটা একটু ধরুক। একটু আলো আসুক আকাশে। এখন কি অন্ধকার। ঘরের লণ্ঠনটাও নিবে গেছে তেলের অভাবে। আগে জানলে জল ঢেলে রাখত খানিকটা। ভাসা তেল জ্বলত কতক্ষণ।

ভয় পেয়ে চমকে উঠলো তামসী। অন্ধকার ছিল বলেই তো রক্ষে।

তবু একটু আলো আসুক। আগামী দিনের আভাস। কিন্তু, কতক্ষণ। ঘরে একটা ঘড়ি নেই যে শুনবে তার টিকটিক। পাখার একটা ঝাপটও শোনা যায় না যে পাখি এবার জাগবে। শুধু হৃৎপিণ্ডের শব্দ শোনা ছাড়া আর কিছু শুনতে পেলে সে বাঁচত।

উষসী শুয়েছে তার তক্তপোষে, তারই পাশটিতে। ঘুমে একেবারে কাদা হয়ে আছে। ঘরেই ওদিকের তক্তপোষে ছোট দুই ভাই-বোনের মাঝখানে কাকিমা শুয়ে। মাঝরাতে একবার ওঠেন, উঠেছিলেন, এখন ঠাণ্ডা পেয়ে ঘুমুচ্ছেন গা ঢেলে, আর শিগগির ওঠবার কথা নয়।

পাশের ঘরে কাকা। জেগে নেই নিশ্চয়ই। বিশেষ করে বৃষ্টিতে যখন আজ প্রাতর্ভ্রমণে বেরুনো যাবে না ক্যাম্বিশের জুতো পরে, একটু বেশিই হয়ত ঘুমোবেন। মন্দ কি, সেও একটু ঘুমিয়ে নিক না এরি মধ্যে। তখন থেকে দুচোখ একত্র করেনি। গা একবার ছেড়ে দিলেই সে তলিয়ে যায় দেখতে-দেখতে। কিন্তু ঘুমোবার কথা ভাবলেও তার ভয় করে। অথচ, বিছানায়, মশারির মধ্যে, গা গুটিয়ে শুয়ে থাকাও অসহ্য।

এই তক্তপোষের কত অসুবিধে এত দিন চোখে পড়েনি তামসীর। প্রথমত, পায়াগুলি যথেষ্ট উঁচু নয়, যদিও থাক-দেয়া ইঁটের উপর বসানো। দ্বিতীয়ত, বাক্স-প্যাটরা থেকে সুরু করে ইঁদুর-আরশুলা কী নেই ওর নিচে! ওখানটায় ঝাঁট পড়ে না বলে কাকিমা যে গজগজ করে, মিথ্যে করে না।

রাস্তা দিয়ে দুটো লোক হেঁটে গেল মনে হল। বৃষ্টির বাধা মানেনি এমন কোনো জরুরি কাজ। হয়তো যাচ্ছে ওপারের নৌকো ধরতে, কিম্বা ডাক্তার বা শ্মশানযাত্রীর খোজে—ক'দিন ধরে কলেরা লেগেছে এ-পটিতে। নিশ্চয়ই ছাতা আছে, নিশ্চয়ই চাষাভূষো ক্লাশের লোক, কি না সয় ওদের! তা সো'ক বা না সো'ক, এ কাজটা কি আরো বেশি জরুরি নয়? তামসী ধড়মড় করে উঠে বসল, মশারির বাইরে এসে তাকালো জানলা দিয়ে।

না, মিইয়ে এসেছে বৃষ্টি। এলো বাতাস জোরে বইছে, গাছগুলি নুয়ে-নুয়ে পড়ছে। জল দাঁড়িয়েছে ঢালু মাঠে, জল বোঝা যায় শাদা-শাদা। বৃষ্টিধোয়া সবুজের আমেজ লাগল চোখে। তবে কি ভোর হল? তবে কি—

কিন্তু এরা—এরা কারা?

কাউকে কিছু জিগগেস করবার আগেই যোগীশ্বর—তামসীর কাকা—কাছা ও কোঁচার সীমানা ঠিক করবার উদ্ভ্রান্ত চেষ্টা করতে-করতে পাশের ঘর থেকে চলে এলেন এ-ঘরে। নিচু গলায় বলে উঠলেন: 'কি সর্বনাশ, পুলিশ—পুলিশ বাড়ি ঘিরেছে। শুনছ, শুনছিস—পুলিশ।'

সবাই ঘুমে বিভোর, নিঃসাড়। তামসী গায়ে চাদর টেনে কুণ্ডলী পাকিয়ে, আর তার কাকিমা, বিলাসবতী, ছত্রাকার হয়ে, গ্রাসের চেয়েও বড় হাঁ করে।

পরামর্শ যদি কেউ দিতে পারে তো তামসীই—বাড়ির বড় মেয়ে। তাই যোগীশ্বর তামসীর মাথায় ঠেলা মেরে বললেন, 'ওঠ শিগগির। পুলিশ!'

হতভম্বের মত মুখ করে তামসী উঠে বসলো 'পুলিশ? সে কি? কেন?'

আগাপাস্তলা লেশমাত্র কারণ খুঁজে পেলেন না যোগীশ্বর। কি করবেন, কি লুকোবেন বা কোথায় লুকোবেন, কিছুই তাঁর মাথায় এল না। মক্কেলের টাকা মেরেছেন কিংবা গেছেন স্টেশনের কাছে পাড়াটায় এমন কথা বলে কার সাধ্য?

কতক্ষণ পরে দরজায় ঘা পড়ল। যোগীশ্বর ছুটে গেলেন বাইরের ঘরে। নিশ্বাস বন্ধ করে উৎকর্ণ হয়ে বসে রইল তামসী। কাটা-কাটা শুনতে পেল কথা:

'আমরা সার্চ করবো এ বাড়ি।'

'সার্চ?'

'হ্যাঁ, ওয়ারেণ্ট আছে।'

'কেন, হয়েছে কি?'

'বাড়ির মধ্যে লোক আছে।'

'লোক? চোর-ডাকাত?'

'তার চেয়ে বেশি।'

'সে কি? কোথায়?'

'তাই তো দেখতে এসেছি। এ-ঘরে তো নেই দেখতে পাচ্ছি।'

'অসম্ভব। ঢুকল কি করে? পাঁচিল টপকে?'

'না।'

'তবে?'

'তাকে দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে।'

নিচু তক্তপোষে ছেঁড়া পাটি পাতা, তার উপরেই একটা বেবার্নিশ উইয়ে-খাওয়া আলমারি, বই নেই একখানাও, শুধু কতগুলো চেয়ে-পাওয়া আদালতের ফর্ম, কাঁঠাল-কাঠের হলদে রঙের একটা বাক্স, তার উপরে লেখবার সরঞ্জাম, জং-ধরা টিনের প্লেটে চিনে-মাটির দোয়াত আর নিবহীন দুটো হ্যাণ্ডেল, আর ওধারে নড়বড়ে একটা বেঞ্চি—এই যোগীশ্বরের বৈঠকখানা।

'ওটা কার ঘর?'

'ওটাতে আমি শুই।'

'চলুন।'

ছোট ঘর। মামুলি। এটাই শুধু লক্ষ্য করবার যে পরনের কাপড় বিছানায় ফেলে রেখে বিছানার চাদর জড়িয়েই উঠে এসেছেন যোগীশ্বর।

'ওটা কার ঘর?'

'মেয়েরা শোয় ওটাতে।'

'ওটাতে ঢুকব।'

'সরে যেতে বলব মেয়েদের?'

'না। মাপ কববেন। কেননা মেয়ে সেজে সেও সরে পড়তে পারে এই সুযোগে।'

বিলাসবতী ভযে কুঁকড়ে বসে আছে মশারির মধ্যে। তামসী চলে এল মশারির বাইবে, নেমে পড়ল তক্তপোষ থেকে। নামবার আগে উষ্ণীষ শোযাটা সংশোধন কবলে।

পাযের শব্দ পেবিয়ে এল চৌকাঠের সীমানা। প্রলয়ংকর ঝড়ের পূর্বাভাস। তামসী আব তামসীতে নেই। আশিবপদনখ সে হিম।

অনেকটা হালকা বোধ কবল সে, যখন রণধীর নিজেব থেকেই বেরিয়ে এল তক্তপোযেব নিচে থেকে। শ্রান্তিতে একটু তার ঝিমুনি এসেছিল হযত, দুই চোখে চমকে আছে সে তন্দ্রা। ভেজা জামা-কাপড শুকোযনি এখনো, গাযে কাদা লেগে আছে লেপটে। চুল ধুলোমাখা উসকোখুসকো, পাযে জুতো নেই, সর্বাঙ্গ অবসাদে ভাবী।

'এই যে, গুড মর্নিং।' অভিবাদিত হল রণধীর।

রণধীর চোখ নামাল। পবে বললে প্রতিবাদেব সুরেঃ 'যাক, এ-ঘবে ঢুকে মেযেদেবকে আব বিপন্ন কবতে হবে না। আমি নিজেই ধরা দিচ্ছি।'

'ধন্যবাদ। কিন্তু মেযেদেবকে সত্যি কে বিপন্ন করলে, রণধীরবাবু?'

রণধীর কথা বলল না। নিশ্চেষ্টভাবে হাতে পরাতে দিল হাতকড়া।

যোগীশ্বর একেবাবে ঊর্ধ্বনেত্র। ভীত, মূঢ়স্ববে প্রশ্ন করলেন, 'এ কে?'

'চেনেন না? আশ্চয।'

'না, চিনবো কোত্থেকে।'

'একজন রাজনৈতিক আসামী। ডাকাতি কবে ফেবাব হয়েছে।'

'সে এখানে কি ক'বে?'

হাসল পুলিশের লোক। অনেক অভিজ্ঞতায় ঘষা সেই হাসি। বললে, 'আপনার মেয়ে খুলে দিয়েছে তাকে দরজা।'

একত্রিত একটা দৃষ্টি তামসীর গায়ের উপর এসে পড়ল ক্লেদাক্ত স্পর্শের মত। পরনের কাপড়টা পর্যন্ত মনে হল অশুচি। দেয়ালের সঙ্গে চাইল সে মিশে যেতে। মনে হল দেয়ালটাও যেন তাকে আশ্রয় দিতে অসম্মত।

বিলাসবতী দুই চোখ পাকিয়ে দৃঢ়বদ্ধ চোয়ালে তাকিয়ে রইল ঘাড় ফিরিয়ে আর উষসী উঠে বসে কাঁদতে সুরু করল।

'আপনাকেও যেতে হবে আমাদের সঙ্গে।' তামসীকে লক্ষ্য করে বললে পুলিশের লোক।

বিলাসবতী নড়ে-চড়ে বসল। ভাবখানা এই : আপদ যায়, বাবা। আর যোগীশ্বর মুখের এমন একখানা চেহারা করলেন যার সোজা তর্জমা হচ্ছে, পুলিশ এমনতর খারাপ মেয়েকে কেন সম্ভ্রম করে কথা কইছে, কেন ঘাড়ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় বার করে দিচ্ছে না?

পুলিশ মোটামুটি এই বিবরণগুলো সংগ্রহ করলে

প্রথমে যোগীশ্বর। নাম যোগীশ্বর দত্ত, বি-এল। বয়েস সাতচল্লিশ। এখানকার নিম্নতম আদালতে ওকালতি করেন। ষোলো বছর। এর আগে মাস্টারি করেছেন দাউদকান্দি আর ডুমুরতলায়। তামসী তাঁর ভাই-ঝি, বড় ভাইর মেয়ে। বড় ভাইর নাম মহীশ্বর, এখানকার হাইস্কুলে হেডমাস্টার ছিলেন। চার বছর মারা গেছেন। থাকলে বয়স হত এখন উনপঞ্চাশ। হ্যাঁ, তামসীই তাঁর বড় মেয়ে, উনিশ বছর, আগে ছেলে হয়ে মারা গেছে দুটি। উষসী তার ছোট বোন, তিন বছরের ছোট। আর, উষসীর বয়েস যখন তিন তখনই তাদের মা মারা যায়। দাদা আর বিয়ে করেননি। মেয়েদুটোকে কোলে-পিঠে

করে মানুষ করছিল যোগীশ্বরের স্ত্রী, শ্যামালতা। তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী। সেও গত হয়েছে ছ বছর হল। দাদা মাথার উপর, তাঁর কথা অশ্রদ্ধা করা যায় না, যোগীশ্বর আবার দারার দ্বারস্থ হলেন। আর এটিই বিলাসবতী। তাঁর আগের পক্ষের সন্তানের মধ্যে দুটিমাত্র আছে জগৎ আর যোগমায়া, বাইশ আর আঠার। জগৎ এখানে মিউনিসিপ্যালিটির কেরানি, পঁচিশ টাকা মাইনে, আর যোগমায়ার বিয়ে হয়েছে এই দু'বছর, জামাই রোড-সরকার—

'জগৎ—জগৎ কোথায়?' নতুন কোনো হদিস পাবার সম্ভাবনায় পুলিশের লোক উৎসুক হয়ে উঠল।

জগৎ বাপের থেকে ভিন্ন। খায় আলাদা, আয় আলাদা। ঘাড় কামায়, লুঙ্গি পরে, বিড়ি ফোঁকে।

'আপনার নিজের মেয়ের আগে বিয়ে দিলেন বাড়ির বড় মেয়ে থাকতে?'

যোগমায়া ভাল দেখতে যে। সে প্রায় ফর্সার কান ঘেঁসে, দস্তুরমত সুশ্রী। আর, তামসী, দেখতেই পাচ্ছেন, কালো আর কাঠখোট্টা। দাদা পণ্ডিত ছিলেন, বেছে-বেছেই নাম রেখেছিলেন তার. ডাকতেনও মসী বলে। আর, কি রকম ঢেঙিয়েছে তালগাছের মত। এতখানি দৈর্ঘ্য একটা নির্লজ্জ উদ্ধতি। প্রথমে দেখান হয়েছিল তামসীকে, এক নজরেই খারিজ হয়ে গেল। পরে ছানি করা হল যোগমায়াকে দিয়ে। যেন লুপ্তোদ্ধার হয়েছে। এমনি ভাবে তাকে লুফে নিলে।

'যাক, রণধীর কেন এ বাড়িতে এল তার কিছু হদিস দিতে পারেন? চেনেন না তাকে? দেখেন নি কোনোদিন?'

যোগীশ্বর তামা-তুলসী ছুঁয়ে বলতে প্রস্তুত, না, দেখেননি; না, চেনেন না। এই প্রথম দেখছেন, নাম শুনলেন প্রথম।

ডাক পড়ল তামসীর। লজ্জায় অধোমুখ হয়ে ধীর পায়ে কাছে এসে দাঁড়াল।

নাম শ্রীতামসী দত্ত। আসছে শ্রাবণে উনিশ বছর পূর্ণ হবে। চার বছর আগে, বাবার মারা যাবার বছর ম্যাট্রিক পাশ করে সে প্রাইভেটে। বাবার ভারি ঝোঁক ছিল মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার। তাই তিনি গত হলেও তাঁরই ইচ্ছার প্ররোচনায় সে ঢুকেছিল গিয়ে কলেজে, রাজসাহিতে। থাকত ঘোড়ামারায়, তার দূরসম্পর্কের মামাবাড়িতে। মামা সাবরেজেস্ট্রি অফিসের কেরানি। তাঁর বরং সাশ্রয়ই হচ্ছিল তামসীকে আশ্রয় দিয়ে। কেননা বাবা লাইফ-ইনসিয়োরের টাকা থেকে মাসিক ত্রিশ টাকা করে নির্ধারণ করে রেখেছিলেন তামসীর পড়া-খরচের জন্যে। একবছরের মধ্যেই সে-টাকা কাকার হাতে পটল তুললে, এসে পৌঁছুলনা আর মামাবাড়ির মাসোহারা। অর্ধপথে পড়া শেষ করে তামসী ফিরে এল পাততাড়ি গুটিয়ে। খোলস বদলে ফেলল মুহূর্তে। হয়ে দাঁড়াল সংসারের একটা সামান্য চাকরানি। আর, কাজ হল বারে-বারে উঠে শাড়ি বদলানো আর একের পর এক পাত্রীসন্ধানী পুরুষের চোখের সামনে নিজের চেহারার প্ল্যাকার্ডটা যতদূর সম্ভব বড়-বড় হরফে মেলে ধরা!

'রণধীরের সঙ্গে আলাপ হল কোথায়?'

রাজসাহিতে। মামাবাড়ির পাশের বাড়িতে ছিল আস্তানা। ওটা কার বাড়ি তা সে জানেনা। কারু বাড়িই বা কিনা, না, একটা অস্থায়ী মেস তারো সে খোঁজ নেয়নি। সবাইর মধ্যে থেকে চোখ পড়েছিলো শুধু রণধীরের উপর।

'কে, লাভার বুঝি?'

চাবুকের মত কথাটা এসে লাগল তামসীর মুখের উপর। ফুটতে লাগল শরীরের রক্ত।

'কিন্তু ও বাড়িতে ঢুকল কি করে ?'

তা তো পুলিশের জানাই। হ্যাঁ, তামসীই খুলে দিয়েছিল দরজা। তখন প্রচুর বৃষ্টি, যখন খোলা জানলার ওপারে দাঁড়ায় এসে রণধীর। বললে, অত্যন্ত বিপন্ন, রাতটার জন্যে একটু আশ্রয় চাই। দিগ্বিদিক না তাকিয়ে খুলে দিল সে দরজা, এমনি অলঙ্ঘ্য বুঝি সে-ভিক্ষা। চক্ষের পলকে ঢুকে পড়ল সে তক্তপোষের তলায়। আশা ছিল হয়তো পশ্চাদনুসারীরা পথের খেই হারাবে। আর, বৃষ্টিটা একটু ধরলে এক ফাঁকে বেরিয়ে পড়তে পারবে হয়তো অকণ্টক রাস্তায়। কিন্তু আকস্মিক হোঁচট খাবার জন্যেই তো জীবনের পথ-চলা।

এমনিতেই যথেষ্ট কালিমালিপ্ত ইতিহাস। তবু অভিভাবকের নৃশংসতা তৃপ্তি পাচ্ছিল না। আরো একটু কলঙ্কের তুলিকাপাত না করলে যেন যথার্থ সঙ্গতি থাকে না। তুলাদণ্ডে বিরুদ্ধ যুক্তির পরিমাণ নেবার সহিষ্ণুতা নেই। কল্পনাটাই মনোরোচক। তামসী অবাক হল না, নিজের দৈহিক অলাবণ্যকে শতজিহ্বায় সে ধিক্কার দিতে লাগল।

এবার পালা রণধীরের।

স্ফারবক্ষ, বলদর্পিত যুবক। বয়েস চব্বিশ-পঁচিশ।

ঘরে ঢুকেই বললে তীব্রকণ্ঠে, 'আমার কিছুই বলবার নেই।'

ইতিমধ্যে ভোর হয়ে গেছে। পুঞ্জিতপত্র গাছে-গাছে পাখিদের কিচির-মিচির, আর রাস্তায় ফিসির-ফিসির সমাগত জনতার। ভোরের ট্রেনটার সিটি শোনা যাচ্ছে দূর থেকে। কাঁচা হাটের মাল চলেছে চুপড়িতে করে।

তার একখানাও শাড়ি নেই সম্ভ্রান্ত, তাই তামসী অনুমতি পেয়ে গিয়েছিল একখানা শাড়ি চাইতে বিলাসবতীর কাছে। বিলাসবতী কাংস্যঝংকৃত হয়ে উঠল : 'এ কি তুই অভিসারে যাচ্ছিস নাকি ? যেমন

চরিত্রের ছিবি তেমনি চামড়াব, তেমনই তো হবে উপবকাব চটকের। যা, ঢের দেখিয়েছিস, আব শাড়ি দেখাতে হবে না। যদি ফিবে না আসিস, মাঝখান থেকে আমাব শাড়িখানাই মাবা যাবে।'

গরুর গাড়ির উপবে গাড়ি চলে না বাস্তায। থানাটা দূববর্তী নয, সুতরাং চলল সবাই পাযে হেঁটেই। পিছু নিল একটা চলমান জনতা। সর্বাঙ্গে বিঁধতে লাগল তামসীকে। তামসী ভাবতে চেষ্টা করল সে পাপ করেনি, কিন্তু জনচক্ষু তাকে তাব অবকাশ দেবে না। দেখাতে চায সে এক, লোকে দেখবে অন্য।

দুই

দিনের হিসেব একমাত্র উষসীই রেখেছিল। একদিন উৎকণ্ঠা আর সংবরণ করতে পারলে না, বললে বিলাসবতীকে, 'পনেরোই তারিখে দিদির বছর পুরবে, কাকিমা। কাউকে পাঠাবে না আনতে?'

বিলাসবতী ঝামটা দিয়ে উঠল: 'তুই যা না।'

সুপারিশ করতে গেল কাকার কাছে। যোগীশ্বর সংক্ষেপে বললেন, এমন যার কলঙ্কিত কাহিনী তাকে আত্মীয়ের মর্যাদা দিতে তিনি ইচ্ছুক নন।

তারপর গেল সে জগতের কাছে। বললে, 'পায়ে পড়ি দাদা, তুমি যাও।'

লুঙ্গি-পরা জগৎ বিড়ি টানতে-টানতে বললে, 'কোথায় তুই ওকে নিয়ে আসতে বলছিস? ঐ শুয়োরের খোঁয়াড়ে? মানুষ ওখানে বাঁচে কখনো? তার চেয়ে ছেড়ে দে ওকে। যেখানে খুশি চরে বেড়াক। উপায় একটা কিছু হবেই।'

'তুমি কি যে বলো—'

'ঠিকই বলি। সম্ভ্রান্ত সাজবার ভ্রান্তিটা অন্তত দূর হবে।'

'তোমার এখানে নিয়ে এসো না। আমরা দু'বোন তোমার কাছে থাকব।'

'হাঃ, বলে আমারই চলে না—' জগৎ হাত নেড়ে একটা নির্দয় ঔদাসীন্যের ভঙ্গি করলে।

দিদির গতগন্ধ পরিত্যক্ত বালিশে মুখ ডুবিয়ে উষসী ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

কিন্তু তামসীর চোখের কোণে এক কণাও জল এল না যখন দেখলে জেলের ফটকের বাইরে তার জন্যে কেউ নেই অপেক্ষা করে। সকালবেলা, যদিও রোদে ঝলমল করছে দিনের আরম্ভটি, তবু সে জানে না কোথায় আজ তার সন্ধে কাটবে। অচেনা শহর, পথঘাট কিছু জানা নেই। ঝাপসা-মতন মনে পড়ে তার দূরসম্পর্কের মামাতো বোন কল্যাণী এখানে থাকে, তার স্বামী এখানকার কলেজের কী প্রোফেসর। কাউকে জিগগেস করলে হয়। কিন্তু ভদ্রলোকের নাম সে ভুলে গেছে। কোনোদিন শুনেও ছিল বা কিনা মনে করতে পারল না।

তবে কি স্টেশনের দিকে যাবে? বাড়ির দিকের ট্রেন ধরবে? এক জেলখানা থেকে বেরিয়ে আরেক জেলখানায়? আবার সেই নিষ্প্রাণ নিত্যকৃত্য? অসম্ভব।

না, এগুনো যাক। এগোবার পথ আজ তার অসীম, অবন্ধুর। জেল থেকে যে বেরিয়েছে তার আর ভাবনা কিসের, বাধা কোথায়! আর কোথাও আশ্রয় না মেলে এই জেলই আবার তাকে আশ্রয় দেবে। সমস্ত পৃথিবী এখন তার হাতের আমলকী। সে এখন করতে পারে অনেক দুঃসাহসের কাজ।

কার জন্যে দুঃসাহস? নিজেকে জিগগেস করে তামসী। দেশের জন্যে—জবাব তৈরি করে ফেলে মনে-মনে। জবাব শুনে নিজেই সে হাসে। একটা ষড়যন্ত্রের গোঁজামিলে পড়ে ভারি তো এক বছর জেল খেটে আসা, তাতে কি এমন দুঃসাহস! কিছুই না, দেশের জন্যে

কিছুই সেটাকে করা বলে না, তবু অন্তরে-অন্তরে দেখতে পেয়েছে সে তার দেশকে, অনুভব করতে পেরেছে। এ-আলো শুধু আলো নয়, তার দেশের চক্ষু: এ-বাতাস শুধু বাতাস নয়, তার দেশের নিশ্বাস। এ ধুলো তার দেশের শ্মশানের ছাই।

'আপনিই কি তামসী দত্ত?' হঠাৎ দুটি সমবয়সী মেয়ে তার পথরোধ করে দাঁড়াল। দুটি চঞ্চল চক্ষু, লঘু পক্ষ।

তামসী ঘাবড়ে গেল: 'কেন বলুন তো?'

'আপনিই তো আজ জেল থেকে বেরিয়েছেন। কেমন, তাই না?'

জেল-কথাটা এদের মুখে কেমন যেন অন্য রকম শোনাল। অনেক আরাম পেল তামসী। বললে, 'হ্যাঁ।'

'ঠিক ধরেছি।' একসঙ্গে উৎফুল্ল হয়ে উঠল মেয়ে দুটি। দু'হাত দু'জনে চেপে ধরে বললে, 'আমরা আপনাকে অভ্যর্থনা করতে এসেছি। আমি দেবিকা সেন, আমি মানসী গুহ। রিলিজের সময়টা ঠিক পাইনি বলে দেরি হয়ে গেছে আমাদের।'

অভ্যর্থনা! তামসী চাইল একবার এর চোখের থেকে ওর চোখের দিকে।

দেবিকা আদুরে ঢঙে ঠেলা দিল মানসীকে: 'কি লো, মালাও তো একটা নিয়ে আসিসনি, শেষকালে গাড়িও একটা জোগাড় করতে পারবি না নাকি?'

'না, দরকার কি গাড়িতে!' তামসী বাধা দিল: 'যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানে যেতে পারব পায়ে হেঁটে। কিন্তু আগে বলুন, আপনারা কে, কি করে জানলেন আমাকে?'

'কি করে জানলুম! ও আমাদের জানতে হয়। যেমন মিউনিসি-প্যালিটির স্যানিটারি ইনস্পেক্টরকে জানতে হয় কার হল বসন্ত বা

কলেরা। আর আমরা কে যদি জানতে চান, তবে চলুন আমাদের সন্নিতিতে, এক পলকে পেয়ে যাবেন পরিচয়।'

'ঐ আসছে একটা গাড়ি।' মানসী বললে উৎসুক হয়ে: 'আশা করা যাক, সোয়ারী নেই।'

সোয়ারী থাকলেও ঘোড়ার গাড়িটা এদের দেখেই থামল। দেবিকা আর মানসী একসঙ্গে বলে উঠল: 'ভবদেববাবু।' পরে তামসীকে লক্ষ্য করে: 'হন নাকি তোমার কেউ?'

'হই বই কি।' ভবদেব গাড়ি থেকে নেমে এসে বললে, 'আমি হচ্ছি ওঁর কল্যাণীদির কর্ণধার।'

ভয়ে-ভয়ে তামসী তাকাল চোখ তুলে। একবার কোনোকালে দেখেছিল কিনা ভদ্রলোককে, লেশমাত্র মনে করা যাচ্ছে না। তবু যেন স্বস্তি পাওয়া যাচ্ছে তার মুখভাবে। ধীমান, সম্ভ্রান্ত চেহারা। যেন ঔদার্য আছে কপালে, চোখে। চিবুকে আছে স্নেহ। বয়েস কত হবে? কল্যাণীদি তার চেয়ে বছর পাঁচেকের বড। বত্রিশ-তেত্রিশ হবে হয়তো। কিংবা, আরো একটু কি বেশি?

তবু জনান্তিকে একবার জিগগেস করে নিল দেবিকাকে: 'চেনেন আপনারা?'

'চিনি বই কি। আমাদের মাস্টারমশাই।' দেবিকা ঝকঝকে দাঁতে হাসতে লাগল· 'চলুন, আপনাকে আমরা পৌঁছে দিয়ে আসি আপনার দিদির কাছে। খাঁটি করে দিয়ে আসি আপনার মন।'

ও রকম একটা বাজে প্রশ্ন করেছিল বলে এখন লজ্জা করতে লাগল তামসীর।

তিনজনের মধ্যে কে একা বসবে উলটো সিটে, যার পাশে ভবদেবকে বসতে হবে, এই নিয়ে দেবিকা ও মানসীর সঙ্গে তামসীর কপট একটা

হাতাহাতি হয়ে গেল আর সেই করস্পর্শের নিবিড়তা নিয়ে এল অন্তরঙ্গতার মাধুর্য।

এঁদো, নোংরা গলির একধারে ভবদেবের বাসা, ভাঙন-ধরা। বর্ণহীন, বিশৃংখল সংসার। চলেছে মারামারি, চেচামেচি, ঘেউঘেউ-ঘেউঘি। নিরানন্দ পরিবি। এই নিরানন্দতার মূলে হয়তো কল্যাণীর সন্তানভারক্লেশ, ফলে অস্বাস্থ্য, আর ভবদেবের আয়বর্ধনবিমুখতা—বাড়তি সময়টা সে আলস্য করে কাটাবে অথচ ছেলে পড়াবে না বা নোট লিখবে না বা করবে না আর কিছু ভাড়াটে কাজ। চিরন্তন অভাব থাকলে যা চেহারা হয় সংসারের, তার উপরে নিরন্তর আদর্শ-বোধের দ্বন্দ্ব। ভবদেবের কাছে সম্ভ্রম জিনিষটা চারিত্রিক, কল্যাণীর কাছে ঔপকরণিক। ভবদেবের কাছে অভাব একটা না থাকার ভাব, কল্যাণীর কাছে একটা সক্রিয় অস্তিত্ব। অন্যপক্ষে যেমন তাই অবিরত নালিশ, এ পক্ষে অনাবিল উপেক্ষা।

তবু দারিদ্র্যে যেন আর কোন রোমান্স নেই। শুধু তালির উপর তালি লাগিয়ে চলছে। ছোট ছোট স্বার্থের তালি। ছোট ছোট চিন্তার, ছোট ছোট কাজের। যেন মুক্তি নেই, ভবিষ্যৎ নেই, পিনের মুখ যেন পড়ে গিয়েছে ভাঙা গ্রামোফন-রেকর্ডের ফাটের মধ্যে।

এমনিতর মেঘলা আকাশে রোদের ঝলস আনল তামসী। রুদ্ধ বায়ু সঞ্চালিত হল। অনেকদিন কেউ নাকি কল্যাণীকে হাসতে শোনেনি, কেউ কোনোদিন দেখেনি ভবদেবকে পরিবার সম্বন্ধে আগ্রহ দেখাতে। ছেলেমেয়েগুলো পেয়ে গেছে তাদের খেলবার উঠোন, বেড়াবার মাঠ, ওড়বার আকাশ। তারা যে শুধু বাপ-মায়ের ছেলে নয়, দেশেরও ছেলে, রটে গেছে যেন তার কানাঘুসো।

তামসীর হাতে কি ইন্দ্রজাল আছে, ভাবে বসে ভবদেব। ঘরদোর ঝাড়াপোঁছা, ছেলেদের জামা-কাপড় ফিটফাট, কল্যাণীর মুখখানাও প্রসাধিত। রান্নায় স্বাদ এসেছে ফিরে, বসবাসে স্বাচ্ছন্দ্য। বিছানাটি এমনভাবে পাতা যেন সুস্থ ভাবে ঘুমুতে স্পৃহা হয়, টেবিলটা এমন সুন্দব গুছোনো যে অতিরিক্ত পরিশ্রমে আকর্ষণ আসে। যেন ছোট ছোট কাজের ভালোবাসার মধ্যে থেকে বড় কাজের আত্মোৎসর্গের উন্মাদনায় নিয়ে যাবে, স্নেহের অক্ষরে এমনি সংকেত এঁকে রাখছে। অথচ কোথাও এতটুকু হৈ-চৈ নেই, নেই নিজের উদ্ঘোষণা। যখন যে অবস্থায় থাকো নিজেকে তারই পরিবেশে বিকশিত করো—এই যেন তার অন্তরের বাণী। আকাশ যেমন তার ধ্রুবতারাকে ভোলে না, তেমনি ভুলোনা তোমার দেশকে। যখন যেটুকু কাজ তুমি করছ দেশের জন্যে করছ এই চেতনায় কর্মকে স্বাদু করে তোল। অথচ মুখে কিছু বলে না। ঠাণ্ডা, আত্মসমাহিত মেয়ে। ভিতরে কোথায় যেন একটা কঠিন সংযম আছে, এ সব যেন সেই শান্ত শক্তিরই স্বতোচ্ছ্বাস। যেখানে তাই সে হাত রাখে প্রাণের স্পন্দন আনে। অথচ নিজে সে সমস্ত আসক্তির প্রত্যাখ্যান। কোথায় যেন সে সমর্পিত, সমাবিদ্ধ। একটু গাম্ভীর্য এসেছে স্বভাবে, এসেছে ঘাতসহতা। অল্প কথা, সংযত কাজ, সঙ্গত অবয়ব। অন্ধকূপের উন্মুক্ত বাতায়ন।

কর্মপদ্ধতি ঠিক হয়ে গিয়েছে তামসীর। একটা মাস সে এখানেই থাকবে ভবদেবের শিক্ষকতায়। আই-এ দেবে ননকলেজিয়েটে। আই-এ পাশ করে চাকরি জুটিয়ে নেবে একটা, উষসীকে নিয়ে আসবে নিজের কাছে। চাকরি করতে-করতে পাশ করে নেবে বি-এ, উষসীর বিয়ে দেবে। তারপর—তার পরেরটা অস্পষ্ট, কুয়াসাচ্ছন্ন।

ভিতরে এই ব্যবস্থা, বাইরে দেবিকা ও তার দল। দলের নাম

"পতাকা", নিদর্শনও সেই নিশান। সেই দলে এসে ভিড়ল তামসী, পেল অনেক জায়গা, দেখল অনেক দূরের পথ। দরজা একদিন সে সাহস করে খুলে ধরেছিল বলেই জীবন তার জন্যে এত মুক্তি মেলে ধরেছে।

সেদিন সেই বৃষ্টির অন্ধকারে দরজা খুলে না দিলে নিজের মাঝে দেখতে পেতনা জীবনের এই অপূর্ব অর্থকে। দেখতে পেতনা দেবিকাকে। ঝড়ের দেবতাকে নমস্কার।

ধারালো ছুরির ছটার মতই এই দেবিকা। কাজে ও কথায় সমান অক্লান্তি। সমস্ত মেয়েজাতটাকে সে তাতিয়ে মাতিয়ে খেপিয়ে না তুলে ছাড়বে না। খুলেছে মেয়েদের জন্যে ইস্কুল, মেয়েদের জন্যে লাইব্রেরি। তারি জন্যে অন্ত নেই ঘোরাঘুরির, অঙ্কুর থেকে মহীরুহে নিয়ে যাবার স্বপ্ন। আর, আন্দোলনটা আবদ্ধ শুধু মধ্যবিত্তদের মধ্যে নয়, শিকড় নাড়িয়েছে আরো নিচে, নিঃশ্বাস অন্ধকারে। চলেছে বক্তৃতা, আলোকবিকিরণ। কর্মীর সন্ধান। দলের সম্প্রসার। বর্তমান প্রচেষ্টা, "পতাকা" নামে মাসিকপত্র বের করা। বন্ধিজীবীদের থেকেই আসবে প্রথম বিপ্লবের স্ফলিঙ্গ। সমবেত করতে হবে একসঙ্গে লেখনী আর হাতুড়ি, মেধা আর পেশী, কল্পনা আর ক্লেদ।

তামসীতে দেবিকা পেয়েছে একটি ইচ্ছুক সহকারিতা। অদম্য মেরুদণ্ড। টইটই করে ঘোরে দুই বন্ধুতে ঠাটাপড়া রোদে, চাঁদার লোভে, সভ্যার অন্বেষণে। কেউ ভেড়ে, কেউ বা তেড়ে আসে। কেউ নিরীহ মুখে বলে, বাড়ির পুরুষদের জিগগেস করে রাখব। পুরুষদের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় মাঝে-মাঝে। কি কারণ এই মুক্তহস্ততার, বুঝতে দেরি হয় না দেবিকার। বলে, 'মুখের একটু হাসিতেই যদি মুক্তো ঝরে পড়ে তো মন্দ কি।'

তামসী তলিয়ে কিছু বুঝতে চায় না, তাকে উন্মাদনা দেয় শুধু এই কর্মচেষ্টা। আমার ও আর পাঁচজনের শ্রম দিয়ে সম্পন্ন হবে একটা অনুষ্ঠান এটাই তাকে প্ররোচিত করে। বৃহত্তর হিতাহিতের প্রশ্ন তাকে পীড়া দেয় না, সে যে লাগতে পারছে কোনো কাজে, সে যে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে না আলস্যে, এটাই তার কাছে ঐশ্বর্য মনে হয়। মনে হয়, এ কি প্লাবন এল তার জীবনে।

প্রথম-প্রথম মন্দ লাগছিল না কল্যাণীর— খানিকটা শ্রম, খানিকটা সেবা। কতক ভারমোচন, কতক বিশ্রাম। কিন্তু সংসারের বর্তমান ব্যবস্থাটা মোটেই তার মনঃপূত হয়নি। সেটা তো ক্ষতির ব্যবস্থা। এই অল্প আয়ে আবার পোষ্য পোষা! স্বামীর পক্ষপাতটা পারলে না সে প্রশ্রয় দিতে। এবং পরোক্ষে তার জন্যে দোষারোপ করলে তামসীর উপর। কেননা এ সংসারে সেই তো অহৈতুকী। ভাপসা গরমে সে যে ঘুরুলে হাওয়া।

হাওয়া ছেড়ে সে ফের গুমসাতে গিয়ে বসল। ক্রমে-ক্রমে চোখ দুটোকে চরবৃত্তিতে নিযুক্ত করলে। যেখানটা শাদা দেখা যেত, সেখানে সে হলদে দেখতে লাগল। দেখতে লাগল স্বামীর হাওয়া-বদল। আগে কি রকম মুখছোপ ছিল, এখন একেবারে হাসির প্রস্রবণ, কথার আতসবাজী। বেশ ছিল আগে, বিচ্ছিন্ন, বিশ্বভোলা—ঠিক জ্ঞানী প্রফেসরের মত। এখন যেন শীতের শীর্ণতায় এসে নতুন করে পল্লবোদ্গম হচ্ছে। জ্বালা করে উঠল কল্যাণীর।

তার কী আছে স্বামী, ছেলে-মেয়ে, এই গৃহস্থালী ছাড়া? নাম-হীনতার সুনাম ছাড়া? এই মুখস্ত করা দাসত্বের বাইরে? যেমন করে তাকে বুঝতে শিখিয়েছে সমাজ, তেমন করেই সে বুঝেছে। এই নাগবন্ধনেই পেয়েছে সে নির্জীবতার আরাম, কায়মনোহীন

অভ্যাসকেই সে ভেবেছে অধিকার বলে। তার ভাঙা ঘর ছেয়ে দেবার কারু দরকার নেই। বেনো জল এসে তার ঘোরো জল যেন বার করে নিয়ে না যায়।

সেদিন অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল পড়ার ঘরে। বিকেলে গা ধোবার সময় চুল ভিজিয়ে ফেলেছিল তামসী, তাই তা বাঁধা হয়নি বেণীতে, বিক্ষিপ্ত হয়ে ছিল পিঠের উপর।

দক্ষিণাগত হাওয়ার এক ঝলক সেই অর্ধ-আর্দ্র চুল তামসীর মুখের উপর ছড়িয়ে দিল, বাঁ চোখ ও গালের এক অংশ আবৃত করে। দু'জনেই তন্ময়, বক্তা আর শ্রোত্রী, দুজনেই লুপ্তলেখ। টেবলল্যাম্পের শিখাটা কাঁপছে থেকে-থেকে। কখনো সরু হয়ে উঠছে লিকলিকিয়ে, কখনো বা ডুবে যাচ্ছে তলিয়ে। ভবদেব হঠাৎ তার ডান হাত বাড়িয়ে সেই স্খলিত কেশগুচ্ছ তামসীর মুখের উপর থেকে সরিয়ে ধরল। সরিয়ে ধরল, কিন্তু তখুনি নামিয়ে নিলনা হাত। নিল না বা পারল না নিতে। একদৃষ্টে দেখতে লাগল তামসীকে, তার বাম চক্ষুটিকে। যেন মেঘোন্মোচন করে স্নিগ্ধ তারাটিকে।

যেন নতুন করে আরম্ভ করতে পাবে ভবদেব, উলটিয়ে দিতে পারে জীবনের এই বিমলিন পৃষ্ঠা। যেন অনেক কাজ করতে পারে, অনেক ত্যাগ, অনেক দুঃখস্বীকার। ঝালিয়ে নিতে পাবে এই জীবনের পাতকুয়ো। যা এতদিন বিস্বাদ লাগত, সেই সংসারকেই ভেবে নিতে পারে নতুনতর কর্মের ক্ষেত্র বলে। জীবনে নিয়ে আসতে পারে রাজনীতির ঝাঁজ। খুঁজে পেতে পারে বা বেঁচে থাকার তাৎপর্য।

একটু বেশিক্ষণই ছিল বোধ হয় সে-তন্ময়তা, হঠাৎ জানলার ওপার থেকে শোনা গেল কল্যাণীর বক্র ও কুৎসিত গলা: 'থাক, আজকে এ পর্যন্তই থাক।'

ভবদেব আর তামসী তাকাল জানলার দিকে। কল্যাণীকে দেখা গেল না।

'কি হবে বলুন তো?' পাংশুমুখে জিগগেস করলে তামসী।

'বুঝতে পাচ্ছি না।' গম্ভীর হয়ে গেল ভবদেব।

অন্ধকারে না বুঝে থাকে, বুঝল পরদিন। বামুন ছিল না, তামসীর রাঁধবার কথা। রান্নাঘরে গিয়ে কল্যাণীই হাড়িকুঁড়ি নিয়ে বসেছে, দেহের ক্লিষ্টতা উপেক্ষা করে। সেই সমান উপেক্ষা এখন তামসীর উপস্থিতিকে। তামসী মৃদুস্বরে প্রশ্ন করল, 'তুমি কেন?'

'আমার সংসার আমি ছাড়া আর কে করবে? এতদিন আমিই তো করে এসেছি। কাউকে শুনিনি তো কখনো আহা করতে।'

'বা, তা কেন? আমি যদ্দিন আছি—'

'আর দরকার নেই দিন বাড়িয়ে। বিদ্যার থেকে এখন অবিদ্যা উঁকি মারছে।'

যার মনে পাপের রেখাপাত নেই সে বুঝতে পারে না এই ইঙ্গিতের কদর্থ। ক্ষণকাল হতভম্বের মত দাড়িয়ে থেকে বললে, 'তাহলে চলে যাব তোমার বাড়ি ছেড়ে?'

'তা নইলে কি এখানে বসে তোমাকে আমার ঘর ভাঙতে দেব নাকি? তোমার কেন জেল হয়েছিল তা আমার ভুলে যাওয়াটা উচিত হয়নি। বাইরের লোককে যে ভেতরে ডেকে আনে সে যে ভেতরের লোককে ফের বাইরে নিয়ে যেতে চাইবে তা আর বিচিত্র কি।'

তামসী দেখতে লাগল কল্যাণীকে। সমস্ত শরীর কৃশ, ক্লান্ত, কিন্তু হাতের আঙুলগুলো মোটা, মজবুত, অনেক কাজ করার কর্কশ সাক্ষ্য দিচ্ছে। অনেক সহ্য, অনেক অধ্যবসায়ের। ভঙ্গিতে রুক্ষ প্রতিজ্ঞা।

অধিকার থেকে এতটুকু স্খলিত হবে না সেই দুর্দম তেজ। যেন বা চরম আত্মোৎসর্গ করতে পারে তার স্বীকারোক্তি।

একে আর কোনো বড় কাজ নিয়ে যাওয়া যায় না? এই শ্রম ও সহন এই তেজ ও আত্মদানকে লাগানো যায় না আরো বড় একটা অধিকারের অর্জনে? এমন কি কোনোই কাজ নেই যার কাছে স্বামী-পুত্র ঘর-সংসার সব তুচ্ছ মনে হবে?

'কি, চললে?' উপরে আসতেই জিগগেস করলে ভবদেব।

'হ্যাঁ, দরজা আবার খুলে গিয়েছে।'

'কোথায় যাবে?'

'তা কি জানি। শুধু একটা গাড়ি ডাকিয়ে দিন।'

তামসীর গাড়িতে ওঠবার পর ভবদেবের মনে হল সেও বোধহয় উঠে পড়তে পারে দরজা ঠেলে। একদিন সে তামসীকে নিয়ে এসেছিল, আজ তামসী তাকে নিয়ে যেতে পারে। সে নিয়ে এসেছিল শান্তির বন্দরে, ও নিয়ে যেতে পারে উত্তাল তরঙ্গমালায়। জীবনে নিয়ে আসতে পারে সমুদ্রের স্বাদ, আকাশের অনুভূতি।

অনেক নিচে পর্যন্ত নোঙর ফেলা, অনেক মোটা করে কাছি জড়ানো। ভবদেব রোয়াক পর্যন্ত এসেই থামল। বললে, 'অন্তত তোমার বই-খাতাগুলো নিয়ে যাও।'

ম্লান মুখে হাসল একটু তামসী। বললে, 'দরকার নেই।'

তিন

লুফে নিল দেবিকা। বললে, 'আয়, জলবি আয় আমার সঙ্গে।'

দেবিকা অবস্থত জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট অঘোর চক্রবর্তীর মেয়ে। অঘোর চক্রবর্তী ঘোরতর পয়সা করেছেন, প্রথম জীবনে কার্পণ্য করে, শেষ জীবনে ঘুষ নিয়ে। অবসর নিয়েও আসর থেকে সরে যাননি, জমিদারি এস্টেটের ম্যানেজারি নিয়েছেন। অবাধে, নির্বিকারে ও অপরিমিতভাবে লুট করেছেন। এখন জাঁকিয়ে বসেছেন বাড়ি-ঘর, ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্সের সংখ্যা। মাসান্তে পেনসন পান বলেই প্রাণান্তে মরতে পাচ্ছেন না। টি-এ বাড়াবার জন্যে সারাজীবন বেশি-বেশি টুর করেছেন বলে ছেলেদের দিকে নজর দিতে পারেন নি, তাই বিদ্যাবত্তার দিক থেকে কেউ ভবিষ্যুক্ত হতে পারেনি, কিন্তু বাপের থেকে পেয়েছে তারা টাকা রোজগারের কৌশল। দুই ছেলে, বড় রেসের 'বুকি', ছোটর মদের দোকান। তিন মেয়ের মধ্যে বড় দু'মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন সব-ডেপুটির সঙ্গে, ছোট দেবিকার বেলায় আশাটা একটু কুলীন করেছেন। আজকাল তিনি নিয়মিত চিনির ওজন নেন, গেজেট পড়েন, আর সিভিল লিস্টের নাম ধরে জাত-মিলিয়ে নতুন চাকুরেদের চিঠি লেখেন, তারা এরি মধ্যে তাঁকে না জানিয়েই বিয়ে করে ফেলেছে, না, ফেলেনি। যদি না ফেলে তো—

দেবিকা ঝলসে ওঠে, পাগল! মেয়ের রাগ দেখে অঘোরবাবু ছেলেমানুষের মত হেসে ওঠেন। বলেন, পাগলি!

দেবিকার ঘরটা একটেরে, আদত বাড়িটা থেকে প্রায় সম্পর্কচ্যুত। তার সমস্ত অস্তিত্বটাই বুঝি স্বতন্ত্র। এই বিলাস-শিথিল পরিবেশের সঙ্গে সে খাপ খাওয়াতে পারেনি নিজেকে। বাড়ির সর্বত্র প্রাচুর্য, শুধু দেবিকার কৃচ্ছ্রতা। সর্বত্র বর্ণোচ্ছ্বাস, দেবিকার তপঃক্লেশ।

এই নিরাভরণ ঘরটিই তার প্রধান সাক্ষী। লেখবার একটা আঢাকা টেবিল, দু'খানা কাঠের চেয়ার আর শোবার জন্যে একটা শক্ত তক্তপোষ। কাপড়চোপড় ও কাগজপত্রে ঠাসা একটা ডালাখোলা আলমারি। নিজের চক্ষুষ্মত্তাকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। এত কঠিন, প্রায় নিষ্ঠুরতার কাছাকাছি।

চার বার খাবার দিয়ে যায় ভিতর থেকে। অহংকারে ডগমগ করতে-করতে মা এসে মাঝে-মাঝে খবর নিয়ে যান মেয়ের খামখেয়ালিপনার। আর, সমস্ত দিন ধরে চলেছে শুধু মেযেদের টানাপড়েন। তার গোনাগুনতি নেই। এমনি একটা উন্মত্ত কর্মব্যস্ততার ঝড়।

তামসীর চলে আসার কারণটা জেনেছিল দেবিকা। বললে, 'এমনি সব ছোট-ছোট জলবিম্বে বৃহৎ সমাজ-আকাশের ছায়া পড়ে। ক্ষুদ্র সন্দেহ, অনাবশ্যক অপমান। শুধু জ্বললেই চলবে না, জ্বালাতে হবে।'

একদিন জিগগেস করল তামসী, 'তুমি এই পথে এলে কেন? তোমার কিসের অভাব ছিল?'

'অভাব ছিল আত্মবোধের। নইলে বুঝতে পারতুম না নিজের মূল্যের পরিমাণ।'

'ক দিন চালাবে এমনি করে?'

'যত দিন না শান্ত হই, ভেঙে পড়ি।'

কিন্তু শ্রান্তির রেখা কই দেবিকার কপালে? যখন সে ঘুমোয়

অসহায়ের মত, ছিন্ন একখণ্ড শেফালির মালার মত, তখন কি তাকে শ্রান্ত দেখায়? অর্ধেক রাতে ঘুম ভেঙে গেলে ম্লান জ্যোৎস্নায় তার মুখের দিকে চেয়ে ভেবেছে তামসী। তখন কি তাকে অত্যন্ত নিঃসঙ্গ মনে হয়, অত্যন্ত হতোদ্যম?

স্পষ্ট কিছুই বুঝতে পারে না তামসী, কি এদের উদ্দেশ্য, কেনই বা এই পদ্ধতি-প্রণালী? কত দূর গিয়ে আর পৌছুতে পারা যায় না। সব এলোমেলো, ঝাপসা হয়ে যায়। শুধু, মেয়েদেরকে একত্র করা, জীবনধারণের ভঙ্গিটাকে সজ্ঞান, প্রখর করে তোলা, ব্যক্তিত্বে ব্যঞ্জনা আনা। বলা যেতে পারে সামাজিক উন্নয়ন। তাই বা কম কি। একটা সংগঠন, সংঘ, মণ্ডলী বা প্রতিষ্ঠান। হয়তো ভিত্তিস্থাপন। একটা রুগী-সেবার দল পেলেও তামসী তাতে নাম দিতে পারে। সে কাজ চায়, সকলে মিলে করবার মত যে কাজ।

কিন্তু মানসী দল ছাড়বে ঠিক করেছে। বললে এসে এক দিন মুখ মেঘলা করে, 'বাবার ভাই মত নেই দলে আমি আর কণ্টিনু করি।'

মানসীর বাবা বিশ্বরঞ্জন গুহ এখানকার উকিল, মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান। উঁচু দাঁড়ের সরকারি চাকুরেদের তাঁবে থাকেন সর্বদা, হাই তুললে তুড়ি দেন, হাঁচলে জীব করেন। বাইরে তাদের সমালোচনা করেন, প্রায় হাতে মাথা কাটেন, আর ভিতরে কেঁচোর মত কুঁচকে থাকেন। বাইরে ভাব দেখান লোকের জন্যে কত কি করছি আর এ দিকে নিজের কোলের দিকে ঝোল টানেন। ভাব দেখান গণ্ডার মারছেন কিন্তু আপন গণ্ডার বাইরে জায়গা রাখেননি পৃথিবীর।

'বাবার অপরাধ?' দেবিকা ব্যঙ্গ করে উঠল।

'না ভাই, কিছুতেই আর তাঁকে রাজি করাতে পারছি না।'

'তবে এতদিন কি ছিলি মার রাজিনামায় ?'

'না ভাই, এত দিন আমাদের মধ্যে রাজনীতি ছিল না।' মানসীর মুখ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠল।

'তখন বুঝি ছিল সাজনীতি ?' দেবিকা ঝাপটে উঠল : 'তখনকার যা প্রোগ্রাম, এখনো তো ভাই, কিছুরই রদবদল হয়নি। তেমন করে দেখতে গেলে নিশ্বাস নেওয়াটাই তো রাজনীতি। কি করে বাঁচবি রাজনীতি বাদ দিয়ে ?'

'আসল কথা তবে ভাই বলি খোলাখুলি, কিছু মনে করিসনে। বাবার আপত্তি শুধু তামসীর দলে আসায়।' মানসী ঢোঁক গিলল।

'কেন, তামসী কি করেছে ?'

'ও ওর ঘরে এক রাজনৈতিক আসামীকে আশ্রয় দিয়েছিল।'

'তা রাজনৈতিক আসামী বলে নয়।'

'তবে কি বলে ?'

'ওর, ভালোবাসত বলে।'

'একটা ক্রিমিন্যালকে ভালোবাসা ?'

দেবিকা না রেগে হেসে উঠল এবার 'তার জন্যে দায়ী সেই শ্রেষ্ঠ ক্রিমিন্যাল মীনকেতু—তামসী নয়। যাক, সে-অপরাধের তো সাজা হয়ে গেছে, এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড। জেলেও কি অপরাধের স্খালন হয় না বলতে চাস ?'

'না, দাগ যায় না নিশ্চিহ্ন হয়ে। ঘা শুকোলেও বিষ থেকে যায় শরীরে।'

'যাক, পলিটিক্স শুনিয়েছিস এককিস্তি, এখন আবার ডাক্তারি শোনাতে বসিসনে।' দেবিকা সানুকম্পভাবে হাসল। 'যদি তোর

বাবার মত নেই, তবে মিশিসনে আমাদের সঙ্গে। আমরা কারু পারিবারিক জীবনে অশান্তি ঘটাতে চাইনে।'

তামসীর নিজেকে হঠাৎ অবাঞ্ছিত মনে হল। অপাঙক্তেয়।

তার মুখের ম্লানিমা স্পর্শ করল দেবিকাকে। দেবিকা বললে, 'তুই তার জন্যে মন-খারাপ করছিস কেন? কত পাতা ঝরে যাবে, গজাবে আবার কত পাতা। কি যায় আসে! শুধু খাঁটি রাখতে হবে মাটি— মাটির তেজস্বিতা।'

তামসী অবাক হয়ে ভাবে, দেবিকার বাবা-দাদাদের কারু কেন কোনো আপত্তি নেই। দেবিকা এই যে বাঙা ধুলোর মেঘ উড়িয়ে চলেছে তাতে এঁদের দম আটকে আসে না কেন? যেন কি-একটা সুস্নেহ উপেক্ষা, উদার ঔদাসীন্য। মা পর্যন্ত এসে গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে যান। যেন কোথাও কোনো শঙ্কা নেই, প্রতিঘাত নেই, স্থানচ্যুতি নেই। কলকব্জা কেমন ফের সব জোড়াতাড়া লেগে যাবে এমনি সুকোমল বিশ্বাস। কিন্তু অজানা ভয়ে শিউরে ওঠে তামসী, সে শুনতে পায় সংঘর্ষের, ভাঙা কপাটের শব্দ।

কতক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকল দেবিকা। পরে প্রশ্ন করল আচমকা: 'একটা কথার জবাব দিবি, মসী?'

'যদি জানি তো দেব না কেন?'

'আচ্ছা বলতে পারিস দেশ বড় না প্রেম বড়?'

'দেশ বড়।'

'কেন বল দেখি?'

'দেশ হচ্ছে দশ, আর প্রেম হচ্ছে এক, আত্ম। স্বার্থের থেকে পরার্থে কি বেশি মহত্ত্ব নয়?'

'মহত্ত্ব বড় না সত্য বড়?'

'জানি না। যা সত্য তাই তো মহৎ।'

'আচ্ছা', খানিকটা হালকা স্বরে দেবিকা জিগগেস করলে, 'সত্যি করে বল, রণধীরকে তুই ভালোবাসিস, না তার হঠকারিতাটাকে ?'

'জানি না।' মৃদু হাসল তামসী।

'তার জেল হয়েছিল ক বছর ?'

'শুনেছিলুম চার বছর।'

'আছে কোথায় ? কবে ছাড়া পাবে ? জানিস কিছু ?'

তামসী কিছুই জানে না। জানা যায় কিনা তাও না।

'একবার যাবি এস-ডি-ওর কাছে ? কিছু হয়তো যুক্তি দিতে পারবে এ বিষয়ে।'

তামসী একা কি করে যায় ?

'না, আমি যাবো'খন সঙ্গে। ভদ্রলোক আমার অচেনা নয়।'

দিন ঠিক করে দুই বন্ধু এল এস-ডি-ওর বাঙলোয়।

প্রথম মহকুমা ও নতুন বয়স, প্রত্যেকটি স্নায়ুতে ছটফট করছে নীলাচল। একবার বাইরে বেরুচ্ছে, আরেকবার ভিতরে ঢুকছে, দুইই বিদ্যুৎবেগে। এ মুহূর্তে বসছে এই চেয়ারটায়, পরমুহূর্তে আবার আরেকটায়। কখনো দেখছে এ ফাইল, কখনো ঘাঁটছে ওটা। একজনের সঙ্গে কথাটা শেষ না করেই লাফিয়ে পড়ছে আরেকজনের কথায়। একটা সিগারেট শেষ না হতেই ধরাচ্ছে আরেকটা।

বারান্দাতে বেরিয়ে এক সময় দেখতে পেল দেবিকা ও তার পার্শ্বচারিণীকে। এক হাত শূন্যে তোলার ত্বরিত চেষ্টা করে বললে, 'এই যে আপনি। আসুন। কি, সমিতির মিটিং ?'

'না, অন্য একটা কাজ ছিল।'

'ও! সামথিঙ্গ প্রাইভেট ? বসুন গিয়ে ভেতরে—'

দেবিকা ক্রুদ্ধ কটাক্ষ করল। বললে, 'আমার এ বন্ধুটির জন্যে আসা—'

নীলাচল তাকাল একবার তামসীর দিকে। যেন বিশেষ অনুপ্রাণিত বোধ করল না। নিজেকে অশেষমণীষাসম্পন্ন বলে ভাবা অভ্যেস, তাই চক্ষের পলকে বুঝে নিল মহিলাটি মেয়ে-স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর পদপ্রার্থিনী। মুখে-চোখে হাতে-পায়ে ত্বরান্বিততার ভাব ফুটিয়ে বললে, 'দেখুন, আজকে আমি বড় ব্যস্ত, দয়া করে কাল আসবেন। দেখবোখন কি করতে পারি আমি।'

পরিচিত হতে পেরেছে, পরদিন তামসী একাই গেল। সেই বারান্দাতেই সন্দর্শন হল। অশেষমণীষাসম্পন্ন বলে নিজেকে ভাবা অভ্যেস, তাই এবারও নীলাচল ভুল করল না।

'এই যে আপনি।' শূন্যোত্তোলিত হাতে নমস্কারের একটা দুশ্চেষ্টা করে বললে, 'কাল পাঠিয়ে দেবেন আপনাদের হেডমিসট্রেসকে। এতগুলো ফ্রি হাফ-ফ্রি কিছুতেই দেয়া চলবে না। গ্র্যাণ্ট পান আপনারা, অথচ মানবেন না স্কুল-কোড ?'

তামসী ঘেমে উঠল। বললে, 'কাল বলেছিলেন—'

'হ্যাঁ, কাল এলেই চলবে।' নীলাচল বোঁ করে ঘুরে গেল। 'আমি আজ, এক্ষুনি মফস্বলে বেরুচ্ছি।'

তামসী চলে এল ফটকের বাইরে। নামল রাস্তায়। কোথাও যেন অনেক ভিড় দেখতে চায়, চলল তাই বাজারের মুখে।

কতদূর আসতেই ভবদেবের সঙ্গে দেখা।

'তোমার খোঁজেই গিয়েছিলাম। কেমন আছ ?'

'ভাল আছি। আপনারা কেমন ? আপনার চেহারা তো মোটেই ভাল দেখাচ্ছেনা।'

'ও কিছু নয়।' ভবদেবও চেষ্টা করল হাসতে। বললে, 'একটা খবর ছিল, তামসী।'

তামসী শিউরে উঠল। খবর! নিশ্চয়ই রণধীরের। গায়ের রোদ লাগল যেন নিবিড় স্পর্শের মত।

খবর আর কিছুই নয়, তামসীর জন্যে মাস্টারির প্রায় একটা ব্যবস্থা করে ফেলেছে ভবদেব। গ্রামের একটা মাইনর-স্কুল মেয়েদের। বদ্ধ গ্রাম নয়, চৌকি। থানা-মুন্সেফি আছে। এখানকার সার্কেল-অফিসর, যে স্কুলের প্রেসিডেন্ট, সে ভবদেবের বন্ধু, পড়েছে এক কলেজে। তাকে তামসীর নাম করে দরখাস্ত পাঠিয়েছে ভবদেব। মনসিজ চেষ্টা করলেই হয়ে যাবে বোধ হয়।

বিস্ময়-আহতের মত তাকাল তামসী। বললে, 'আই-এটা দেব না তা হলে?'

'কেন দেবে না? পড়াতে-পড়াতে দেবে। তোমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে তো এক দিন। সেটা যত শিগগির হয় ততই ভাল, নয়?' ভবদেব সস্নেহ বেদনার সুরে বললে, 'তোমাকে এ রকম ভাবে থাকতে দেখতে ভাল লাগে না আর।'

'কি রকম ভাবে?'

'এমনি পরাশ্রিত ভাবে।'

কথাটা লাগল বুঝি তামসীর। বললে, 'কেন, আমি তো "পতাকা"র জন্যে কাজ করছি। পেড ভলনটিয়র রাখবার স্কিম আছে "পতাকা"র। আমি মাইনে বাবদ কিছু না নিয়ে খাচ্ছি পরছি শুধু।'

ভবদেব বললে, 'এ কার পতাকা? তোমার নিজের পতাকা তুমি কবে বহন করবে?'

চার

রাত অনেক হল, তবু এখনো দেবিকার বাড়ি-ফেরার নাম নেই। কোথায় গেছে তাও কিছু বলে যায়নি তামসীকে। এমন কি তার দরকারি কাজ থাকতে পারে যা "পতাকা"র নয়, যার থেকে তামসীর নাম কাটা। অভিমান করে সে একাই খেয়ে নিল, শুয়ে পড়ল তার শয্যাংশে। খোলা রইল দরজা।

আরো অনেক পরে ফিরল দেবিকা। তামসীর নিশ্বাস তখন নিদ্রা-নম্র, মন্থর। মুখখানি সম্পূর্ণ উন্মোচিত। অবাক হয়ে চেয়ে রইল দেবিকা। কি আশ্চর্য্য প্রশান্তি। সহিষ্ণুতা। সমর্পণ। মনে হয়না কি কঠিন সংগ্রাম আর কঠিনতর ব্যর্থতার গৌরব বহন করবার জন্যেই তৈরি হয়েছে ঐ মুখ? পারবে—পারবে তামসী। তার আর ভয় নেই।

শাড়িটা চট করে বদলে নিলে দেবিকা। তামসী যে ঘুমিয়ে পড়েছে, ভালই করেছে। নইলে এই অনভ্যস্ত রঙিন শাড়িটা দেখলে সে চমকাত নিশ্চয়ই, চমকাত নিশ্চয়ই এই তার অশাসিত বিন্যাসে, খোপার পুঞ্জিত শিথিলতায়। তাড়াতাড়ি গায়ে চাপিয়ে নিলে মোটা খদ্দরটা রিক্ত সেমিজের উপর। খাবার ঢাকা ছিল টেবিলে। তুলেও দেখল না। অনেক খেয়ে এসেছে সে আজ।

তামসীর পাশে এসে বসল। কপালে রাখল ডান হাত। তামসী চোখ চাইল।

'কখন ফিরলি ?' নিস্পৃহ কণ্ঠে জিগগেস করলে তামসী।

'এই তো।' তামসীর কপাল থেকে চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল দেবিকা।

জিগগেস করবে না ভেবেছিল, তবু না করে পারল না। বললে তামসী, 'এত দেরি হল কেন ফিরতে ?'

'একদম ফিরবই না ভেবেছিলুম, কিন্তু ভাবলুম, আর যার থেকেই হোক, তোর কাছ থেকে পালানো চলবে না।'

দেবিকার স্বর নয়, বিদ্যুদ্বতী দেবিকার।

'কেন, কি হয়েছে তোর ?'

'তোর কাছে বিদায় চাই, মসী।'

'বিদায়।' তামসীর চোখে বিস্ফার এল বিস্ময়ের।

'কোথায় ? জেলে ?' এবার প্রায় আতঙ্ক।

'না। নিজের ঘরে।'

'তার মানে ?' চোখাচোখি তাকাল তামসী।

লজ্জা না এসে লাস্য ফুটল দেবিকার চোখে। নির্ভয়ে, নিষ্কম্পস্বরে বললে, 'আমি বিয়ে করছি।'

'বিয়ে করছিস ?' তড়িৎস্পৃষ্টের মত তামসী লাফিয়ে উঠল 'তুই বিয়ে করছিস ?'

'হ্যাঁ ভাই, পারলুম না তাকে ফেরাতে।'

যেন কঠিন অস্ত্রাঘাতে অনেক রক্তপাত হয়ে গিয়েছে শরীর থেকে তামসী এমনি নিস্তেজ ও দুর্বল বোধ করতে লাগল নিজেকে। শুধু পরাভব নয়, অপমান। প্রবঞ্চনা। প্রচ্ছন্ন রাগে তপ্ত হয়ে উঠল তার স্তিমিত রক্ত।

কিন্তু আসলে এ ঈর্ষা ছাড়া আর কি। সব মেয়েই কি তার মত

নিষ্প্রদীপ ? তার শুভযোগ-ঘটলনা বলে কি আর কারু ঘটবেনা ? সেটা কি ফুলের দোষ না গুণ, প্রজাপতি যদি তার উপরে এসে উড়ে বসে ? যা সত্যি গুণান্বিত তাকে নিয়ে কেন এই কাতরতা ?

চট করে সামলে নিল তামসী। বিয়ের সংজ্ঞায় নিজেকে দেখছে মনে করে ধিক্কার দিয়ে উঠল নিজের উপর। মুখে তাপহীন আনন্দ এনে বললে, 'তা, বেশ, ভালোই তো। কিন্তু বিদায় কেন ?'

'বিদায়, কেননা আমি আর বইতে পারবনা "পতাকা"।'

'সে কি কথা ? বিয়ের পরেই তো মেয়েদের বেশি স্বাধীনতা। সত্যিকারের মুক্তি।'

'কিন্তু যাকে বিয়ে করছি সে যে রাজনৈতিক আসামী নয়, রাজনৈতিক দণ্ডধর।' দেবিকা হাসল।

'কে সে ?'

'নীলাচল।'

একমুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল তামসী। বললে, ' "পতাকা" তা হলে তুই ছেড়ে দিবি ?'

'তোর হাতে ছেড়ে দিয়ে যাব, মসী।' দেবিকা দৃঢ় ক'রে তামসীর দুই হাত চেপে ধরল।

জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তামসী বললে, 'আমার বয়ে গেছে।'

'আমার উপর রাগ করছিস কর, কিন্তু "পতাকা" কোনো দোষ করেনি।' দেবিকা আবার তামসীর হাত টেনে নিয়ে এল তার হাতের মধ্যে : 'পদাতিকই মরে মসী, পতাকা মরেনা।'

'আমি বইব আমার নিজের পতাকা।' হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তাম শুয়ে পড়ল পাশ ফিরে : 'তুই স্বার্থপর হতে পারিস, আমি পারিনে ?'

'কিন্তু যত দিন সেই স্বার্থপরতার সুযোগ না আসে ততদিন

আঁচলের তলায় বাঁচিয়ে রাখ এই আলোটুকু। যেদিন ডাক আসবে সমুদ্রের, চলে যাস, বর্তিকার জন্যে পাবি আবার পশ্চাদ্বর্তীকে।'

'সমুদ্রের ডাক বলিসনে, বল ড্রয়িংরুমের ডাক।' ধিক্কারের মত শোনাল তামসীর গলা: 'তুচ্ছ সম্ভোগের জন্যে এত বড় একটা আদর্শ তুই ছেড়ে দিলি?'

'কি সম্ভোগ নয়! ঈশ্বরানুরাগও সম্ভোগ। হয়ত জেলে যাওয়াও।'

নগ্ন বুকের উপর লাগল যেন একটা শানিত কশাঘাত। চুপ করে সহ্য করে গেল তামসী। ঘৃণায় জ্বলন্ত জিহ্বায় সে বললে, 'সব মেকি, ঝুটা, নকল।'

দেবিকা উঠে বসল গিয়ে চেয়ারে। বললে, 'হয়ত তাই। মেকিই হয়ত জুটিয়ে এনেছিল মেকিকে।'

'তাই,' উত্তেজনায় উঠে বসল তামসী: 'তাই আমারই বিদায় নেবার কথা, তোর নয়।'

বিছানায় ফের ছুটে এল দেবিকা। তামসীর হাত ধরে ব্যাকুলভাবে বললে, 'তুই কি চাস মসী, আমার জীবনের এই সুযোগ এই সম্ভাবনা আমি অস্বীকার করব, উপেক্ষা করব? নিজেকে বঞ্চিত করলেই কি আমি ভরে উঠব ঐশ্বর্যে? ক্লিষ্ট ও কঠিন রিক্ততার মধ্যেই আমার সার্থকতা?'

তামসীর চোখে অশ্রু হয়ে নেমে এল সেই জিজ্ঞাসার উত্তর।

'লোকে বলবে আমি কেন তেমন স্বামী নির্বাচন করিনি যে আমার আদর্শেরও অংশভাক। সব সময়েই নির্বাচন নয়, মসী, তুই জানিস, কখনো কখনো সেটা ভাগ্যের নিক্ষেপন। অনেক কর্মী আছে কিন্তু কেউই মর্মী নয়, আবার তেমনি যে মর্মী সে হয়ত স্বধর্মী নয়। কি করি বল? তুই যদি তোর প্রেম আর কর্ম একসঙ্গে পেয়ে যাস মসী, তুই

রাজেন্দ্রাণী হবি, কিন্তু আমি যদি তা না পাই, আমাকে যদি বেছে নিতে হয় প্রেম আর কর্মের মধ্যে, যে যাই বলুক, আমি বেছে নেব আমার প্রেম। আমার সেই প্রেমের থেকেই হবে নতুন কর্মের সূচনা।'

উত্তরে তামসীর সেই নীরব অশ্রুলেখা।

সমস্ত রাত সে ভাবল, ঠিক কি ভাবল কিছুই জানেনা। এমন কি ডাক এল দেবিকার জীবনে যে নিমেষে সে রূপান্তরিত হয়ে গেল, হতে দিল নিজেকে? এই কি প্রেম? এই কি প্রেমের স্বভাব? প্রেমে কী আমাকে আন্দোলিত করবে? রূপ মানিনা, বিদ্যা মানিনা, বিত্ত মানিনা, বল মানিনা, কিন্তু যেখানে চিত্তের সাধর্ম্য নেই, ভাবের এক-রূপতা নেই, সেখানে প্রেম এসে আমাকে স্পর্শ করবে কি ক'রে? প্রেম কি এমনই স্বেচ্ছাচারী? যে আমার দেশের লোক নয় সে আমার হৃদয়ের লোক হবে? যে আমার জীবনের থেকে বিপদের ধারটুকু নিয়ে যাবে, সংকটের পথ থেকে নিয়ে আসবে পুঞ্জীভূত আরামে-বিশ্রামে, ব্যক্তিত্বের বিস্মরণে, তাকে আমি বরমাল্য দেব? যে-জীবন বিপন্নময় নয় সে-জীবনে স্বাদ কই? জীবনের সেই স্বাদ যে নিষ্প্রভ করে দেবে তাকে আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারব না? প্রেম কি এতই দুর্দম? এতই অবিচার্য?

না, খাঁটি রাখতে হবে মাটির তেজস্বিতা। আগাছা-পরগাছা ছাপিয়ে জাগবে বনস্পতি। অসরল দুঃখ আর কৃত্রিম কামনার ঊর্ধ্বে জাগবে সত্যিকারের প্রেম।

তামসী তার পরদিনই দেবিকাদের বাড়ি ছাড়বার জন্যে প্রস্তুত, কিন্তু দেবিকার মা কিছুতেই তাকে যেতে দেবেন না। আজ তাঁর গরিমার অন্ত নেই। কত মেয়েই তো ছিপ হাতে নিয়ে স্বদেশীর

পুকুর-পারে এসে বসেছিল, কিন্তু তাঁর মেয়ের মত এমন বড় মাছ কে গাঁথতে পারল? মেয়ের সেই কৃতিত্বটা উপভোগ করবার মধ্যে যাতে একটু ঝাঁজ পান তারি জন্যে মেয়ের সৌভাগ্যের পাশে রেখে দিতে চান তামসীর অযোগ্যতাকে। তামসী তা বুঝতে পারে। কিন্তু মৌখিক স্নেহকে বাহ্যিক অসৌজন্য দিয়ে সে বিড়ম্বিত করে না। মন্দ কি, দেখবে সে একটা স্বেচ্ছাকৃত সহমরণ। দেবিকার বিয়ে।

কিন্তু হঠাৎ ভবদেবের একটা চিঠি এসে হাজির। হয়ে গেছে তোমার চাকরি। যত শিগগির পার, জয়েন করতে লিখেছে।

এমন একটা জরুরি খবর, নিজে না এসে কেন চিঠি লিখে জানিয়েছে, তামসী ঈষৎ বিরক্ত হল। কিন্তু আরেকবার স্তব্ধ হয়ে বসে পড়তেই চিঠির শান্ত স্নেহে তার মন ভরে গেল। মনে হল, চিঠি লিখবার এই প্রথম সুযোগটি ভবদেব নষ্ট করতে চায়নি। ভাষায় যা প্রকাশ করা যায় না, চিঠিতে রচনা করেছে তার পরিবেশ। গাঢ় বা রূঢ় কোনো কথা নেই, তবু অনুভব করা যায় একটি সজীব অন্তরময়তা।

'আমি চললুম। আমার চাকরি হয়েছে।'

শুয়ে-শুয়ে বই পড়ছিল দেবিকা। নির্লিপ্তের মত বললে, 'চিঠি দিস। ভুলিসনে।'

'আমাকে ভুলে যাস।' তার মুখের দিকে না তাকিয়েই ঘর থেকে চলে গেল তামসী।

দেবিকা উঠে জানলা দিয়ে বাইরে তামসীকে দেখতে চেষ্টা করল। দেখা গেল না। শুয়ে পড়ল আবার। চাকরির বাঁধাবাঁধির মধ্যে কি দেশের কাজ করা যায় না? কে বলে যায় না? ইস্কুল-পাঠশালা, রাস্তা-ঘাট, বাঁধ-ভেরি, পোল-জাঙাল, লাইব্রেরি-হাসপাতাল—কত কিছু তৈরি করতে পারে তারা। সেগুলো কি দেশের কাজ নয়? তা দিয়ে

কি দেশের উপকার হয় না? সুপ্ত উত্তর আপনা থেকেই গজিয়ে ওঠে মনের মধ্যে। ইস্কুল করতে পার বটে, কিন্তু মানুষ করতে পার না। রাস্তা গড়তে পার বটে, কিন্তু চলতে শেখাতে পার না। আর লাইব্রেরি যা করবে তা সব বিপ্লবী ভাবের গোরস্থান। এ সব দেবিকারই বক্তৃতার ছিন্নাংশ। তবু—বই দিয়ে মুখ ঢাকল দেবিকা।

না, ফেরানো যায় না নীলাচলকে। তার যেখানে প্রেম সেখানেও দেশ আছে। কোনো রাত্রিই নিষ্প্রভাত নয়।

কিন্তু ভবদেবের আজকের প্রভাতটি যে প্রকাশিত হবে তামসীর পরিচ্ছন্ন আবির্ভাবে কে জানত।

'আশাতীত সৌভাগ্য আমার, ঘুম থেকে উঠেই তোমার দেখা পেলুম।' ভবদেব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

'তবে এই সঙ্গে সেই গানখানাও ধর না', অন্তরাল থেকে ব্যঙ্গ-বক্র গলায় কল্যাণী বলে উঠল: 'আজু রজনী হাম ভাগ্যে পোহায়নু—'

কথাটায় কেউই কান পাতলে না।

তামসী বললে, 'আমার যাওয়ার আজই সব বন্দোবস্ত করে দিন।'

'আগে শোন্ সব বিবরণ—'

কত কথা যে একসঙ্গে বলবে ভবদেব, ঠিক পায় না। মাইনে যদিও ত্রিশ টাকা, জায়গাটা শস্তা, কোয়ার্টার মাগনা, কলকাতার কাছে। অল্পে সুখ না হতে পারে, অল্পে আরম্ভ হওয়াটা বাঞ্ছনীয়। মনসিজের সঙ্গে যদিও তার প্রায় দশ বছরের উপর দেখা নেই, তবু কলেজের বন্ধুত্বস্মৃতিটা সে অবজ্ঞা করেনি। রেখেছে তার অনুরোধ, দাঁড়াবার জন্যে তামসীকে দিয়েছে একটু জায়গা।

'আজই আমি যাব।'

'আজই? তোমার দেবিকার মত হবে?'

'আমাকে কি আপনি আর কারু ছাঁচে ঢালাই হতে বলেন? না, এবার আমি নিজেকে নিজে তুলে নিলুম। বাঁচি মরি, আমি আমি। আমি আর কারু নমুনা নই।'

'তা হলে "পতাকা" ছাড়লে?'

'হ্যাঁ, "পতাকা" যে এখন সিঁথিমৌর।'

কিছুই হয়ত আসে যায় না ভবদেবের, কি গেল বা রইলো। শুধু সে যে একটি সম্ভাবনাশালিনী মেয়ের আত্মোদঘাটনের কাজে নিজেকে লাগাতে পেরেছে তাতেই তার পরিতৃপ্তি। স্থানের সন্ধানে যে ঘুরছে তাকে যে সে দাঁড় করিয়ে দিতে পারল প্রথমতম সোপানে, এতেই সে মূল্যবান। একটি বুদ্ধির বিকাশের পথে সে যে একটু আলো জ্বালতে পেরেছিল তাতেই সে নিজের কাছে সুন্দর।

সিঁড়ি দিয়ে তখন নামছে তামসী, ভবদেব চারদিক একবার দ্রুত দেখে নিয়ে হঠাৎ তার হাত চেপে ধরল।

'এ কি?' চমকে উঠেছিল তামসী।

'কুড়িটা টাকা। যাবার আগে কিছু তোমার কিনে-কেটে নিতে হবে তো—'

অভ্যাসবশে মনটা ঝঙ্কার দিয়ে উঠতে চাইলেও বুদ্ধিবশে হাত বাধা দিল না। করতলটি অকাতরে মেলে ধরল তামসী ও দশ টাকার দু'খানা ভাঁজ-করা নোট তাতে গুঁজে দিল ভবদেব।

'ওমা, তুই চলে যাচ্ছিস নাকি? কবে, কত দূরে?' রাহুমুক্ত চাঁদের মত কল্যাণী উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

'আজই। অনেক দূর। কলকাতার কাছে।'

'তা হলে বোস। যাই বলি, অনেক তুই করেছিস আমাদের জন্যে।' কল্যাণীর স্বর প্রায় আদরে সিক্ত হয়ে উঠল।

'কিছু না। আরো অনেক যেন করতে হয় তোমাদের জন্যে। আমার জন্যে তোমরাও যেন কর অনেক কিছু। প্রত্যেকে আমরা প্রত্যেকের জন্যে করব। দেশকে আমাদের বড় করতে হবে।'

দেশের নামে কল্যাণীর মনে কেমন একটি স্নিগ্ধতা এল। মনের ভার গেল ঘুচে, পবিত্রতার গন্ধ লাগল। স্নান করে খেয়ে বিশ্রাম করে তবে যেতে পারবে তামসী। না, কল্যাণী একাই রান্না করতে পারবে। তামসীকে আসতে হবে না রান্নাঘরে। সে ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে খেলা করুক, আবার তার অগোছাল ঘর-দোর একটু সিজিল-মিছিল করে দিক।

টিকিট কেটে তামসীকে মেয়েদের ইণ্টার ক্লাশে বসিয়ে দিল ভবদেব। সে-কামরায় আর যাত্রী নেই, সেইটেই নাকি তামসীর শান্তি। নিঃসঙ্গতাই তার দুর্গ। অন্তবিহীন পথই তার এখন একমাত্র আকর্ষক।

গাড়ি ছাড়বার কিছু আগে ভবদেব একটা খাম তামসীর হাতের মধ্যে গুঁজে দিতে গেল। না, চিঠি নয়। টাকা। আরো কিছু টাকা। সঙ্গে থাকা দরকার। কখন কি ভাবে দরকারে লাগতে পারে বলা যায় না।

'আছে কত ?' তামসী কুণ্ঠিতের মত প্রশ্ন করলে।

'এক শো।'

'ও সর্বনাশ! আমি এত টাকা শোধ করব কি করে?'

'কি দিয়ে কি শোধ হয় কেউ বলতে পারে না। আর শোধ করতেই হবে, জীবনের অর্থ নয় এই অর্থনীতি। সমস্ত দেনা-পাওনা কাটাকুটি করে শূন্য শাদা পৃষ্ঠায় জীবনের জের টেনে চলা একটা অভিশাপ।'

কিন্তু তাই বলে টাকা ধার করবার কি হয়েছিল? ধার নয়? ও মাসের সমস্ত মাইনেটাই তা হলে সে দিয়ে দিয়েছে?

তামসী অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ভবদেবের মুখের দিকে। নিরাকাঙ্ক্ষ মুখে বললে, 'এত টাকা দিয়ে আমার কি হবে? আরো কুড়িটে টাকা রাখি।' খাম খুলে গুনে তামসী দুখানা নোট তুলে নিল: 'দরকার হলে চাইতেই তো হবে আপনার কাছে। আর কাউকে তো দেখতে পাচ্ছিনা।

'তুমি আবার চাইবে।'

'সে-স্পর্ধা আমি রাখি না। আর চাইতে যেন না হয় এই আশীর্বাদ করুন।' হাতের একটি স্নেহপ্রবণ ভঙ্গিতে বাকি টাকা-ভরতি খামটা তামসী ভবদেবের পাঞ্জাবির বুক পকেটের মধ্যে গুঁজে দিল।

কিন্তু দেবিকার গাড়িতে দেবিকা একা নয়। দেবিকা আর নীলাচল। চলেছে তারা দক্ষিণে, হনিমুনে। ফার্স্ট ক্লাশ কুপেতে। শীতের রাত। দু'জনেই শুয়ে পড়েছে। গল্প করতে করতে থেমেছে এখন। এবার ঘুমুবে—ঘুম যদি আসে।

কতক্ষণ পর নীলাচল তার বেঞ্চি থেকে ডেকে উঠল: 'ডার্লিং—'

দেবিকা যেন বুকের মধ্যিখানে একটা কিল খেল। এমন ভাষায় এর আগে তো কোনো দিন ডাকেনি তাকে নীলাচল।

'ডিয়ারি—শুনছ?'

দেবিকা তবুও নিরুত্তর।

'ওগো, শুনছ, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?'

'না।' দেবিকা জাগা-মানুষের গলায় বললে।

'আজ লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার। কি বললে জান?'

'কি?'

'বললে, কনগ্র্যাচুলেশনস। একজন শত্রুকে তুমি রিক্লেম করেছ।' নীলাচল হাসতে লাগল।

পাঁচ

নিরিবিলি জায়গা, তামসীর বেশ পছন্দসই। আরো একজন শিক্ষয়িত্রী আছেন, যদিও বয়েস বেশি ও চেহারাটি দারিদ্র্যলিপ্ত। বাকি মাস্টাররা পুরুষ। সর্বসাকুল্যে মেয়ে একশো বারটি। পরীক্ষায় কাউকে ফেল করানো যাবেনা বলে পড়ানোটা জলের মত। কোয়ার্টারটি বেমেরামত হলেও নিজের বাসা বলে ভাববার গুণে দৃষ্টিসহ। অন্য শিক্ষয়িত্রীও পার্শ্ববাসিনী। রান্নাবান্না বা ঘর-করনার সমস্ত তদবির-তদারক তার হাতে, তামসীকে হাত মেলাতে ডাক পড়ে না কখনো। সে তার নিজের অবকাশে সঙ্গোপিত। মাস খানেক পরেই তার একজামিন।

সাত দিন হয়ে গেছে সে এসেছে। স্কুলের সেক্রেটারি কালীবর করাতি এখানকার উকিল। তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। অনবরত পেটে হাত বুলিয়ে এই তিনি বোঝালেন যে এখানকার জলটা মোটেই হজম করায় না। তবু তো তিনি পদে আছেন, এখানকার মুন্সেফবাবুতো একেবারে লবেজান হয়ে পড়েছেন। কিছু খান বা না খান, সর্বক্ষণই ঢেঁকুর তুলছেন—হে বলে সম্বোধন শুনেছি, ওঁর সম্বোধন হচ্ছে হেউ বলে। আর একটা উৎপাত হচ্ছে ম্যালেরিয়া। বলা-কওয়া নেই, হি-হি-হি করে কাঁপতে সুরু করে দিলেন। আরেকটা জিনিসের থেকে সাবধান হওয়া দরকার, সে হচ্ছে সাপ। আর, এখানকার সাপ শুধু

বুকে হাঁটে না, পায়ে হাঁটে! ভাবখানা এই, যেন নিজে তিনি তার ব্যতিক্রম।

বিকেলবেলা সার্কেল-অফিসারের লোক এসে বললে, সাহেব নতুন মিসট্রেসকে তাঁর কুঠিতে সেলাম দিয়েছেন।

হ্যাঁ, ভবদেবের বন্ধু। প্রায় আত্মীয়ের মত। নিঃসম্পর্ক জায়গায় একটা নিরাপদ আশ্রয়স্থল।

'খানিক পরে যাচ্ছি আমি ঝিকে নিয়ে। তুমি যাও।'

ঝিকে নিয়ে পৌছুলো যখন সে মনজিসের বাড়িতে তখন সন্ধ্যা তার সীমা পেরিয়ে গেছে। বাঁশের খুঁটিতে তোলা খড়ের ছাউনি-দেয়া ঘর, ছেঁচা বেড়ার। মেঝেটা পাকা। এক পাশে একটা তক্তপোষ ও প্রায় মধ্যিখানে একটা টেবিল, দুটোই হাড্ডিসার, নিস্খোলস। টেবিলের উপরে লণ্ঠন, চিমনির গায়ে পোস্টকার্ড আটকিয়ে মনসিজের দিকটা ছায়াকরা। মনসিজ বসেছে একটা চটের ইজিচেয়ারে, হাঁটু দুমড়ে। গায়ে গেঞ্জির উপরে কোট, পরনের কাপড়টা গোল করে জড়ানো। সামনে নীল কুর্তা পরা কোমরবন্দ-আঁটা একটা লোক ব'সে। বাঁশের খুঁটিতে একটি কৃষ্ণকায় পাঠা বাধা। মনসিজের পায়ের কাছে এক ঝুড়ি ডিম। দুটি নারকেল।

কানুনগো থেকে মনসিজ সার্কেল-অফিসর হয়েছে। স্বপ্ন দেখছে ট্রাউজার্সের, ডিপটি-ম্যাজিস্ট্রেটের। আর নীল-কুর্তাটি পাশের ইউনিয়নের চৌকিদার। এক গরুচোর ধরা পড়েছিল সম্প্রতি, গরু রাখা হয়েছিল এই চৌকিদারের জিম্মায়। চৌকিদার চোরকে তার গরু ফিরিয়ে দিয়েছে ঘুষ নিয়ে। সেই অপরাধে সসপেণ্ড হয়ে আছে চৌকিদার। এসেছে তদবির করতে, আর ঐ সব তার উপঢৌকন।

'আসুন, আসুন।' মনসিজ অনেক বেঁকে-চুরে পা দুটোকে নামিয়ে আনল তার স্যাণ্ডেলের মধ্যে।

চৌকিদার নিজেকে অবান্তর মনে করে অন্তর্হিত হয়ে গেল। ঝি দাঁড়িয়ে রইল বাইরে আর তামসী বসল এসে নির্দেশিত চেয়ারে।

'এখানে অসম্ভব শীত।' মনসিজ তাকাল একবার তামসীর আকৃতির দিকে। বললে, 'আমি ও সব শীত-টিত মানিনা। বলুন না এখুনি গিয়ে এঁদো পুকুরে ডুব দিয়ে আসব।'

আশ্চর্য, বললে না তামসী। মাথা নামিয়ে চুপ করে রইল।

'মাংস যে খাবে তার আবার শীত কি!' ফরসিটা মনসিজ মুখে তুলে নিল। এক কুণ্ডলী ধোঁয়া ছেড়ে বললে, 'রাঁধা আছে, খাবেন?'

'না।' তামসীর গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল কি না-বেরুল।

'আপনি মুরগি খান না বুঝি?'

'না।'

'কিন্তু চা তো অন্তত খাবেন?'

'না, চা-ও খাবনা। ইস্কুলের কি কাজের জন্যে ডেকেছেন আমাকে তাই দেখা করতে এসেছি।'

'চুলোয় যাক ইস্কুল। এক্স-অফিশিও প্রেসিডেণ্ট, তা নিয়ে তো আমার ঘুম নেই একেবারে! দু'দিন বাদে বদলি হয়ে যাব, তখন কোথায় কি ইস্কুল, কোথায় কে প্রেসিডেণ্ট! ইস্কুলের কাজ না হাতি। সুবিধে হল, নিজের লোককে চাকরিতে ঢুকিয়ে দিলুম। এই পর্যন্ত। অচেনা জায়গায় আমারই একটি আত্মীয় বাড়ল। আমি তাকে দেখব, সে আমাকে দেখবে—এমনি একটা চেনা-শোনা। প্রেসিডেণ্টগিরির এইটুকুনই যা লাভ দেখতে পাচ্ছি। নইলে আলু-মুলো সব স্কুল-সাবইনস্পেক্টরের।'

শীত গিয়ে বাসা বাঁধল তামসীর হাড়ের মধ্যে।

'আজ না-হয় তৈরি হয়ে আসেননি বলে কিছু খাবেন না। কিন্তু পাঁঠাটা কবে কাটি তাই বলুন আমাকে! কবে আপনার সুবিধে হবে?'

এ কি অদ্ভুত প্রশ্ন! তামসী ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বললে, 'আমার সুবিধে-অসুবিধেয় কি এসে যায়! আমি তো আর কাটব না।'

'আহাহা, পাঁঠা আপনি কাটবেন কেন? সে আমিই পারব। কিন্তু মাংসের আলু তো আপনি কুটবেন। হাতে খাঁড়া না নিন, পায়ের তলায় বঁটিখানা তো নেবেন অন্তত।'

'কেন, আপনার বাড়ির মেয়েরা আছেন কি করতে?'

'মা গঙ্গা! তারা কোথায়? ম্যালেরিয়া তাদের আর কিছু রেখেছে নাকি? হাড়ে-নাড়ে কম জ্বলিয়েছে আমাকে? তাদের সবাইকে তাই পাঠিয়ে দিয়েছি। একলা আছি বটে কিন্তু ঝঞ্ঝাট কম নয়।' সাপের নিশ্বাসের মত নিশ্বাস শোনা গেল মনসিজের: 'হোম-কম্ফর্টসই যদি থাকবে, তবে নিজের লোককে চাকরি দিয়ে এনে এখানে বসাব কেন?'

শিলীভূতের মত তামসী স্তব্ধ হয়ে রইল।

'একটা ছুটির দিন ঠিক করা যাবে। সামনের রোববারটাই বা মন্দ কি। ইচ্ছে করলে যে কোনোদিনই আমার ছুটি—শুধু টুর দেখিয়ে দেয়া ডায়রিতে। এখন শুধু আপনার মর্জি। আপনি নিশ্চয়ই একজন এক্সপার্ট রাঁধিয়ে, আপনার হাতের আঙুল দেখেই তা আমি বলে দিতে পারি—মাংসের তার আপনার হাতে নিশ্চয়ই খুব ভাল খুলবে। চাকরের হাতে আর খেতে পারিনে।'

'আমি এবার উঠি।' আলোয়ানের তলায় হাতের আঙুলগুলি অবধি ডুবিয়ে ফেলে তামসী ওঠবার একটা দুর্বল ভঙ্গি করলে।

'ও কি ? এরি মধ্যে চলে যাবেন কি। এখনো ভাল করে কথাই হলনা কিছু।'

'কাজের কথা যখন কিছু নেই—'

'কে বললে নেই ? পরে আসতে পারে কাজের কথা।' মনসিজের গলায় ঝাঁজ ফুটে উঠল : 'ইণ্টারভিয়ু না দিয়ে চাকরি পেয়েছেন, মনে করুন না কেন এটা সেই ইণ্টারভিয়ু।'

'যদি একটু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেন—'

'কেন অত তাড়া কিসের ? বাড়িতে কেউ বসে আছে নাকি আপনার জন্যে ?'

'রাত হয়ে গেল, অনেক দূরের রাস্তা। ঝি আবার চলে যাবে।'

'ঝিটাকে চলে যেতে বলুন না। আমি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসব। আমার কাছে পাঁচ শেলের প্রকাণ্ড টর্চ আছে।'

'না, লণ্ঠনের আলোতেই চলে যাবে।'

'সাপ চোখে পড়বে না তাতে।'

'চোখ থাকলে অন্ধকারেও সাপ চেনা যায়।' তামসীর গলা এতক্ষণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভীরুতা ও সংকোচের আচ্ছাদন থেকে বেরিয়ে আসছে তার স্বয়ংপ্রভা। যা অন্যায় ও অসৎ, যা পীড়নকারী ও আচারভ্রষ্ট তাকে প্রতিরোধ করার দৃপ্ত প্রতিশ্রুতি।

'সেটা কি সাপের কৃতিত্ব না আপনার চোখের ?'

'হয়তো সাপের।' তামসী এবার আর উঠে দাঁড়াতে দ্বিধা করল না। নির্বিরোধে সে আর স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত নয়। ভঙ্গিতে নিয়ে আসবে সে প্রতিঘাত, স্থায়ী বিপক্ষতা।

'শুনুন। আপনার সম্বন্ধে একটা কথা তখন জানা হয়নি। এখন জানতে পেরেছি।' মনসিজের স্বরটা ক্রূর, হিংস্র।

তামসীকে যেন কে ঠেলে থামিয়ে দিল।

'আপনার জেল হয়েছিল ?'

'হয়েছিল। আগে শোনেন নি সে কথা ?'

'কি করে শুনব! আপনি তো আপনার য়্যাপ্লিকেশনে দয়া করে তা উল্লেখ করেন নি।'

'কেন ভবদেববাবু জানাননি আপনাকে ?'

'যে বিত্তশালী, মানে শালিই যার বিত্ত, সে আপনার অপযশ গাইতে পারে ? চেপে গেছে, স্রেফ চেপে গেছে।'

'তা চাপবার কি। ও তো জানাই।'

'কিন্তু কারণটা তো চাপবার।'

'কেন ?'

'কারণটা যে কুৎসিত।'

'কুৎসিত।' তামসী জ্বলতে লাগল ভিতরে-ভিতরে।

'হ্যাঁ, নিজের মুখ নিজে কেউ কুৎসিত দেখে না। পরে দেখিয়ে দিলে বরং রাগ হয়। বিষের তেজ থাকেনা, থাকে শুধু কুলোপানা চক্র। বুঝলেন, ঐ চক্রের কোনো মাহাত্ম্য নেই।' তবু তামসী চলে যায় দেখে মনসিজও উঠে পড়ল 'মনে রাখবেন ঐ কারণটার জন্যেই আপনার চাকরিটি ফের চলে যেতে পারে।'

তামসী তবু চলে এল ঘরের বাইরে।

'তক্তপোষের নিচে লোক লুকিয়ে রাখবার কি অর্থ তাই নিয়ে আমাদের ইস্কুলের মেয়েদের গবেষণা করতে দিতে পারিনা।'

তামসী চোখে পরিপ্লাবী অন্ধকার দেখল। মনসিজকে তবু সঙ্গে-সঙ্গে বাইরে আসতে দেখে তামসী হাসল, শেষ হতাশার হাসি। বললে, 'আমি বড্ড ক্লান্ত, আমি আজ যাই। আরেক দিন আসব।'

'তবে এই আসছে রোববারই আসবেন।' মনসিজের উদ্ভাসিত অন্তঃস্থলের ছায়া ভেসে এল তার মুখে 'যেন একটু বেলাবেলি আসবেন। সেদিনই একটু খাওয়া-দাওয়ার জোগাড় করা যাবে। কি বলেন? আচ্ছা, নমস্কার।'

রাস্তার অন্ধকারে নেমে এসে তামসী ঝিকে জিগগেস করলে 'তুমি এর আগে আর কখনো এসেছ?'

কেন বলো তো? এসেছ কিনা বলো। এমনি, আর কারু সঙ্গে? আর একবার এসেছিল, তামসীর আগে যিনি ছিলেন, তার সঙ্গে। তারপর কি হল?

'আমি তো আজকের মত সেদিনও বাইরেই বসে ছিলাম, শুনতে পাইনি, শুনলেও কান দিইনি ওদের কথায়। তবে এটুকু আমার মনে আছে, যে দিন সন্ধের সাহেবের সঙ্গে দিদির মোলাকাত হল তার পরদিন সকালেই দিদি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কলকাতা চলে গেলেন।'

এবং, পরদিন সকালে তামসীও চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে গেল কলকাতা।

গাড়িতে উঠে তামসী বিশ্রাম পেল। এবং গাড়ি ছেড়ে দিলে, অনেকক্ষণ পর, হঠাৎ তার মনে হল, এ সে করেছে কি? এ তো তার পালিয়ে চলে আসা, হার মেনে মুখ লুকোনো। এই কি তার প্রতিপ্রহারের ভঙ্গি নাকি? আগের যে শিক্ষয়িত্রীটি চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন তামসী কি তারই মত অসহায়, অশক্ত? সে কেন পরাভূত, পদানত করে এল না, প্রমাণ করে এলনা তার নিষ্ঠুর দুর্ধর্ষতা। জীবনের কত শত্রু কত দিকে। একজনের দেখা পেয়ে সে তাকে ছেড়ে দিয়ে এল কেন? কেন থেঁতো করে দিয়ে এল না?

তক্তপোষের নিচেটাই যে শুধু দেখে, তাকে সে তখ্ত-তাউসের উপরটা কেন দেখতে দিলনা ?·

হঠকারী মেয়ে। এখন সে কোথায় যায়, কি করে।

একটা স্টেশনে গাড়ি থামল। কাঁচা মাটির স্টেশন। খোয়া-কাঁকরের বদলে খানিকটা রাবিশ ছড়ানো।

একটা লোক হাঁটছে রেলের লাইন ধরে। ঘোরাঘুরি করছে। খালি পা, চুল উসকো-খুসকো। জামায় ধুলো-কাদার দাগ লাগা।

এ-জানলা ও-জানলা করে কিছুতেই তামসী তার মুখটা দেখতে পাচ্ছেনা। বাবাঃ, লোকটা কি সাংঘাতিক নিশ্চেতন, একবার মেয়েদের গাড়ির দিকেও তাকিয়ে দেখছে না। অনেক কষ্টে, লোকটারই অসীম দয়ায়, দেখতে পেয়েছে তার মুখ। রুগ্ন, শীর্ণ, আতঙ্কিত।

না, কেউ নয়। কেউ বললে, পাগল। কেউ বললে, জেল থেকে বেরিয়েছে দরজা ভেঙে।

ছয়

'ঢেউ আমার শাসনে, কঠিন করে টেনে দিয়েছি আমি সীমারেখা। আর নয়, এই পর্যন্ত, জানা আছে আমার থামবার চাতুরালি। আমার নাম চন্দ্রমা না হয়ে হওয়া উচিত ছিল সুষীমা।'

দেবিকার দলে থাকতেই তামসী জেনে ছিল এই 'ছাত্রীছত্রে'র কথা। মেয়েদের বেসরকারি হস্টেল। জানত সে সেখানকার মৃদুলাকে, রাধারাণীকে। তাই কলকাতাতে চলে এসে তামসী সোজা 'ছাত্রীছত্রে'ই উঠল। জায়গা পেল এক কোণে। এবং, সব চেয়ে আশ্চর্য, মৃদুলা ও রাধারাণীর চেয়ে তার ভাব হল বেশি চন্দ্রমার সঙ্গে।

দীর্ঘাকৃতি, দ্যুতিমতী মেয়ে এই চন্দ্রমা। বয়স একুশ-বাইশ। স্কটিশে বি-এ পড়ে। চা-বাগানি করে বাপের অপরিমিত পয়সা। মেয়ে উদ্দীপ্তভাবে তাই অপব্যয় করে। উচ্চণ্ডরূপে সাজগোজ করে। যখন-তখন যেখানে-সেখানে উড়ে বেড়ায়। স্থানীয় অভিভাবক যিনি আছেন, কে এক মেসো, সে তার বুড়ো আঙুলের তলায়, তার অবিশ্রয়ে।

কিন্তু মুখে তার ঐ এক কথা 'ঢেউ আমার, আমি ঢেউয়ের নই। কাকস্নান করি গা ভাসাই না।'

অনেক দিক থেকেই চন্দ্রমা তার থেকে আলাদা, অনেক কিছুই অমিল, এমন কি হয়তো আদর্শে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে, তবু কে জানে, চন্দ্রমাই

তামসীকে টানে বেশি। বোধ হয় সব চেয়ে বেশি আকর্ষক হচ্ছে তার স্বাধীনজীবীতা, তার স্বাতন্ত্র্যদীপ্তি; আর তামসীর মাঝে এই প্রথম চন্দ্রমা দেখতে পেল একটি সংগ্রামসহিষ্ণু বলবর্ধিত নারীত্ব। তাকে মুগ্ধ করেছে তামসীর কঠিন স্বাস্থ্য, কঠিন বিবেক, জীবনের প্রতি একটি কঠিন অভিমুখিতা। সংসারে শুধু সারল্য আর সাধুতাই জয়ী হবে সেই একটি অকম্প বিশ্বাস। শুধু প্রতিজ্ঞা আর প্রতীক্ষার মাঝে দুঃখের সেতু নির্মাণ।

কিন্তু পারে দাঁড়িয়ে থেকে পাশ দিয়ে জীবনের নদীকে বিমুখরেখায় বয়ে যেতে দেবেনা চন্দ্রমা। সে না ডুবলেও গা ভেজাবে অন্তত। উপভোগই হচ্ছে তার মূলমন্ত্র। কিন্তু সে উপভোগের চতুঃসীমা সুনির্ণীত, তার বাইরে যাওয়াটাই হচ্ছে বিপৎপাত তত নয়, যত ছন্দপাত। এই ছন্দপতনটাই হচ্ছে তার মতে সব চেয়ে অসুন্দর। দুটি নিয়মের শাসনে সে আছে—এক, স্বাস্থ্য : আর, শৃঙ্খলা। নিজের বা অপরের কারু শান্তিভঙ্গেই সে রাজি নয়। মোটমাট, সে চালাক, বিচক্ষণ আর সভ্য, আর সভ্যভাবেই জীবন সম্ভোগ করে যাবার সে ব্রতধারী। দুঃখেও তার দুঃখের প্রতি প্রবল অস্বীকৃতি।

'সেই দুঃখের চেহারা তুমি দেখনি। সে রাখতে দেবেনা তোমার সভ্যতা।' তামসী বলে হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে : 'সে নৃশংস, বর্বর।'

'সেটাও একটা উপভোগের বিষয় হবে।'

'রূঢ় বাস্তবে যা আসেনি কল্পনায় তা উপভোগ করায় কোনো পরিশ্রম নেই।'

'রূঢ় বাস্তবে এলেই বা কল্পনা করে নিতে বাধা কি, যে, এটাও আমার একটা উপাদেয় জীবনসম্ভোগ।' রহস্যরঙ্গিল হাসি হাসে

চন্দ্রমা : 'সুদুঃসহ দুঃখের কাছে আমার নিরুপায়তাটাই তো একটা উপভোগের ব্যাপার।'

'বেশি বাজে বোকো না, চন্দ্রমা,' ঈষৎ ঝংকারের মত শোনায় তামসীর গলা : 'হাওয়া খেতে বেরোচ্ছ, যাও, ঘুরে এস গিয়ে মোটরে। তারপর একদিন যখন সংঘর্ষ হবে, চুরমার হয়ে যাবে তোমার মোটর, তখন সেদিন বুঝবে ভাঙা মোটরের যন্ত্রণা।'

চন্দ্রমা হেসে উঠল খিল খিল করে : 'মোটরটা আমার নয় এই যা শান্তি।'

তামসী লজ্জিত হয়ে বললে, 'কথাটা আমি উপমা হিসেবে বলছি।'

'তাই যদি হয়, তবে বলতে পারি তোমার অনুমতি নিয়ে, চুরমার হবেনা আমার মোটর। গতিকে সব সময়ে রাখি নিয়ন্ত্রণে, পাশ কাটিয়ে চলে যাবার কৌশল করেছি আয়ত্ত।' চন্দ্রমা তার ভঙ্গিতে একটি উপেক্ষার স্পর্ধা আনে : 'ঢেউ আমার শাসনে, কঠিন করে টেনে দিয়েছি সীমারেখা। আর নয়, এই পর্যন্ত, শেখা আছে আমার থামবার চাতুরালি। আমার নাম চন্দ্রমা না হয়ে হওয়া উচিত ছিল সুষীমা।'

'অত দর্প ভাল নয়। যেখানে বলছ এই পর্যন্ত, সেখানেই হয়ত ভরাডুবি।'

ঠোঁট ওলটায় চন্দ্রমা : 'আজ্ঞে না, মাপ করতে হল। ঢেউ আমার, আমি ঢেউয়ের নই। কাকস্নান করি, কিন্তু গা ভাসাই না।'

'বেশি কাকস্নান করলে শেষে না ভিজেকাকটি হয়ে ওঠ।'

'সেই ঝড়-জলের দুর্দিন যদি আসেই, তখন না-হয় বদলে নেয়া যাবে চেহারা। দেখো, সেদিনকার সেই দুর্ভাগ্যটাও আমি বিফল হতে দেবনা।'

তামসী পড়ছে তার ঘরে বসে। হঠাৎ ভেজানো দরজা ঠেলে

চন্দ্রমা ঢুকে পড়ল ভিতরে। তার গৌরতনু কালো জর্জেটে ঝলমল করছে, ভুজঙ্গভঙ্গিমায়। বাইরে তখন দিনের অন্তিমা। বললে, 'সেই মোটর এসেছে দুয়ারে। চলো আর পড়তে হয় না।'

'কি বলো। পরীক্ষা এই সামনে, কিচ্ছু তৈরি হয়নি আমার।' তামসী বললে ম্লানমুখে।

'না হোক। তবু চলো।' ক্ষিপ্রহাতে চন্দ্রমা তার বই-খাতা ছত্রাকার করে তুলল। এতটা স্থৈর্য, এতটা লিপ্সাহীনতা যেন সহ্য করা যায় না। একেবারে কাঠ না হয়ে অন্তত কাঠগোলাপ হতে বাধা কি।

কিন্তু, তোমার বন্ধু এসেছে মোটর নিয়ে, সেখানে আমার জায়গা কোথায়? জায়গা নেই জানি, কিন্তু জায়গা একটু করে নিতে আপত্তি কি। এত সংযম-শাসনের মধ্যে আসুক না একটু অনিয়ম। যা অশুদ্ধাচার তার সম্বন্ধে স্পৃহা না হলেও বিশুদ্ধ কৌতূহলে কি দোষ!

অহংকারে ঠোক্কর খেল চন্দ্রমা। ওভারকোটটা অনাবৃত বাহুর উপর তুলে নিয়ে শিস দিতে-দিতে বেরিয়ে গেল।

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে গেল না। তামসী দেখতে পেল হস্টেলের মেট্রন সামনের বারান্দায় পাইচারি করছে। মেট্রনের কথা মনে হলেই তামসীর বুক শুকিয়ে যায়! নাম লজ্জাবতী মিত্র, কিন্তু আকৃতি ও আয়তনে কোনোটাতেই লজ্জা নেই। সব সময়ে ছুঁচলো নাকে শুঁকে বেড়াচ্ছেন কোন ছাত্রীর কোথায় কি শৈথিল্য ঘটেছে। আর এ শুধু ব্যবহারের শৈথিল্য নয়, মাসান্তে হস্টেলের পাওনা চুকিয়ে দেবার অমনোযোগ। তামসীর কিছু বাকি পড়ে গেছে। যখনই তার দিকে বিলজ্জ চোখে তিনি তাকান যেন প্রশ্ন করেন, আর কত ফাঁকি দেবে? এবার ফেলে দাও পাওনা-গণ্ডা। আর যদি বোঝো, কোনো ভবিষ্যৎ নেই, সিধে কেটে পড়।

মাস্টারি ছেড়ে দিয়ে আসাটা তার মোটেই ঠিক হয়নি। চন্দ্রমা ঠিকই বলে, গোঁয়ার হয়ে লাভ নেই, হওয়া উচিত চালাক, সোজা কথায়, ধড়িবাজ। নিজের লাঠিও বজায় থাকে আর সাপও নির্বিষ হয় এই ইচ্ছে জীবনযুদ্ধজয়ের কূটনীতি। নিজেকে ঢেকে রেখে বাঁচিয়ে রেখে প্রতিপক্ষ ঘায়েল করা। রোববার গিয়ে বেঁধে এলেই তো পারত সে মাংস, আর সে-মাংসে এত লঙ্কাবাটা দিত যে সার্কেল-অফিসার সেমি-সার্কেল হয়ে যেত। গায়ে হাওয়া লাগলেই যদি সে মানহানি হয়েছে বলে মনে করে তবে সে-হাওয়াওয়ালার গায়ে জলবিছুটি না দিয়ে পালিয়ে আসাটাও চরিত্রহানি।

কিন্তু ভবদেব লিখেছে অন্যকথা। লিখেছে, যেখানে সম্ভ্রমচ্যুতির ভয় আছে সেখানে চাকরি না করাটাই সমীচীন। ভালই করেছে সে কলকাতায় চলে এসে, 'ছাত্রীছত্রে' আশ্রয় নিয়ে। ফি-ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়েছে আগেই, এখন সে নিশ্চিন্ত হয়ে অনন্যমন হয়ে তৈরি হোক পরীক্ষার জন্যে।

তৈরি যে হবে, মনে সে শান্তি কই? কই সেই অভিনিবেশের শক্তি? কিছুই টাকা-পয়সা না থাকলে কি করে আসবে সেই নির্মল নিশ্চিন্ততা? লজ্জাবতীর লোলুপ চোখ তাকে এমন করে লেহন করলে কি করে পাবে সে মনের বিশ্রান্তি?

আগে-আগে তামসী যখন বেকারের কথা ভাবত তখন তাকে পুরুষ বলে ভাবত। জামা-কাপড় ময়লা, জুতো ছেঁড়া, রুক্ষ চুল, নিদ্রাহীন চোখ—সে একটা ধূলিমলিন উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা। কোনো মেয়েকে এমনি একটা হতজ্ঞান বিভ্রান্ত মূর্তিতে দেখবে সে ভাবতেও পারতনা। সে-মেয়ে সংকীর্ণ স্থান আর সামান্য আহারের জন্যে রুক্ষ রাজপথে বেরিয়ে পড়েছে, শুধু মাত্র জীবনধারণের প্রয়োজনে। এক দরজা থেকে

ধাক্কা খেয়ে আরেক দরজায় গিয়ে উঠছে। তার খসে গিয়েছে চুল, ছিঁড়ে গিয়েছে আঁচল, উড়ে গিয়েছে সৌজাত্যের জৌলুস। সে আর প্রতিমা নয়, সে পঞ্চালিকা। মুক্তি নেই, দেশ নেই, ব্যক্তিত্ববিকাশ নেই, শুধু ক'টা টাকা—জীবিকার্জনের ধূলিমুষ্টি। যে তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ করার কথা সেই অস্ত্র দিয়ে এবাব কুটনো কোটো। যে কাঠে বেজে উঠেছিল বাজনা সেই কাঠে আগুন পোয়াও।

তামসী ছাদে উঠে এল, দাঁড়াল যেখানে পাশেব একটা নিমগাছ বলিষ্ঠ বন্ধুর মত নিভৃতি রচনা করেছে একটু। ভাবল, তার যদি পয়সা থাকত অনেক, কি করত সেই পয়সা দিয়ে? ব্যাঙ্কে-বাক্সে তুলে রাখত, না, তা দিয়ে কিনত সে দুটো রঙিন উপকরণ, দুটো অন্তত প্রদীপ্ত মুহূর্ত? সে কি তখন জীবনটাকে একটু দেখত না ঘুরে-ফিরে, কুড়িয়ে নিত না দুটো টাটকা সুযোগ, হঠাৎ-হাওয়ায় ভেসে-আসা অনামী ফুলের গন্ধের মত? তখনো কি এমনি কাটত তার মলিন দিন, একটানা রাত? অন্যরকম বিপদ ও অন্যরকম সাহস দিয়ে হত না কি তখন নতুন উদ্ভাসন? সে কি তখন চাইত না শরীরের স্বাচ্ছন্দ্য, জীবনে একটি কোমল আলস্যবিন্যাস? তখনো কি সে এমনি রুক্ষতার সঙ্গেই সখ্য রাখত?

পরীক্ষার দিন, মাঝখানে, চিঠি এল একটা উষসীর।

লিখেছে; দিদি, আমার বিযেব কথা হচ্ছে। মোটেই আমাব মত নেই। তুমি শিগগির একবারটি এস।

মত নেই, চিঠি পড়ে তামসী ধমকে উঠেছিল। বিয়ে ছাড়া পথই বা কি আছে উষসীর! সেদিনকার মেয়ে, এরি মধ্যে কি ফাজিল হয়ে উঠেছে দেখ না! সাপের পাঁচ পা দেখেছে মেয়ে—বিয়েতে মত নেই! বকতে পারেনা, তাই তামসীকে নিঝাঁজ রাখতে হল উত্তর। লিখলে,

যদি বাঁচতে চায়, এই বিয়ের মধ্যে দিয়েই ঊষসী বাঁচবে। বোধ হয় প্রত্যেক মেয়ের সেই বাঁচবার পথ।

কিন্তু তুমি বাঁচবে কিসে? জানিনা। পৃথিবীর অমৃততীর্থে আমি একজন নিঃসঙ্গ তীর্থঙ্কর।

ক'টা দিন তামসী বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল চন্দ্রমার থেকে। আজ পরীক্ষান্তে নিজেকে যেন সে একটু সাহসী মনে করলে। একটু বা মুক্তদ্বার।

চন্দ্রমা তখন তার মুখে বৈকালিক ভ্রমণের ভূমিকা লিখছে, তামসী ঘরে এসে ঢুকল।

'আশা করি তুমি কখনো মিথ্যে কথা বলো না।' তামসীর উপক্রমণিকাটা আক্রমণাত্মক।

'পারতপক্ষে নয়।' পক্ষ্মরেখায় সুর্মা টানতে-টানতে বললে চন্দ্রমা।

'সেদিন যে বলছিলে চাকরি জোগাড় করে দিতে পারো একটা—সত্যি? না, ধাপ্পা?'

'সত্যি।'

পাওয়া যায়? চাইলেই পাওয়া যায়। কি চাকরি? তা ঠিক জানিনা। যে ভদ্রলোক দেবেন তাঁর সঙ্গে দেখা করে সেটা ঠিক করতে হবে। কমপক্ষে কত মাইনে হতে পারে? অন্তত একশো টাকা। বেশিও হতে পারে চাপ দিলে।

বুকের রক্ত দুলে উঠল তামসীর। 'কবে দেখা হতে পারে ভদ্রলোকের সঙ্গে?'

'ইচ্ছে করলে আজই।'

'কখন?'

'ইচ্ছে করলে এক্ষুনি।'

'কোথায় ?'

'তাও সেই ভদ্রলোকই ঠিক করবেন।'

'তবে কি করে জানানো যায় ভদ্রলোককে ?' তামসী যেন ফাঁপরে পড়ল।

'একটুখানি অপেক্ষা করলেই জানানো যায়। ভদ্রলোক এখুনি আসছেন তাঁর গাড়ি নিয়ে।'

এ শুনে তামসী কি দমে গেল ভয়ানক ? বসে পডল মাটিতে ? কিংবা, ছাদ কি ভেঙে পড়ল মাথার উপর ?

চন্দ্রমা বাঁকা চোখে তাকাল একবার তামসীর দিকে। মাহাত্ম্য নেই আর তোমার শূন্যগর্ভ শুচিতায়—চাউনিটার সেই মানে।

মূর্খ নয়, ধূর্ত হতে হবে। নিজেকে করতে হবে পলায়নপর নয়, পিচ্ছিল। হতে হবে মৃগয়ার মৃগ নয়, মরুভূমির মৃগতৃষ্ণা। চন্দ্রমার কথাগুলো মনে পড়তে লাগল তামসীর।

না, তা কেন ? সে বিপ্লবিনী। তার ভয় কিসের ?

'তবে আজকেই দেখা করার বন্দোবস্ত করে দাও।' বলে ক্ষিপ্রবেগে তামসী চলে গেল তার নিজেব ঘরে।

কিন্তু তাব নিজের ঘব করলে না তাকে কোনোই সংবর্ধনা। অগত্যা আবার তাকে চন্দ্রমার ঘরেই ফিরে আসতে হল। সঁপে দিতে হল চন্দ্রমার হেপাজতে। শাদা জমির সূক্ষ্ম একটা শাড়ি নিল বেছে। চন্দ্রমার পক্ষে সেটাই অত্যন্ত সাধারণ। সমতা রেখে ব্লাউজ। গায়ে আঁট হবে একটু, কিন্তু উপায় নেই। শাড়ির ঘূর্ণিতে বলয়িত হয়ে উঠল বা একটি লীলার পেলবতা। যা ছিল নিহিত তাই হল রেখায়িত। যেখানে ছিল নিদ্রা সেখানে এল আন্দোলন।

তামসী কি খুব সংকুচিত হচ্ছিল এই উদ্ঘাটনে ? কেউ হয় ?

চন্দ্রমা যেন বা একটু জয়ের আনন্দ পাচ্ছিল। যা শক্ত তাকে একটু শিথিল দেখে, যা নিবৃত্ত তাকে বা একটু প্রলুব্ধ করে। তামসীর চুলে ও মুখে টুকিটাকি মেরামত করে দিয়ে চন্দ্রমা বললে, 'মনের উপর প্রথম ছাপটা ভালই হবে আশা করি। মাইনেটা বাড়লেও বাড়তে পারে।'

'কিছু আগাম পাওয়া যেতে পারে মাইনে?' অভাবের আর্তিটুকু ঢাকবার জন্যে হাসল তামসী।

'তোমার যে বাঙালী ব্যবসাদারের মত ব্যবহার। বসতে না বসতেই লাভ।' চন্দ্রমার হাসিটুকু সানুকম্প।

পরিচিত হর্ন বেজে উঠল। লজ্জাবতী দেখেও দেখলেন না তামসীর এই নতুন উন্মুক্তি। তাঁর কর্ত্রীত্বের চৌহদ্দি সদর দরজার চৌকাঠেই শেষ হয়েছে। নটার মধ্যে হস্টেলে ফিরে এলেই তাঁর প্রভুত্ব অপরাভূত থাকবে। বাইরে যা খুশি করুক, ছাদে উঠে প্রতিবেশী মহলে উপস্থিতিটা উচ্চারিত না করলেই তাঁর হস্টেলের নাম থাকবে, তাঁর রোজগারে খাঁকতি পড়বে না।

যেন কত কালের চেনা এমনি অবলীলায় অধিপ খুলে দিল মোটরের দরজা। চন্দ্রমার ইঙ্গিতে আগে ঢুকল তামসী, বসল গিয়ে দূরের কোণ ঘেঁসে। চন্দ্রমা পশ্চাদনুসরণ করলে, কিন্তু বসল গিয়ে প্রতীপ কোণে। মাঝখানে অধিপ। হুইলে স্যোফার।

'আমার যে বন্ধুর কথা আপনাকে বলেছিলাম, ইনিই সেই।' চন্দ্রমা পরিচিত করিয়ে দিল: 'আমার ডাকাত-বন্ধু।'

'ও! নমস্কার।' না তাকিয়েই অধিপ বললে।

কেননা তাকাবার প্রয়োজন নেই। তামসীর আসার সঙ্গে-সঙ্গেই তার চোখের উপর ক্ষণিক যে একটি ছায়া দুলে উঠেছিল তাতেই অধিপ

অনুভব করে নিয়েছে তামসীকে। রোদের দিকে না তাকিয়েও উপলব্ধি করা যায় তার উপস্থিতি। তেমনি অধিপ মুহূর্তমধ্যে হৃদয়ঙ্গম করে নিয়েছে তামসীর বর্তমানতা। দৃঢ়, সমর্থ, সজীব। রূপ জিনিসটাকে অধিপ চিরকাল অবান্তর মনে করে এসেছে, সন্দেশের উপরে রাংতার আস্তরের মত। তার কাছে মূলকথা হচ্ছে প্রাণবাহিতার দীপ্তি। সেই দীপ্তিতে তামসী প্রদ্যোতিত। ও যে ডাকাতি করবে তাতে আর আশ্চর্য কি।

'আর ইনি হচ্ছেন অধিপ মজুমদার।'

সাত

'আপনিই কি সেই অধিপ মজুমদার?' উত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন করল তামসী।

হ্যাঁ, আমিই সেই। সেই মার্কামারা। আগে ভাবতাম, সন্ত্রাসবাদটাই বুঝি পথ, শর্ট-কাট। এখন বুঝতে পেরেছি, দেশের ধন লুট কবে দেশের ধন ফিরিয়ে আনা যায়না। পদ্ধতিটা যেখানে হীন্ সেখানে ফলও অবস্ত। পথশ্রম সংক্ষেপ কবতে গেলে তীর্থযাত্রাবও ব্রতনাশ হয়।

সন্দেহ কি, আমিই সেই। কিন্তু বদলে গেছি, মানে দল বদলেছি।

'আমরা দল বুঝি না, লোক বুঝি। দল যাই হোক, লোক যদি ঠিক থাকে, খাঁটি থাকে, তা হলেই আমরা কৃতকর্ম।' বললে তামসী, আর বলতেই চোখাচোখি হল অধিপের সঙ্গে।

অধিপ ধাক্কা খেল বুকের মধ্যে। সে কি ঠিক আছে? খাঁটি আছে? না, স্বীকার করতে সংকোচ নেই, তার নেই আর সেই বলবান পবিত্রতা। সে খারাপ হয়ে গেছে, পড়ে গেছে নিচে খসে। কিন্তু তার এই আদর্শভ্রংশেও সে জাতিচ্যুত হয়নি, এখনো আছে সেই অহংকারের চাকচিক্য। পথ বদলালেও যে উদ্দেশ্য বদলায় না, বরং পথ-বদলানোটাই যে চলবার ক্ষমতা, এমনকি যোগ্যতার প্রমাণ করে, এমনি একটা ব্যাখ্যা দিয়ে নিজের নিষ্ক্রিয়তা ও শীতলতাকে সে উজ্জ্বল

করে রেখেছিল। কিন্তু সে জানে মনে-মনে, সে বিচ্যুত, অপহৃত, শূন্যীকৃত। তামসীর চোখের দৃষ্টিতে সে যেন আরো স্পষ্ট করে ধরা পড়ল নিজের কাছে।

হ্যাঁ, সে খারাপ হয়ে গেছে। আর এই খারাপ হওয়ার জন্যে দায়ী তার বাপ, প্রমথেশ। দেশ-পলাতক জমিদার, থাকেন কলকাতায়, অকর্মক সুখোপভোগের মধ্যে। সমস্ত জীবন পরিব্যাপ্ত করে শুধু এই অনুভব, যেন তাঁর এই ভোগ্যাধিপত্য দিনে-দিনে যুগে-যুগে বংশে-বংশে অবিনশ্বর থাকে। যেন একখানাও ইঁট না খসে তাঁর স্পর্ধিত বনেদিয়ানার। তাঁর মিরাশকায়েমী স্বত্বের উপযুক্ত প্রতিভূ তৈরি করবার জন্যে তিনি তাঁর একমাত্র ছেলে অধিপকে রেখেছিলেন নিশ্ছিদ্র শাসনে, দুর্ভেদ্য দেয়ালের বেষ্টনীতে। সমস্ত দিনরাত্রি ঘড়ির কাঁটায় চিহ্নিত করে। কার সঙ্গে সে কথা কইছে; কেন বাড়ি ফিরতে পাঁচ মিনিট দেরি হল, কে লিখল ও-খামের মধ্যে চিঠি, প্রতি পদে জবাবদিহি, প্রতি পদে অপমান। প্রতি পদে অধীনতার অন্তর্দাহ। শেষ পর্যন্ত এক সন্ন্যাসীকে রাখলেন প্রাইভেট-টিউটর। আর সেই সন্ন্যাসীর কাছেই সে বিপ্লবের মন্ত্র পেল। ওঠবার, জাগবার, সতেজ মেরুদণ্ডে দণ্ডায়মান হবার। ধর্ম শেখাতে এসে শিখিয়ে দিলেন কর্ম ছাড়া ধর্ম নেই। অধিপ পালিয়ে গেল বাড়ি ছেড়ে। সমস্ত দেশময় উল্কাপুচ্ছে উড়ে বেড়াতে লাগল। খবরের কাগজের পৃষ্ঠার মাথায় জায়গা পেল বড়-বড় অক্ষরে। কর্মটা অপকর্ম কিনা বিচার করে দেখবারও সময় পেল না, অন্যকে উত্তেজনা জোগাচ্ছে মনে করে নিজেকে নিরন্তর উদ্ধাবিত রাখলে। গোল্ হচ্ছে কিনা দেখবার দরকার নেই, শুধু গ্যালারির দিকে তাকিয়ে বল্ নিয়ে দৌড়ধাপ।

অনেক বছর পর জেল থেকে বেরিয়ে এল অধিপ। প্রমথেশ মহা

সমস্যায় পড়লেন কি করে এবার নির্বিষ করবেন ছেলেকে, মানে, তাঁর সংজ্ঞানুসারে মানুষ করে তুলবেন। হিতৈষীরা বললেন, এবার ওকে খারাপ করে দাও। অনেক ক্লেশ পেয়েছে এত দিন, এবার ওকে দাও আরামের নির্যাস। আগে-আগে একটি পয়সা দিয়েও হিসেব নিতেন, এখন থেকে অযাচিত ভাবে অবারিত অর্থ ঢালতে লাগলেন। সন্ন্যাসী গৃহশিক্ষক রেখেছিলেন আগে, এবার রাখতে চাইলেন যামিনীজাগরা গৃহপ্রভা। আবার সেই বাঁধাধরা একানুগতি। অধিপ আবার বুঝি বিদ্রোহ করে! না, দরকার নেই, প্রমথেশ তাকে পাঠিয়ে দিলেন ইউরোপে, আত্মলীলার নাট্যভূমিতে। আর তার ব্যাঙ্কের জিম্মায় রেলে দিলেন অফুরন্ত পয়সা। এত পয়সা যে ক্লান্ত করে দিতে পারে দু' বছরে।

দেশ এখন নিয়মতান্ত্রিক শাসনসংগঠনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। নিশ্চিন্ত হয়ে অধিপ দেশে ফিরল, ভাবল জনতার কাছে আর কোনো তার জবাবদিহি করবার নেই। ফুরিয়ে গেছে তার পার্ট, রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে এখন সে বসতে পারে এসে দর্শকের চেয়ারে। মুখে রঙ যদি কিছু লেগে থাকে তো থাক। লোকে চিনতে পারবে।

লুকিয়ে ভালো করে তামসী একবার দেখল অধিপকে, একমুহূর্ত্ত। কি যেন ভেবেছিল আর কি যেন দেখল। গায়ে গরম বিলিতি স্যুট, উগ্ররূপে নির্ভাঁজ। বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ, কপালটা বিস্তৃত দেখাচ্ছে চুলের বিরলতায়। উত্তুঙ্গ আভিজাত্যের ঔদাসীন্য আছে চরিত্রে, হয়ত বা পার্থিব ভোগাকাঙ্ক্ষা। তবু গোপনে-গোপনে কেমন আপ্যায়িত হল তামসী, অনুভব করল বা স্বজনের প্রতিবেশিতা। চাকরিটা না-জানি কি।

অধিপ পকেট থেকে সিগারেট-কেস বের করে চন্দ্রমার দিকে বাড়িয়ে

ধরল। লম্বা আঙুলে তুলে নিল একটা চন্দ্রমা। একটু দোমনা করে সিগারেট-কেসটা অধিপ ফের চালান দিল পকেটে। তার দিকে যে বাড়িয়ে ধরেনি তাতে তামসী নিজেকে শ্লাঘ্য মনে করল, হয়ত অধিপ বুঝে নিয়েছে এক পলকে সে অমন হালকা-পলকা মেয়ে নয়। সে ধোঁয়ার দেশের মেয়ে নয়, আগুনের দেশের মেয়ে। কিংবা কে জানে যেখানে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক হবে সেখানে চলেনা অমন অন্তরঙ্গতা।

তাকিয়ে দেখল মধুর অবলীলায় চন্দ্রমা ধূমপান করছে। আলতো করে ধরেছে সিগারেটটা বাঁ হাতের তর্জনী আর মধ্যমায়, দুই ঠোঁটের কোণের কাছটা মৃদু-মৃদু স্ফুরিত করে টেনে নিচ্ছে দীর্ঘ ধূমরেখা। চোখের পরিসর সামান্য হ্রস্ব হয়ে আসছে, নিবিড় একটি স্পর্শসুখের অনুভবে। তামাকের সতেজ-সুন্দর গন্ধটা বুকের মধ্যে খানিকক্ষণ রেখে দিচ্ছে আটকে, মদির সুখস্মৃতির মত। তারপর নাক দিয়ে মুখ দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে ধোঁয়া, গভীর শৈথিল্যে, যেন সমস্ত নিরর্থক এই ক্লান্তিময় চেতনায়। আবার তখুনি লুব্ধের মত দীর্ঘতর টান দিচ্ছে দ্বিতীয়।

সমস্ত কেমন' অচেনা লাগছে তামসীর। এই মোটর, এই গতির কোমলতা, এই রক্তের মধ্যে শীত। যেন অভাবের তাডনায় কোন এক গহ্বরের মধ্যে সে এগিয়ে চলেছে।, তবে কি এখুনি সে গাড়ি থামিয়ে নেমে যাবে নাকি ? যেমন চাকরি ছেড়ে চলে এসেছিল সে ঊর্ধ্বশাসে ? তারপর ভবদেবের কাছে টাকা চেয়ে পাঠাবে ? না, ভয় কিসের ! অধিপ যে একদিন দেশের জন্যে দুর্দিন ডেকে নিয়ে এসেছিল তার জীবনে, সহ্য করেছিল দুর্বহ যন্ত্রণা, সেইখানেই তো তাব আশ্রয়। দেশকে সে আজ ভুললেও দেশের জন্যে সেই দুঃখ পাওয়াটাকে হয়তো ভোলেনি।

মসৃণভাবে থেমে গেল মোটরটা। তামসী বুঝল এটা হোটেল। প্রতীক্ষমান অনেককে ঈর্ষান্বিত করে অধিপ সঙ্গিনীদের নিযে তার নিজের জন্যে পৃথকীকৃত কামরাতে গিয়ে ঢুকল।

বসতেই কথাটা পাডল চন্দ্রমা : 'এব জন্যে চাকরি যেটা বলছিলেন—'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, কটা চান উনি চাকরি? দাঁড়াও, কথা বলতে গলাটা আটকে আসছে। গলাটা আগে একটু ভিজুক।'

তিনটে ছোট-ছোট গ্লাশে সবুজ-মতন কি খানিকটা তরল জিনিস ঢেলে দিযে গেল। তামসীব না-বুঝেও বুঝতে বাকি বইল না জিনিসটা কি। সমস্ত শরীর কাঠ হয়ে গেল, মন গুটিযে গেল শামুকের মত। তবে কি এখন সে পালিযে যাবে বাস্তায? একা ট্র্যাম ধরবে?

'জিনিসটার নাম জেনে, বিশেষত বাঙলা নাম জেনে, লাভ নেই। বেশ মিষ্টি, খেযে নাও আস্তে-আস্তে, একটু-একটু কবে। যা শীত, দেখবে চাঙ্গা হযে উঠবে এখুনি।' চন্দ্রমা পিড়াপিডি করতে লাগল।

কিন্তু অধিপ অনুবোধ করল না। তামসী জানে, পারবে না অনুরোধ করতে। মনে-মনে জোব পেল। ভাবল পালিয়ে যাবার মানে হয়না কোনো।

খাবার এল রাশীভূত। এমন বর্ণ এমন গন্ধ এমন স্বাদ কল্পনা করতে পারত না তামসী। তার মনে হতে লাগল সমস্ত ক্ষুধাই তো ক্ষুধা, কিন্তু সমস্ত পরিতৃপ্তিই কি এক?

'আপনাকে আমার একটা চাকরি দিযে দেবার কথা—তাই না? কিন্তু করবেন আপনি সেই চাকরি?' অধিপ সসংকোচে জিগগেস করলে।

'কেন, কী চাকরি?' প্রশ্ন করল চন্দ্রমা।

'সেইটেই ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না। বরং উনি যদি বলেন, চাকরিটা কোন ধরনের হবে—'

তামসীর কি-রকম ঘুলিয়ে উঠল। বললে, 'কোনো আপিসে চাকরি তো?'

'আপিস-টাপিস আমার জানা নেই। আমার ফ্ল্যাটই আমার সব—আমার স্বর্গ-মর্ত। আপনাকে যে শেষকালে আমি একটা আপিসের কেরানি করব আমার রুচি এত অপদার্থ নয়।'

'তবে আপনার বাড়িতে?' চন্দ্রমা একটু বেঁকিয়ে বললে।

'ছেলেপিলে পড়াতে হবে?' বললে তামসী।

'রক্ষে করুন। মাস্টারির বাইরে মেয়েরা কি কিছু আর ভাবতে শিখবে না?'

'তবে—'

'এটাকে অবিশ্যি কাজ বলে না, যদিও মাইনে দিতে হবে বলে এটাকে একটা কাজের চেহারা দিতে হবে। দেখুন, আমি কাউকে একটা চিঠিও লিখি না যে কাউকে দিয়ে তা লিখিয়ে নেব। ঘরে একটাও টাইপ-রাইটার নেই। এমন কোনো ব্যবসা করিনা যে দালালি করবার জন্যে স্ত্রীলোক এজেন্ট রাখব। লেখক নই যে ডিকটেশন দেব। চিত্রী বা ভাস্কর নই যে মডেলের দরকার হবে। অথচ চাকরি দিতে হবে আমাকে। এবং সেটা এক্ষুনি। অন্যত্র চেষ্টা করলে দেরি হতে পারে, সুতরাং আমারই অধীনে। বলুন ঠিক কিনা—'

চন্দ্রমা বললে, 'হ্যাঁ, হল। ভূমিকাটা দীর্ঘ করার এখনো কোনো কারণ ঘটেনি।'

'তাই, ভাবছি, ধরুন, এমনি ধরনের কাজটা। আপনার যেদিন খুশি যখন খুশি এলেন, আমাকে পেলেন, পেলেন: না পেলেন তো

আপনাব ছুটি হযে গেল। যদি পেলেন, একটু বা গল্প করলেন, আলোচনা করলেন আমার সঙ্গে। কাব্য বা দর্শন নয়, চলতি খবর, দেশেব অবস্থা, বর্তমান বাজনীতি—এমনিতর সব ঘবোয়া বিষয়। ইচ্ছে কবলে একদিন একটু বেড়ালেন, ইচ্ছে না করল তো চুপচাপ বসে থেকে চলে গেলেন এক সময—'

তামসী যেন কেমন বিদেশে এসে পড়ল। পথঘাটেব যেন কোনো দিশপাশ নেই।

'কি করে বোঝাই আমি বুঝছি না। যাকে বলতে পারি কম্প্যানিযন, ফ্রেণ্ড—সঙ্গী বন্ধু—'

'কো-ওযার্কাব, সহকর্মী'—তামসী যোগ কবে দিল।

'ওযার্ক? আমাব কাজ আর কিছু আছে?'

'আছে। কাজ কখনো কারু শেষ হয?'

'তবে, বেশ, তাই, আমাকে কাজ দেবাব জন্যই তবে আপনি কাজ নিন।' অধিপ অনেক দিন পব যেন তার পথেব মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'কিন্তু কত মাইনে দেবেন?' চন্দ্রমাব কথাটা সব চেযে কাজের।

তামসীর লজ্জা করতে লাগল। কিন্তু উপায় নেই। মাইনে ছাড়া চাকরি হয না।

'আমিই বলে এনেছি একশো টাকা। কি, দেবেন?'

অধিপ হাসল।

'তার মানেই দেবেন। বেশ, ভালো কথা, এবার কিছু য়্যাডভান্স দিয়ে দিন।' চন্দ্রমা তার ভঙ্গিতে আবার কর্ত্রীত্বের ভাব আনল: 'আপনার মুখের কথায় বিশ্বাস কি। আপনার বোনাফাইডিস প্রমাণ করুন।'

এ প্রায় ছাল-ছাড়ানোর মত বর্বর। নিজেকে অত্যন্ত ক্লিষ্ট মনে হতে লাগল তামসীব, প্রায় নীচাশয়। সে কুণ্ঠিতেব মত বললে, 'সম্প্রতি একটু অনটনে আছি বলে য্যাডভান্সেব প্রস্তাব করেছিলাম। কিন্তু তাব কোনো দবকাব নেই।'

'কেন? নাচতে এসে ঘোমটা টানা কেন?' চন্দ্রমা ঝিকিয়ে উঠল 'অভাব অথচ দবকাব নেই এ আবাব কোন দেশী ন্যাকামো?'

অধিপ তাব মনিব্যাগেব গহ্বরগুলি পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। বিল ঢুকিয়ে দিয়ে একটা ক্ষুদ্র অংশ পকেটে স্থানান্তরিত করে গোটা ব্যাগটা সে তামসীর হাতেব মধ্যে—অনিচ্ছুক অথচ অনিবারিত হাতেব মধ্যে গুজে দিল। বললে, 'তিরিশ টাকা রইল—প্রায় এব তৃতীয়াংশ। ব্যাগটাও নিন, কেননা সঙ্গে আপনাব ভ্যানিটি ব্যাগ দেখছি না।'

মুণ্ডুটা কাটা পড়লেও ধড়টা খানিকক্ষণ তড়পায়, পবে শান্ত হয়। খানিকক্ষণ ক্লান্তিব দোমনা ভাবেব পব তামসী স্থিব হল। মনিব্যাগটা সে গ্রহণ কবলে।

রাস্তায় দাঁড়াল এসে তিনজন। শীতটাকে ভাবি সুন্দব লাগল তামসীব, রাতটাকে আশ্চর্য। পথেব জনতাব কারু কোনো দুঃখ আছে এ কথাটা ভুলে গেল মুহূর্তেব জন্য।

'আসুন'—গাড়িব দবজা খুলে দিল অধিপ।

আগের বাবেব মতই তামসী আগে উঠল। এবাব চন্দ্রমা। কিন্তু চন্দ্রমা কোথাও নেই। সে জানে তাব সীমাবেখা। সে তাই একটা ট্যাক্সি কবে একা পালিয়ে গেছে।

তামসীর ভয় করে উঠল। বললে কটা বেজেছে?'

অধিপ তাব পাশে বসে বললে, 'নটা বাজে। দশ মিনিট বাকি।'

'আমাকে তবে এখুনি হস্টেলে ফিরিয়ে নিয়ে চলুন।' তামসীর গলায় ফুটে উঠল বা ভয়ের ব্যাকুলতা।

অধিপ কোনো কথা বলল না। চুপ করে রইল। তার মুখ স্পষ্ট দেখা গেল না। কি যেন সে ভাবছে মনে-মনে।

আট

অধিপ ভাবতে চেষ্টা করল এমন অবস্থায় করেছে কি সে আগে-আগে। হোটেল থেকে ফেরবার পথে, ধাবমান মোটরে। ভাবতে চেষ্টা করল। অধিপের হাসি পেল মনে-মনে। আগে-আগে সে মোটে ভাবতেই চেষ্টা করেনি।

কনুই থেকে মণিবন্ধ পর্যন্ত তামসীর রিক্ত, দৃঢ় হাতখানি চোখের উপর স্থির হয়ে রইল। সে হাতে সেবা, কর্ম, শক্তি। নিঃশঙ্কতা। স্পর্শ করবে এমন চিন্তা মনেও এল না। যে দেশকে অনেক দূরে ফেলে এসেছে, যেন সেই দেশের ইসারা। এত কাছে থেকেও যে অতি দূরে।

হঠাৎ বাঁক নিয়ে মোটর চলে এল ছাত্রীছত্রে। একেবারে কাঁটায় কাঁটায়।

'কবে যাব ?' গাড়ি থেকে নেমে এসে খুশিমুখে জিগগেস করলে তামসী।

'যেদিন আপনার দয়া।'

'আচ্ছা, নমস্কার।'

'নমস্কার।' অধিপ ছুটল ফের হোটেলের দিকে।

সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত পায়ে উঠে এল তামসী।

'চমৎকার !'

সংক্ষিপ্ত এই উচ্ছ্বাসটা সত্যিকারের বিস্ময়ের চেহারা নিয়ে তামসীরই

গলা থেকে বেরুনো উচিত ছিল, কিন্তু কথাটা এল চন্দ্রমার ঘর থেকে, আর আশ্চর্য, শ্লেষসিক্ত হয়ে।

'চমৎকার!'

কথাটা তামসীকেই চিহ্নিত করছে। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকল চন্দ্রমার। কিন্তু তার মুখের দিকে তাকিয়ে সে অবাক হয়ে গেল। কেমন ছোট দেখাচ্ছে বাত চোখ, চক্রীর চোখের মত। তার গ্রাম্যতাব দরুন কোথাও কোনো ভুল ক্রটি হয়ে গেছে কিনা তারই ভয়ে তামসী বোকার মত জিগগেস কবলে, 'কোনো বোকামি করে ফেলেছি নাকি?'

'বোকামি? তুমি করবে বোকামি? তুমি একটি পাকা, ঝান্থ, ঘুঘু মেয়ে।'

তামসী অন্ধকার দেখল : 'সে কি, বা, আমি কি করলাম!'

'তা তুমিই জানো। বলি, চাকরি কি আজ থেকেই সুরু হয়ে গেল? মাঝরাতের আগেই এত সকাল-সকাল ছুটি মিলে গেল আজ?'

'বা, তুমিই তো পাইয়ে দিলে চাকরিটা!'

'বা, আমিই তো পাইয়ে দেব! কেউ কি আব অমনি নিজে থেকে নষ্ট হয়? আরেকজন তাকে টেনে আনে, পথ দেখায়। যে পাপী তার চেষ্টা থাকে কি করে পাপকে আরেক রক্তে সংক্রামিত করে দেবে। কিন্তু তাই বলে তুমি মাথা গলাবে কেন? তোমার কেন জোর নেই, চরিত্রেব জোর?'

এমন ভাবে আঘাত আসবে ভাবতে পারত না তামসী। চোখের দৃষ্টিটা কেমন ভোঁতা হয়ে গেল। বললে, 'চাকরির জন্যে—

'চাকরির জন্যে? চাকরিটা কি তা জানো?'

'কি?'

'এককথায় বলতে গেলে বলতে হয়, রক্ষিতা। মাইনে বোলো না, বোলো মাসোয়ারা। মাসোয়ারা একশো টাকা।'

'ভদ্রভাবে কথা বলো, চন্দ্রমা।'

'ভদ্রভাবে বলতে হলে, বলতে পারি, পার্শ্বচারিণী। কিন্তু কাদম্বরীর তাম্বূলকরঙ্কবাহিনীর মত উপেক্ষিতা থাকবে না। মৃণালতন্তুরও ব্যবধান থাকবে না শেষ পর্যন্ত। বুঝলে হে তমসাবৃতা? একটু তলিয়ে ভেবে দেখতে চেষ্টা কর।'

তামসীর চোখে জ্বলন্ত যন্ত্রণা।

'ফিরে যাবার পথ নেই।' চন্দ্রমার চোখে জ্বলতে লাগল উজ্জ্বল নির্মমতা: 'হাতে করে টাকা নিয়েছ। দাগ লেগে গেছে গায়ে।'

'কে চায় ফিরে যেতে?' বলে উঠল তামসী। অত্যন্ত স্পষ্ট শোনালো কথাটা।

একটু অদ্ভুত লাগল চন্দ্রমার। বিলোল করে তাকাল একবার তামসীর দিকে। বললে, 'তা জানি। কিন্তু ভেবে অবাক লাগছে সার্কেল-অফিসারের রোববারের মাংসটা রেঁধে দিয়ে এলে না কেন? তখন কেন অত লম্বাই-চওড়াই করেছিলে?'

'সেখানে টাকাটা কম ছিল। হয়ত বা ছিলই না। আর সার্কেল-অফিসারের চেহারাটা ছিল কদাকার।'

চন্দ্রমা যেন বসে পড়ল মাটিতে। জোরে নিশ্বাস ফেলে বললে, 'যাক, ভাবনা ঘুচল। আসল চেহারাটা দেখতে পেয়ে স্বস্তি পেলুম।'

'আমিও।'

'তুমিও? তুমি দেখলে কার চেহারা?'

'তোমার। ঈর্ষায় তোমার এই কালীমূর্তি।'

'ঈর্ষা?'

'তা ছাড়া আর কি। আমার হস্তক্ষেপে তোমার আধিপত্য নষ্ট হতে বসেছে এ আর তোমার সহ্য হচ্ছে না। কে কোথাকার একটা বাজে মেয়ে তোমার মত বড়লোক আর রূপসী মেয়ের শিকার কেড়ে নিতে বসেছে এ ভেবে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছ তুমি—'

মিহি ভাবে চন্দ্রমা হেসে উঠল। 'তাই যদি হয় তবে তোমাকে আমি সেধে নিয়ে আসব কেন টেনে?'

'ভেবেছিলে আমিও হয়তো তোমার মত গুহার মুখে দাঁড়িয়ে গুটিয়ে নেব নিজেকে। নিচে নামবার প্রথম সিঁড়িতে পা দিতে না দিতেই তুলে নেব পা। তোমার মত জেনে রাখব সীমারেখার নির্দেশ। কিন্তু তুমি দেখলে, আমি শেষ পর্যন্ত তলিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত, তোমার অরিপবাবুকেও পর্যন্ত ভাসিয়ে নিয়ে চলেছি। দেখলে আমার মাঝে সেই সম্মোহিনী শিখা। দেখলে তোমার নিজের হার, নিজের অসামর্থ্য। তাই—তাই—' তামসী চলে গেল তার নিজের ঘরে।

নিজের ঘরে এসে প্রথমেই সে বেশান্তরিত হল। নিজের জামা-কাপড় ফিরে এসে পেল সে স্নিগ্ধ পরিবৃতি। নিজের পরিবেশে পরিচিত সন্তোষ। ঘরে অনেক মেয়ের ভিড়, ব্যঙ্গময় কৌতূহল। একটি একাকী ঘরের জন্যে মন তার আনচান করে উঠল।

জামা-কাপড়ের বাণ্ডিলটা ফিরিয়ে দেবার জন্যে একসময়ে গিয়েছিল সে চন্দ্রমার ঘরে। চন্দ্রমা অপরিবর্তিত বেশবাশেই চুপচাপ শুয়ে আছে চোখ বুজে। ভঙ্গিটা পরিক্লিষ্ট। কেউ কোনো কথা বলল না। চন্দ্রমা টেরই পায়নি হয়তো তামসীর আসা আর চলে যাওয়া, এক পলকের বেশি এই না-দাঁড়ানো।

চন্দ্রমার এই একা থাকাটিকে হিংসুক চোখে দেখল তামসী। এই একা ঘরের সুবিধেয় সে ভঙ্গি এমন শিথিল করতে পেরেছে, নিঃসঙ্কোচে

তার ক্লান্তিকে করেছে উন্মোচন। কবে এমনি একটি একা ঘব পাবে তামসী? তা হলে কি হত? নিঃসঙ্কোচে কাঁদত সে কি আজ? গুন-গুনিয়ে গান গাইত? অনুপস্থিত কাৰু সঙ্গে আলাপ কবত মৃদুভাবে?

তামসী পালাল। পব দিন ত্নপুবেব দিকে ট্রেন ছিল, তাইতে। পালাল—তাব বাড়ি, তাব কাকাব বাড়ি ছাড়া আব তাব পালাবাব জায়গা কোথায? ভবদেবকে সে আব বিব্রত কবতে বাজি নয।

তামসী কি চেয়েছিল নিজেকে মুছে ফেলতে? নিবিয়ে ফেলতে? নিয়ে যেতে নিজেকে উষসীব সমাপ্তিতে? তাব জন্যে প্রয়োজন ছিল কি যোগীশ্বরেব সাহায্য? আই-এটা দিয়ে আসাব পব তাব জৌলস বাড়বে না কি একটুও?

স্টেশনে যখন এসে পৌছুল, ছিপ-ছিপ কবে জল পড়ছে। টিমটিমে কেরোসিনেব বাতিব পবেই ঘুটঘুট কবছে অন্ধকাব। পথ বা আকাশেব চেহাবা দেখা যাচ্ছে না। ব্যাঙ ডাকছে নিবিবাদে। শোনা যাচ্ছে নয়নজুলীব জলেব তোড। গরুব গাড়িব চাকা খাদেব সীমানায এসে টাল সামলাচ্ছে। গরু ঘবমুখো।

শুধু অন্ধকাব। শান্ত ত্নঃখেব মত। আশ্রয নেই তবু দেশে ফিবে আসছে।

বাত যদিও নযেব কোঠায পড়েনি, আলোব শেষ কণিকাটিও নিবে গেছে যোগীশ্ববেব বাড়ি থেকে। লণ্ঠন জ্বেলে বাইরেব বোযাকে এসে যোগীশ্ববেব তো চক্ষুস্থিব।

'এ কি, মসী?'

'হ্যাঁ, এলাম।' চোখ নামিযে তামসী বললে।

থাকাটাই শুধু ত্নঃসহ কবে তোলা যায়, থাকতে আসাব মুহূর্তেই সদ্য-সদ্য গলাধাক্কা দিয়ে বেব কবে দেয়া যায় না। যোগীশ্বব তাই পথ দিলেন।

কিন্তু বিলাসবতী শোধরায়নি। ঝামটা মেরে জিগগেস করলে : ‘সেই গুণ্ডাটা সঙ্গে আছে নাকি ?’

তামসী হাসবার চেষ্টা করল : ‘ও গরুর গাড়ির গাড়োয়ান।’

‘রক্ষে করো। ভাবলেও এখনো বুক কাঁপে। সেই গুণ্ডাটা কোথায় ? বেরিয়েছে জেল থেকে ?’

‘কি করে জানব।’

‘আবার আসবে নাকি শেষ রাতে ?’

‘তা রাত শেষ হয়ে আসবার আগে কি করে বলা যায় ?’ তামসী বাঁচিয়ে রাখছে সেই হাসির চেষ্টা।

‘এলে খুলে দিবি নাকি দরজা ?’

‘খুলে দিতে হবে বৈকি।’

‘এ্যা ! আবার !’ বিলাসবতী যেন চিবুকের নিচে ঘুসি খেল।

‘এবার খুলে দেব তাকে ভেতরে আনবার জন্যে নয়, তোমার ভয় নেই।’

‘তবে ?’

‘খুলে দেব নিজে চলে যাবার জন্যে।’ তামসীর গলা এতটুকু কাঁপল না।

‘এই যদি মতলব, ঢুকতে হবে না এ-বাড়ি। পথের মেয়ে, পথেই থাকো গে ঘর বেঁধে। ঢিটপনার জায়গা নয় এটা—’ বিলাসবতী সদর দরজার দিকে তার ডান হাতটা প্রসারিত করল।

এতটা পছন্দ হচ্ছিল না যোগীশ্বরের। কুণ্ঠিত মুখে বললেন, ‘আহা, থাক না, যখন এসেছে। জলে ভিজে গেছে ওর শাড়িটা। রাস্তায় ঘুমুতে পারেনি নিশ্চয়।’

‘কেলেঙ্কারির একশেষ হবে ওকে এখানে আস্তানা গাড়তে দিলে।

কালকেই দেখবে কাতারে-কাতারে লোক এসে জড়ো হবে ছবিমুখ দর্শন করবার জন্যে। তিষ্টোনো যাবে না।'

'কালকের কথা কাল। আজকের রাতটা তো আগে থাকুক। আর, কেলেঙ্কারির ভয় এখন কম। উষসী যখন নেই—'

'নেই ? কোথায়, কোথায় উষসী ?'

উষসী আর-সবাইর মত ঘুমিয়ে আছে এমনিই ভেবে রেখেছিল সে। নইলে দিদির সাড়া পেয়েও সে ছুটে আসবে না এ অসম্ভব। তবে কি শেষে সে বিষ খেল নাকি ?

আসলে সে উষসীর কাছেই পালিয়ে এসেছে। জানতে তার সমস্যা। সম্ভব হলে নির্ধার করতে তার সমাধান। স্নেহে, সান্নিধ্যে, অনুনয়ে। কিন্তু এ কি ইঙ্গিত।

অমন কিছু মারাত্মক নয়। নেই মানে বাড়িতে নেই। তবে তামসীর মত বিপথে যায়নি, গেছে শ্বশুরবাড়ি।

'বিয়ে হয়ে গেল তার ? কবে ?'

'এই উনিশে—শনিবার। তোকে খবর দেয়া হয়নি পাছে ওরা একটা কিছু ফ্যাসাদ বাধায়। তোকে নিয়ে ঘোঁট পাকিয়ে উঠেছিল বিয়ের আগে, সম্বন্ধ প্রায় টে সে যায় আর কি। একেবারে ফারাক হয়ে গেছিস, কোনোই সম্পর্ক নেই আমাদের সঙ্গে—তবেই শুভেলাভে ঘটতে পেরেছে ঘটনাটা।' বললেন যোগীশ্বর।

যাক, বুকের থেকে পাথর নেমে গেল। তামসী হঠাৎ নিজেকে সম্পূর্ণ ভারশূন্য বলে অনুভব করলে। শুধু লঘু নয়, নির্বন্ধন। যেন আর কিছুতে তার ভয় নেই, আর কিছু তার পথ আটকাতে পারবে না। একমাত্র বাধা তার এখন নিজের চরিত্র, নিজের প্রকৃতি। সে কি এতই দুরুচ্ছেদ ?

'কেমন হল বিয়ে? বর কি করে?' তামসীর গলায় কাতর কৌতূহল।

দু'জনে মিলে যে বিবরণ দিলে তা শুনে তামসী কি একবার ভাবল মনে মনে, উষসীর বিষ খাওয়াই ভাল ছিল? না, তার স্বাধীনতার পথ কণ্টকিত হয়ে ওঠে ভেবেই তা সে ভাবল না?

পেশা জমিদারী, স্থিত প্রায় সত্তর হাজার। সদর খাজনা দিয়ে সরিকি ভাগে প্রাণধনের হিস্যায় বছরে প্রায় আঠারো হাজার। আদায়-ইরসাল যদি ঠিক থাকে। তাছাড়া মজুত আছে কিছু লোহার সিন্দুকে। সদরে পাকা বাড়ি আছে দু'মহলা। তা বয়েস একটু বেশি, এই চল্লিশের মাঝামাঝি। দুই স্ত্রী ক্রমান্বয়ে মারা গেছে, সন্তানহীন। সন্তানবতিত্বের জন্যে এবার উষসীর পরীক্ষা। তবু স্ত্রী, রক্ষিতা নয়।

'খাবার পরবার জন্যে তার আর ভাবতে হবে না।' বিলাসবতী বললে গদ্গদ হয়ে।

খাওয়া-পরা মিটে গেলেই বুঝি সব পাওয়া শেষ হয়ে যায় মানুষের—আগে-আগে নালিশ করেছে তামসী। এখন তার মনে হয়, শুধু খাওয়া পরার বেশি আর কি মানুষের চাইবার আছে! পেলে এটুকুই সে পেতে পারে, এর বেশি কিছু নয়।

সেই জানলার কাছে বসেছে তামসী। ঘরের সাজানো-গোছানো তেমনি ভাবেই আছে, অনড় সমাজের বেবদল ব্যবস্থার মত। তার আজ ঘুম আসছে না। শেষ রাত্রের দিকে এখন আর বৃষ্টি নেই, আকাশ স্বচ্ছ হয়ে গেছে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে গাছ-পালা, ফাঁকে-ফাঁকে খোড়ো চালের কুঁড়েঘর, বেলে মাটির পথ গিয়েছে আঁকাবাঁকা। নতুন চোখে আজ দেখছে সব তামসী। একান্ত আত্মীয়ের মত করে, সন্তানের মত করে। এই গাছ আর পাতা, ঘাস আর মাটি, কুঁড়ে ঘর

আর গেঁয়ো পথ, এই শান্তি আর স্তব্ধতা—কোনো দিন সে এমন আপনার করে দেখেনি। দেখেনি নিজের অংশ ও অঙ্গ মনে করে। আজ তার বদলে গিয়েছে দৃষ্টি। সব কিছু দেখছে সে আজ দেশের চোখ দিয়ে, প্রেমের চোখ দিয়ে, দুঃখের চোখ দিয়ে।

একবার দেখতে ইচ্ছে করছে উষসীকে। সে যে লিখেছিল বিয়েতে মত নেই, তার মানে, এই বিশেষ বিয়েটাতেই মত নেই। এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। স্থূল প্রহারের মত লাগছে এখন এই অপমান।

কিন্তু তা নইলে চিরদিনের মত খাওয়া-পরার তার ব্যবস্থা হত কোথায়? তামসী মনে-মনে শাসাল উষসীকে। তবু কে জানে, চোখের পাতা তার আর্দ্র হয়ে এল। তাই বিয়ে ঠিক হয়ে গেলে পর তাকে আর জানায়নি উষসী। অভিমানে লুকিয়েছে নিজেকে। তার দিদির চেয়েও সে অসহায়।

যোগীশ্বর বললেন ক'দিন অপেক্ষা করতে। জোড়ে ফেরেনি এখনো প্রাণধন, আগামী পনেরোই তারিখে আসবার কথা। তখন দেখা হয়ে যাবে।

সেদিনের প্রতীক্ষায় বসে রইল তামসী। কিন্তু প্রাণধন লিখে পাঠাল, সময় হবেনা।

তার না হোক, তামসীর সময় হবে। সে নিজে যাবে উষসীর শ্বশুরবাড়ি। এ নয় তাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসবে ঐ বলির হাড়িকাঠ থেকে। নিজের জন্যেই সে জায়গা পাচ্ছেনা, উষসীকে রাখবে কোথায়? নিজের জন্যে আছে না হয় পথ, কিন্তু উষসীর জন্যে কোথায় পাবে সে পান্থপাদপ? কে জানে, হয়তো উষসী ভালই আছে। সিন্দুরে ও সৌভাগ্যে জলজল করছে। ঐশ্বর্য আর প্রতিপত্তি যদি মেলে মেয়েরা আর কি চায়!

তামসী পালাতে চেয়েছিল বটে, কিন্তু পালানো অর্থ ঘরের কোণে গিয়ে মুখ লুকোনো নয়। তার পালানো অর্থ হচ্ছে অবিরাম পথ চলা। শুধু চলা আর চলা, হাঁটা আর পথ ভাঙা, কাঠফাটা রোদে আর অফুরন্ত বর্ষায়। অক্লান্ত, ক্ষতবিক্ষত। তার জন্যে নেই কোথাও দ্বারমোচন।

কিন্তু খোলা দরজা বন্ধ করে দিল চন্দ্রমা। মোটরের হর্ন বাজতে লাগল ঘন-ঘন। চন্দ্রমা বলে পাঠাল সে যাবে না, না, কিছুতেই না। অমন করে আর সে খেলো করবে না নিজেকে। যেচে নেবে না আর অবজ্ঞা।

আশ্চয, সিগারেটের কেসটাও একটু বাড়িয়ে ধরল না ভদ্রতা ক'রে। ভদ্রতা করে বললেও না একবার ফরাসী মদটা খেয়ে ফেলুন। মোটরে পাশে পেয়েও দশ মিনিটের মাথায় ঠিক পৌঁছে দিয়ে গেল হস্টেলে।

'না, যাব না আমি।' উপর থেকেই চেঁচিয়ে উঠল চন্দ্রমা।

ঝি এসে বললে, 'মসী-দিদিমণিকে খুঁজছেন।'

'বল্‌গে, প্রাণের পাখি শিকলি কেটে উড়ে গেছে জঙ্গলে।'

নয়

যেটুকু বাজার সেটুকু শহর। তার বাইরেটা কাঁচা মাটি, ফাঁকা মাঠ। নদীর আভাস বোঝা যায় দিগন্তের শুভ্রতায়। প্রাণধনের বাড়ি শহরের উপকণ্ঠে। নদীর কাছাকাছি।

তামসী পৌঁছুল দুপুরে। সঙ্গে সেই স্যুটকেশ, দড়ি দিয়ে বাঁধা সতরঞ্চি-মোড়া বিছানা। শাড়িটা লাট, ঝাঁকড়মাকড় চুল। ঝলসে ঝামরে গেছে শরীর।

বাইরে থেকে মন্দ দেখতে নয় বাড়িটা। ভিতরটাও অনেকখানি জায়গা নিয়ে। পুরোনো আমলের বাড়ি। সমৃদ্ধির অভ্যেসটা এখনো সম্পূর্ণ মুছে যায়নি গা থেকে।

চাকরানি এসে তামসীকে নিয়ে গেল অভ্যন্তরের ঘরে। অনেক চাকরানি আছে দেখা যাচ্ছে। সবগুলিই জোয়ান, স্বাস্থ্যবতী। ছিমছাম, মাজাঘসা। উষসী বেশ স্বাচ্ছন্দ্যেই আছে তা হলে।

'তুমি? দিদি? তুমি এখানে কেন?' উষসী কেঁদে ভেঙে পড়ল তামসীর বুকে।

এক ফুঁয়ে আলো গেল নিবে। ভয়ার্ত মুখে তামসী বললে 'তোকে দেখতে এলাম। বিয়েতে বলিসনি আমাকে—'

'তবে এই তো দেখলে।' উষসী মুখ তুলল: 'এবার ফিরে যাও।'

'এ কি, তাড়িয়ে দিচ্ছিস তোর বাড়ি থেকে?' হতবুদ্ধির মত তাকাল তামসী।

'মানে-মানে সরে যেতে বলছি দিদি। উনি জানতে পেলে—'

'কেন, আমি কি করেছি?'

তামসী যা করেছে তা সবাই জানে। এক পলাতক ডাকাতকে তার ঘরে আশ্রয় দিয়েছিল। সেই ডাকাতিটা রাজনীতির সঙ্গে সংসৃষ্ট এই কারণেই তামসী প্রাণধনের দু'চক্ষের বিষ।

তামসী তবু যা-হোক স্বস্তি বোধ করল। আর-আরদের মত প্রাণধন ঢোকেনি তক্তপোষের নিচে। দেখান তার কৌমারে কলঙ্ক। তাকে দেখতে পেয়েছে পৃথক করে।

'তুমি থেকোনা। চলে যাও।'

তামসী হাসল। বললে, 'যাব বলেই তো এসেছি।'

'তুমি জাননা, তোমাকে অপমান করবে।'

'ও-সব আমার গা-সওয়া। বেশ তো, তাড়িয়েই দেবে না-হয়। একটু নতুন রকম যাওয়া যদি ঘটে কপালে, মন্দ কি। দেখে যাই। তুই এখন আমার স্নান আর খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দে।'

প্রাণধন বাড়িতেই নেই। সদরে গেছে। সন্ধ্যের ট্রেনে ফেরবার কথা।

প্রাণধনের সরিকদের মধ্যে পার্টিশনের মোকদ্দমা হচ্ছে। প্রাথমিক ডিক্রি হয়ে গেছে, চূড়ান্ত এখনো হয়নি। সম্পত্তি রিসিভরের হাতে। গাঁয়ের লোক যাকে বলে, ঋষিবর। এ সময় নিলামী ও ইস্তফী জমি নতুন পত্তন দেয়া হবে, তাই বসে থেকে কিছু নজরানা পায় কিনা তারি লোভে গিয়েছে সদরে। যদি নায়েব কিছু বখরা দেয়।

প্রাণধন আকাট মূর্খ। কোন অস্পষ্ট অতীতে ইস্কুলে ঢুকেছিল

তার ছায়াবশেষও খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাঁটোয়ারার মোকদ্দমায় স্বাক্ষী দিয়েছিল প্রাণধন। হাকিম তাকে জিগগেস করলে, আপনাদেব তৌজির নম্বর তো দুই হাজার দুই শো তিন? উত্তরে বলে উঠল প্রাণধন, না হুজুর, আমাদের তৌজির নম্বর বাইশ শো তিন। বলতে-বলতে হেসে উঠল উষসী। ক'শোতে এক হাজার পারেনা বলতে। পারে না ঘড়ি দেখতে। আরেকবার, সম্পত্তি তখনো রিসিভরের হাতে যায়নি, এজমালি তহশীল, নায়েব এসেছে মফস্বল থেকে। মোসায়েব আছে অনেক, কে খবর দিলে প্রাণধনকে নায়েব বাক্স বোঝাই করে টাকা নিয়ে এসেছে, ইরসাল করেছে তার আদ্ধেকেরও কম। প্রাণধন হুংকার ছাড়ল, বললে, এখুনি নিকেশ দাও। নায়েব হিসেব মেলাতে বসল। সুর করে আওড়ে-আওড়ে যোগ দিচ্ছে নায়েব। নয়ে-সাতে ষোল, ষোল আটে চব্বিশ, চব্বিশে তিনে সাতাশ—এমনি করতে-করতে বাহাত্তর পাওয়া গেল। নায়েব বললে, বাহাত্তরের দুই নামল, হাতে রইল সাত। মোসায়েব বলে উঠল, দেখলেন, আপনার খাতে দুই রেখে নিজের হাতে সাত রাখল। এত বড় জোচ্চুরি। প্রাণধন আবার হুংকার ছাড়ল। কোনো কথা শুনল না, একবাক্যে নায়েবকে বরখাস্ত করে দিলে।

মলিন, বিমর্ষ হয়ে গেল তামসী। জমিদার বলতে তার মনে এতদিন একটা অন্য রকম ছবি ছিল। উজ্জ্বল ঐশ্বর্য, উজ্জ্বল অপব্যয়, উজ্জ্বল অহঙ্কার। ধনের, শিক্ষার, সৌন্দর্যের। সে-ঐশ্বর্যে মনে-মনে হিংসা হয়, রাগও হয়, কিন্তু ঘৃণা হয়না। কিন্তু এ কি নিশ্চল মূর্খতা, নিশ্ছিদ্র জড়পিণ্ড। এ লোকও শুধু জন্মের ওজুহাতে বিত্ত-বেসাত ভোগ করবে এ কিছুতেই সহ্য করতে পারল না তামসী। কিন্তু মন ফিরিয়ে আনতে হল তক্ষুনি। ভাবল, উষসীর সুখ, উষসীর ভবিষ্যৎ।

'সংসার কে দেখে-শোনে ?' মেয়েলি হতে চেষ্টা করল তামসী। ঘা খেল তক্ষুনি।' উষসী মুখ নামিয়ে বললে, 'চাকরানিরা।'

প্রাণধন ফিরল সন্ধ্যার কিছু পরে। কি ভাবে ও কখন তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে তারই জল্পনা করছিল তামসী, হঠাৎ একটা উন্মাদের চীৎকার তার কানে এল :

'কে, কে তাকে আসতে দিয়েছে আমাব বাড়িতে ? নগেন ! নগেন !'

'ঐ, ঐ ! তোমাকে বলেছিলাম না দিদি ?' ভয়ে কালো হয়ে উঠল উষসী।

'নগেন কে ?' তামসীও ভয় পেয়েছে। অভ্যর্থনাটা এমন কদাকাব চেহাবা নিয়ে দেখা দেবে বীভৎসতম কল্পনায়ও তা ভাবা যেত না।

'বাজাব-সরকার। ঐ, শুনতে পাচ্ছ ? তখন তুমি চলে গেলেই ভাল করতে দিদি।'

'কেন, হবে কি ? গুলি করে মারবে নাকি আমাকে ?' তামসীর গলায় রাগ ফুটে উঠল।

'ওরা সব ডাকাত। জেল-ফেবৎ। ওদেব ছায়াও মাড়াতে নেই। সম্পর্কেব লেশ রাখতে নেই ওদেব সঙ্গে। তাড়িয়ে দাও, তাড়িয়ে দাও।' শোনা গেল দূরের সেই উন্মত্ত কণ্ঠ।

তামসী উঠে দাঁড়াল।

'এ কি, যাচ্ছ কোথায় ?' উষসী ধবল তাব আঁচল চেপে।

'কোন ঘরে আছে ? একবার যাই না, দেখি না, গিয়ে—'

'মদ খেয়ে এসেছে।' উষসী বললে চাপা গলায় কান্নার মত।

তামসী হঠাৎ নিস্তেজ বোধ করল। পা উঠল না।

'একা মেয়েমানুষ, কি মতলব নিয়ে এসেছে ঠিক কি। ঘাঁতঘোঁত জেনে রেখে পরে মাঝরাতে ডাকাত নিয়ে আসবে কি না কে বলতে পারে। ওকে নিয়ে এস এখানে। আসতে না চায় পুলিশে খবর দাও।' উচ্চ হতে উচ্চতর হল সেই বিকৃত কণ্ঠ।

একটা দাসী এসে খবর দিল বাবু তামসীকে ডাকছেন।

'যাবে না, যাবে না দিদি।' উষসী গর্জে উঠল।

কিন্তু মদ? মদকে তামসী ভয় করে না। না, সে যাবে। একবার দাঁড়াবে গিয়ে মুখোমুখি। দেখবে যত রকম আছে পাপ আর নিষ্ঠুরতা। এই বুঝি মদের আসল চেহারা। ভিতরকার রূপ। এত অধম, এমন অশ্লীল।

প্রাণধন বসে আছে একটা হেলান-দেয়া চেয়ারে, আধবোঁজা চোখে দরজার দিকে মুখ করে। মেঝের উপর পায়ের কাছে বসে দু'জন দাসী পা টিপে দিচ্ছে আর তৃতীয়টি পার্শ্ববর্তী টেবিলে মানীয়ের তত্ত্বাবধান করছে। প্রাণধনের বেশবাস শিথিল, অপরিচ্ছন্ন। সমস্ত মুখে কদর্যতা যেন কুষ্ঠের মত ফুলে-ফুলে রয়েছে।

সূক্ষ্ম কানে শাড়ির খসখসটি ধরতে পেল প্রাণধন। টান করে অতি কষ্টে চোখ মেলে বললে, 'ও, তুমি? আই এম সরি, আপনি। দিদি যে! নমস্কার।'

যত দূর সম্ভব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বেশবাস সংযত করল প্রাণধন। দাসীরা অসম্পৃক্ত হয়ে সরে বসল। পানীয়ের তত্ত্বাবধায়িকা দাঁড়িয়ে রইল দেয়াল ঘেঁসে।

'বসুন।' প্রাণধন সামনের আরেকটা হেলান-দেয়া চেয়ারের দিকে চিবুকের ইঙ্গিত করলে।

বসল না তামসী।

'আচ্ছা, আপনি তো বেশ ঢ্যাঙা।' কতক্ষণ তার দিকে চেয়ে রইল প্রাণধন 'আপনার বোনটি এত ছোটখাট কেন? আপনার তো বেশ খাটিয়ে-পিটিয়ে চেহারা, আর আপনার বোন অমন ন্যাতনেতে কেন?'

'আমি যে জেলফেরৎ।' তামসী অস্পষ্টভাবে হাসল। 'জেলে যে আমি পাথর ভেঙেছি।'

হঠাৎ তত্ত্বাবধায়িকাকে প্রাণধন উদ্দেশ করলে 'এঁর থাকবার জায়গা হয়েছে কোথায়? কোনো বন্দোবস্ত করা হয়নি এখনো? তোমাদের সব ডিসমিস করে দেব। কি করছিলে সমস্ত দিন? এত বড় একটা কুটুম এসেছে বাড়িতে, অথচ তার জন্যে কোনোই আয়োজন নেই।'

হেড-দাসী আর-দুই দাসীর দিকে একটা কটাক্ষ নিক্ষেপ করে চলে যাচ্ছিল, প্রাণধন তাকে ডাকলে 'শোনো। আমার শোবার ঘরের পাশের ঘরটাই ওঁকে দাও। সবাই মিলে চটপট সাজিয়ে-গুছিয়ে দাও গে। টেবিল, খাট, বিছানা—কোনো কিছুর যেন ত্রুটি না হয় একটুও। তোমরাও যাও।'

উপবিষ্টা দাসীদ্বয়ও অন্তর্হিত হল।

'তারপর?' প্রাণধন অবসন্ন চোখ বুলিয়ে বললে, 'আমি ছিলুম না সারা দিন। আপনার নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হয়েছে।'

'আমি ডাকাতের জাত। কষ্ট বলে জানিনা কিছুই।' তামসী অটুট ভঙ্গিতে বললে।

এতেও ধাতে এল না প্রাণধন। তার সমস্ত চীৎকার যেন সে ভুলে গেছে। ডাকাতিটা যেন কত তুচ্ছ এমনি একটা ভাব দেখিয়ে সে বললে, 'আপনি ডাকাতি করতে এসেছেন নাকি?'

'অসম্ভব কি।'

'বেশ, করবেন। আমি আমার ঘরের সমস্ত দরজা খুলে রাখব। আপনার অবাধ প্রবেশ।' প্রাণধন শুধু তার উপর-পাটির দাঁতে হাসল : 'কিন্তু কি লুট করবেন জিগগেস করি? হৃদয় ছাড়া আর কী পারেন লুট করতে?'

তামসী একবার ভাবল, যদি পরিত্যক্ত একটা বোতল তুলে নিয়ে প্রাণধনের মুখের উপর সজোরে ছুঁড়ে মারে, কেমন হয় দেখতে! বললে, 'লুট কেন, দরকার হলে পারিও খুন করতে।'

'তবে আপনাকে ছাড়া হবে না। দেখতে হবে শেষ অঙ্কে এই খুনের দৃশ্যটা।' বলে প্রাণধন উঠে দাঁড়ালো চেয়ার ধরে। এগুলো দু' পা, কিন্তু তামসীর দিকে নয়, পানীয়ের টেবিলের দিকে।

একটা ঝি যাচ্ছিল এই দিক দিয়ে হেঁটে, প্রাণধন তামসীকে দেখিয়ে বললে, 'এঁকে আটকে রেখে দিতে হবে ওখানে। নগেনকে খবর দাও শিগগির।'

ত্রস্ত পায়ে ঝি চলে গেল।

'এ সব ডাকাত-মেয়েকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দেয়া নয়, কিছুতেই নয়। দেখতে হবে কেমন জোর তাদের হাড়ে। এ বাড়িটা হবে আপনার অন্তরীন-শিবির। ভয় নেই, আরামে থাকবেন।'

হাত বাড়িয়ে টেবিলটা ধরতে-না-ধরতেই প্রাণধন টলতে-টলতে মেঝের উপর পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে। লণ্ঠন ও বোতলের একটা ঝংকৃত শব্দ হল। উঠল করুণ গোঙানি। দূরের দেয়ালে একটা দেয়ালগিরি জ্বলছে। তামাটে অসহায় চোখে প্রাণধন তাকাল তামসীর দিকে। তামসী ভ্রূক্ষেপও করল না।

তামসীর সন্দেহ হতে লাগল প্রাণধন কি নিজের থেকেই পড়ে গেছে, না, সে শক্ত হাতে সবলে ছুঁড়ে ফেলেছে তাকে? তার হাতে

আছে কি তত শক্তি? ঝাঁট করে হাত মুঠ করল তামসী। নিশ্চয়ই আছে।

শোবার ডাক পড়ল উষসীর। তামসী শুলো একা আলাদা ঘরে, প্রায় জেগে থেকে। পাখি-পাখাল ডাকবার আগেই ভোররাত্রে উঠে রেল-স্টেশনে এসে টিকিট কাটল। লণ্ঠন হাতে করে পৌঁছে দিয়ে গেল নগেন।

ঘুমন্ত স্বামীকে ফেলে রেখে উষসী উঠে এসেছিল ঠিক সময়। দিদির পায়ের ধুলো নিয়ে বললে তন্ময়ের মত: 'আমার কেমন যেন মনে হয়েছিল আজ রাতে এবাড়িতে ডাকাত পড়বে।'

'ডাকাত!' বলে কী পাগল মেয়ে।

'যদি পড়ত তো বেশ হত। আমার ইচ্ছে করে দিদি একটা ডাকাতি হোক এ বাড়িতে। ডাকাতেরা আমাকে নিয়ে যাক এই বাড়ির বাইরে। আর ফিরে না আসি। এত ঘটে, এমন কিছু ঘটতে পারে না আমার জীবনে? সত্যি দিদি, একটা মারাত্মক রকমের ডাকাতি করিয়ে দিতে পার না?' শেষের কথাটার সঙ্গে শুকনো মুখে একটু হাসল।

তামসী গম্ভীর হয়ে বললে, 'চেষ্টা করে দেখব।'

উষসীই আশ্চয হল।

'যদি দেখা হয় সেই ডাকাতের সর্দারের সঙ্গে, বলব তাকে।' উঠতি একটা নিঃশ্বাসকে তামসী পিষে ফেললে।

দশ

কোথায় আর যায়! সেই কলকাতা। সেই পুরোনো ছাত্রীছত্র।

হ্যাঁ, যে যাই বলুক, নেবে সে চাকরিটা। অধিপের অধীনে। না নিয়ে তার উপায় কি। মিছেই সে বাড়ি ফিরে গিয়েছিল তার পরিচিত বিবরে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকতে। সে বিবর বুজে গেছে। তাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে বিবন্ধু পৃথিবীতে। অধিপ ছাড়া তার আর এখন জায়গা কোথায়! তার দেওয়া তিরিশ টাকার বাকি আছে এখন দু টাকা সাড়ে চার আনা। এ তো ফুরিয়ে যাবে কলকাতায় পা দিতে-না-দিতেই। তারপর? কেউ তাকে বলে দিতে পারে? চার দিকে তাকাল তামসী। কেউ কোথাও নেই।

না, অধিপকেই সে ভর করবে। একশো টাকা মাইনে! কত কিছু সে করতে পারবে, কিনতে পাববে এ দিয়ে। পরবার আর সাজবার, শোবার আর বসবার! তাব অঙ্গারিত দেহ নবপত্রমণ্ডিত হয়ে উঠতে পারবে। তুচ্ছ দুর্নামের ভয়ে সে তা প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছিল? ভিক্ষুকের মত ধুঁকে-ধুঁকে মরলে কী এমন রাষ্ট্র হত তার প্রশংসা। আগে খাওয়া, মাথা গোঁজবার ঠাঁই, পরে সব কিছু। সব কিছুর পরে সুনাম। যে জীবনে যত বেশি অস্পষ্ট বা কুয়াসাচ্ছন্ন সে তত বেশি নিরাপদ। কে তাকে চেনে? কী এসে যায় যদি কেউ তাকে রক্ষিতা বলে? সে ভাবতে পারবে অনায়াসে, পালিতা অর্থই হচ্ছে রক্ষিতা।

হস্টেলে এসেই শুনল চন্দ্রমা চলে গেছে। কোথায় গেছে ঠিকানা রেখে যায় নি। কেউ আন্দাজ করলে ফ্ল্যাট নিয়েছে আলাদা, কেউ বললে চলে গেছে আসাম, বাপের কাছে। তামসী জানে, কোথায়।

চলে গেছে অধিপের হেপাজতে। গিয়ে হয়তো দেখতে পাবে চন্দ্রমা দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়, বলবে, দরকার নেই, আমি ভার নিয়েছি পুরোপুরি। তাকে ফিরিয়ে দেবে, আরো অধোমুখে। হয়তো এতটা বাড়াবাড়ি করবে না। কথামত বহাল করবে তাকে প্রতিশ্রুত মাইনেয়, কিন্তু চাকরিটা রেখা টেনে নির্দিষ্ট করে দেবে। গল্প করতে হবে শুধু চন্দ্রমার সঙ্গে। তার চুল বেঁধে দিতে হবে, আলমারি খুলে বার করে দিতে হবে তার পছন্দের শাড়ি। হয়তো বা পেতে দিতে হবে বিছানা। সমস্ত গা জ্বলে যেতে লাগল তামসীর। নিমেষে আবার ঠাণ্ডা করল নিজেকে। কে বা অধিপ, কে বা চন্দ্রমা। কে তাদের চিনতে গেছে? সে চেনে শুধু টাকা, যা তাকে মানের চেয়েও মূল্যবান জিনিস দেবে—খাদ্য আর বস্ত্র, তার গ্রাসের আর শরীরের আচ্ছাদন। আর, যে পেট ভরে খেতে পায় আর গা ভরে পরতে পায়, তার আর কী চাই সংসারে।

মনিব্যাগ খুলে কার্ডের ঠিকানাটা আরেকবার দেখে নিল তামসী। তারপর কাপড়-চোপড় কি পরবে ভাবতে বসল। কারু কাছ থেকে ধার করতে আজ প্রবৃত্তি হল না। চাকবানির পক্ষে যথেষ্ট সম্ভ্রান্ত আছে পবনের শাড়িটা। প্রসাধনের কোনো উপকরণই তার নেই। তার চামড়ার স্বাস্থ্য আর সজীবতাই তার প্রসাধন। সে টাকা রোজগার করবে, বাঁচবে, বাঁচবার মধ্যে বিদ্রোহের ভঙ্গি নিয়ে আসবে, এই উদ্ধতিই তার সৌন্দর্য।

ট্রাম-কণ্ডাক্টরের সাহায্যে তামসী রাস্তার হদিস পেল। হ্যাঁ, এই

বাড়ি, ঐ সিঁড়ি গেছে উঠে। নিচে থেকেই নামেব নির্দেশ আছে টাঙানো। তেতলার ফ্ল্যাট, রাস্তার পিছন দিকে। থেমে-থেমে পায়ে-পায়ে ভয় জড়িয়ে উঠতে লাগল তামসী। হিসেব করে দেখতে চেষ্টা করল আগাম নেবার পর কত দিন কেটে গেছে। অধিপ সহজেই বলে দিতে পারে, বাতিল হয়ে গেছে চাকরি, আগামের ওয়াদা গিয়েছে ফুরিয়ে।

দরজায় ধাক্কা দিল। আঙুলের গিঁটে টোকা মারার কায়দা জানা নেই। এক ধাক্কাতেই দরজা গেল ফাঁক হয়ে।

অত্যন্ত বিরক্ত কর্কশ গলায় ভিতর থেকে আওয়াজ হল : 'কে ?'

ভুল করে আর কারু ঘরে সে এসে পড়ল নাকি ? তামসীর বুকের ভিতরটা কেমন মৃদু হয়ে এল। পড়ন্ত দিনের আলোয় ভাল করে সে ঠাহর করতে পারছেনা, তবু সাহস করে দু পা চলে এল ভিতরে।

'কে ?' আবার সেই জিজ্ঞাসা। এবার তামসী লক্ষ্য করল কথায় শুধু বিরক্ত বিস্ময় নেই, আছে যেন ক্লান্তি, নিরাশ্বাস প্রতীক্ষা। তার চেয়েও বেশি, যন্ত্রণা, শারীরিক যন্ত্রণা। তামসী এগিয়ে গেল।

'ও ! আপনি ?' খাটে, বিছানায় শুয়ে ছিল অধিপ, উঠে বসবার চেষ্টা করল। বললে, 'আমি জানি আপনি আসবেন। আপনার জন্যে বসে আছি।' দুর্বলতায় ফের ভেঙে পড়ল বিছানায়।

যেন ঠিক প্রভুর মত নয়, প্রার্থীর মত। তামসী কি থমকে গেল মুহূর্তের জন্যে ? একজন রুগ্ন, নিপতিত লোককেও তার ভয় ?

'আপনার অসুখ করেছে ? প্রশ্ন করল তামসী।

'হ্যাঁ, খুব জ্বর কদিন থেকে।'

'কবে থেকে ?' কথার পিঠে একটা কথা।

এই দিন পাঁচ-ছয়। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা, ঘুম নেই এক বিন্দু। বন্ধু

বলে আত্মেয় ডাক্তার একজন দেখছে বটে কিন্তু তাকে আর অঢেল হুইস্কি খাওয়ানো যাচ্ছেনা বলে তার তত মনোযোগ নেই। থাকবার মধ্যে আছে নিশি। না, ঝি নয়, চাকর, নিশিনাথ। এখন গেছে দোকানে, দরজা ভেজিয়ে রেখে। সে একা। শুয়ে-শুয়ে ভাবছিল কেউ যদি আসে। কল্পনার কেউ নয়, অন্তত যাব উপর দাবি খাটে, কর্তৃত্ব চলে। না, এখানে চন্দ্রমা কোথায়!

তামসী কি কিছু সাহস পেল এর পর? বললে, 'আপনার তো বাড়ি আছে, আত্মীয়স্বজন আছে, সেখানে চলে যাননি কেন? অসুস্থ অবস্থায় এখানে কেন পড়ে আছেন?'

'বাড়ি!' অবিপ শুকনো মুখে হাসল. 'হ্যাঁ, বাড়িই যাব এবার। আপনি এসেছেন, এবার আমাদের বাড়ি ফিরতে হবে।'

তামসীর মনে হল, তার নিশ্বাস পডছে না, সে পাথর হয়ে যাচ্ছে।

'হ্যাঁ, বাড়ি যাব। বাবার সঙ্গে গিয়ে বফা করব। তাঁর রাজনীতি মেনে নেব, ধরি মাছ না ছুঁই পানির রাজনীতি। মেনে নেব তাঁর ধন-মান, তাঁর মনসবদাবি মনিবানা। সম্ভ্রান্ত বংশধর হযে গিয়ে তাঁর কৌলীন্যকে নিশ্চিন্ত করব, আর এই চাকরির গ্লানি, এই ম্লানতা থেকে মুক্তি দেব আপনাকে। আমি পাব স্থান, আপনি পাবেন ঘব। যাবেন?'

অবিপ তাকাল জবো চোখে। যা সে ভয় করেছে, তামসী শুধু জ্বর দেখছে, তপ্ত প্রলাপ শুনছে হয়তো। বিজ্বর অবস্থায় বললে হয়তো মদ দেখত, শুনত বা গলিত ভাবালুতা। তার আকাঙ্ক্ষাব পবিত্রতাটি সে কি ক'রে প্রকাশিত করে? আর কাউকে বলেনি সে এমন কথা, দেখেনি সে এমন কাছে রেখে। বললেও তার মধ্যে ছলনা ছিল, দেখলেও তার মধ্যে ছিল বিহ্বলতা। কোথাও এমন শুভ্রতা ছিল না। এই বিশ্বাস, এই সারল্য।

তামসী আঁট হয়ে গেল। বললে, 'ঘরের চেয়ে পথই আমার বেশি কাম্য। চাকরিই আমার ভাল লাগে, তাতে আমি স্বাধীনতার স্বাদ পাই, দেখি স্বাধীনতার স্বপ্ন।'

ভুল, ভুল দেখেছে অধিপ। কালো রাতে একটা লাল ঝড় ওঠেনি আকাশে? সেই ঝড়কে উপেক্ষা করে একটি একাকী পাখি কি দুর্দম ডানায় উড়ে যাচ্ছে না? তার জন্যে কি গৃহ আছে, নীড় আছে, আশ্রয়ছায়া আছে? তার চোখে কি সংগ্রামের আগ্রহ নেই, পাখায় নেই কি প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্পর্ধা? দূরে ভগ্ন, বিক্ত এক গাছ ব্যাকুল শাখা মেলে ডাকলেই কি সে পাখা বন্ধ করবে? সে কি নিজেই এক টুকরো ঝড় নয়? স্তব্ধ, দৃঢ়, নিস্তরঙ্গ ঝড়?

তামসীর চোখ থেকে অধিপ চোখ ফিরিয়ে নিল। বললে, 'না, দরকার নেই বাড়ি ফিরে গিয়ে। বাড়িটা অত্যন্ত বেশি মোলায়েম, অত্যন্ত বেশি নির্জীব। ও আমাদের পোষাবে না। এইখানেই আমরা থাকব, এই ফ্ল্যাটে—'

'এইখানে?'

'হ্যাঁ, এই সমাজহীনতায়। আপনিও বাইরে চলে এসেছেন, আমিও বাইরে চলে এসেছি, আমরা ফের মিলব গিয়ে বাইরে। আপনার হাতের সঙ্গে আমার হাত এসে মিলবে একই কর্মের সাধনে ও সমাপনে। একই ব্রতসাঙ্গে। বলুন, সমাজহীন না হতে পারলে কি সমাজের জন্যে কোনো বড় কাজ সম্ভব?'

তামসী ঢোঁক গিলল। বললে, 'আপনার ডাক্তারের ঠিকানাটা যদি দেন আমি তাকে ডেকে আনবার চেষ্টা করতে পারি।'

অধিপ বোঝাতে পাচ্ছে না। তার আকাঙ্ক্ষাই সে জানাতে পারে কিন্তু তার পবিত্রতা সে প্রমাণ করে কি ক'রে?

'ডাক্তার আসে কি না আসে কিছু আসে-যায় না। আপনি যে এসেছেন তাই অনেক। আর, যখন এসেছেন তখন আর আপনাকে ফিরে যেতে দেব না।'

'আমার কাজের সর্ত কিন্তু তা নয়।' তামসী হালকা হবার চেষ্টা করল কিন্তু তার গাম্ভীর্য ঘুচল না। 'আমার কাজ অল্প, কিছুক্ষণ থেকে একটু গল্প করে চলে যাওয়া—'

'আপনার কী কাজ আপনি জানেন না। আপনার কাজ আমাকে ভাল করে তোলা। আমি যে নষ্ট হয়ে গেছি তা আমি এতদিন বুঝতে পারিনি। আমি চাই আবার ভাল হতে, ফিরে পেতে আমার সেই জীবনের সুর, সেই সার্থকতা। তারপর তোমার স্পর্শে আমি যদি ভাল হই তবে তোমার ও আমার স্পর্শে সমস্ত দেশ আমরা ভাল করে তুলব।'

'আপনার জর নিশ্চয়ই বেড়েছে।'

'হয়তো বেড়েছে। কিন্তু এমনিতেই আমি বড় অসহিষ্ণু। মাঝখানে আবেদন-নিবেদনের ব্যাপারটা আমার কাছে মনে হয় শুধু স্নায়ুর অপচয়। রঙ্গমঞ্চে পর্দা ওঠবার আগে ওসব একঘেয়ে কনসার্ট আমার কাছে বিষ। যা আমি চাই তার অসহ্য তীব্রতাটাই আমাকে দিয়েছে সেটা পাবার অধিকার—এমনি একটা যুক্তি আমার মনের মধ্যে গড়ে ওঠে। আর যা চাই তা আমার তক্ষুনি-তক্ষুনি চাই, দস্যুর মত চাই—'

তামসী শান্ত স্বরে বললে, 'কিন্তু আমি সহিষ্ণুতার পক্ষপাতী। আমি জানি প্রতীক্ষা করে থাকতে।' জানলা দিয়ে তাকাল বাইরে, রাস্তা ও রাস্তার বিস্তারের দিকে। কলকাতার আকাশে দেখল সন্ধ্যার ধূসরতা।

খুব দূর শোনাল। শোনাল অন্য জগতের।

'বেশ, বস্থন, বসে থাকুন।' অধিপ চোখ বুজল।

এতক্ষণে তামসী যেন তাকাতে পারল চার দিকে, ঘরের দিকে। কোথাও একটা শৃংখলার স্থর নেই। আসবাবে জিনিসে সমস্তটা ঘর যেন এমনি একটা এলোমেলো বকুনি।

'কি, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বস্থন।' অধিপ চোখ মেলল। 'বন্ধু বা বন্ধুরূপে না পাই, পরিচারিকারূপে তো পাব। স্থতরাং চেয়ারটা টেনে বস্থন আমার মাথার কাছে।'

এবার আর তামসী কী উত্তর দেবে? তাকে বসতে তো হবেই। সে যে পরিচারিকা তাতে আর সন্দেহ কি।

দূরে-রাখা চেয়ারটাতে তামসী বসল। অসম্পৃক্তের মত। শিয়রের কাছে টেনে নিয়ে গেল না।

অধিপ চোখ বুজল। রইলই চোখ বুজে।

'আমার যদ্দূর মনে পড়ে আমার কাজ ছিল আপনার সঙ্গে গল্প করা। আপনার অস্থখে তা যখন আজ সম্ভব নয়—' অনেক পর তামসী বললে ক্লিষ্ট কণ্ঠে।

'হ্যা, উপায় নেই, এই আমার ধরন গল্প করার। এক পক্ষ থাকবে শুদ্ধ আরেক পক্ষ নিদ্রিত। আমি মনে-মনেই গল্প করি।'

'কিন্তু কতক্ষণ আমাকে এমনি বসে থাকতে হবে?'

'জানিনা। কেন, আপনি তো জানেন প্রতীক্ষা করে থাকতে।'

তামসীর ঝাপসা-ঝাপসা ভয় করতে লাগল। অনেক অচেনা অন্ধকার যেন ঘরের মধ্যে চলাফেরা করছে। একটা তীব্র আলোর চাবুক মারবার জন্যে তার হাত নিসপিস করতে লাগল, কিন্তু কোথায় স্থইচ সে ঠাহর করতে পারছে না।

'আলোর স্থইচটা কোথায়?'

'দরকার নেই আলো জেলে। এই অন্ধকারই ভাল। এই অন্ধকারটাই একটা অস্তিত্ব, উপস্থিতি।'

'তার চেয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করুন।' তামসীর স্বর অলক্ষ্যে অনেক নেমে এসেছে।

'তার জন্যেই তো ডাকছিলুম আপনাকে শিয়রে। মাথাটা ফেটে যাচ্ছে চৌচির হয়ে। শিয়রে বসে কপালে যদি হাত বুলিয়ে দেন, তবে হয়তো এক ফাঁকে ঘুমিয়ে পড়তে পারি। ঘুমিয়ে পড়লে আপনি পালাবেন তা জেনেও, ভয় নেই, আমার ঠিক ঘুম আসবে।'

কথাটা লাগল আবার মোটা স্পর্শের মত। তামসীর গলায় আবার ঝাঁজ ফুটল: 'ওটা কি আমার কাজ?'

'আপনার কাজ নয়? কার কাজ তবে?'

'তার জন্যে নার্স ভাড়া করুন।'

'আপনাকে তবে আমি কী ভাড়া করেছি? সামান্য একটু মাথা টিপে দিতে পারবেন না?'

'না।' তামসী উঠে দাঁড়াল।

'তার মানে?'

'এই চাকরি আমার পোষাবে না। এ জানলে কক্‌খনো আমি আসতুমনা এখানে।'

'আপনি কী জেনেছিলেন তবে?'

'স্পষ্ট জানিনি কিছু। আপনার কাছে আমি আসলে আশা করেছিলুম একটা মামুলি, ভদ্র চাকরি। এই রকম একটা ধোঁয়া নয়। তবু ভেবে রেখেছিলুম, সম্পর্কটা ধোঁয়াটে হলেও দূরত্বটা আমার অব্যাহত থাকবে। কিন্তু আপনার মধ্যেও যখন সেই অসুস্থ পুরুষই উঁকি মারছে তখন আমাকে পালাতেই হবে।'

'অসুস্থ পুরুষ—তাতে আজ আর সন্দেহ কি। কিন্তু মুখে বললেই পালানো সম্ভব হয় না। ভুলে যাবেন না, আপনি মাইনে বাবদ টাকা নিয়েছেন আগাম। কাজে প্রথম হাজির হয়েছেন মোটে আজ, সুতরাং তিরিশ টাকা বাবদ আপনাকে খাটতে হবে অন্তত ন-দশ দিন। টাকাটা উশুল না করিয়ে আমি ছাড়ব কেন?'

'আপনি কি আমাকে গায়ের জোরে আটকাবেন নাকি?'

'আমার গায়ের জোর কেন, আটকাবে আপনাকে আপনার নিজের সাধুতা। টাকা নিয়ে আপনি পালাতে পারেন না। আপনার বিবেকই আপনাকে ছি-ছি করবে। সেই চেতনাটুকু ছিল বলেই আপনি ভুলে যান নি দায়িত্ব, বহুদিন পরে হলেও চাকরিতে শেষ পর্যন্ত যোগ দিয়েছেন। আমি জানতুম, আসতেই হবে আপনাকে। অন্তত যে টাকা আপনি নিয়েছেন তা শোধ করে যাবেন।' অশিপ উঠে বসল। বেড-সুইচ টিপে আলো জ্বালল।

নিজেকে শতমুখে ভর্ৎসনা করতে লাগল তামসী। এই তার চন্দ্রমার কাছ থেকে পাঠ নেওয়া! এই তার চালাক হওয়া! এই তার প্রয়োগকৌশল! কী এমন রাজ্যপতন হত যদি সে একজন রুগ্ন নির্বান্ধবকে সেবা করত ক্ষণকাল। যদি বসত তার শিয়রে, যদি কপালে হাত রাখত আলগোছে। যদি তার কটা ভাবী মুহূর্ত হালকা করে দিয়ে আসত তার আঁচলের হাওয়ায়।

এখন আর ফেরা যায় না। অসহায় আর্দ্র স্বরে তামসী বললে, 'কটা টাকার জন্যে আপনি আমাকে অপমান করবেন?'

'উপায় কি! যদি টাকার বিনিময়ে প্রতিশ্রুত কাজ দেয়াটাই আপনি মনে করেন অপমান। ঋণশোধে যখন আপনার এত অনিচ্ছা তবে হাত বাড়িয়ে আগাম টাকা নেওয়াটা আপনার উচিত ছিল না।'

অদিপের গায়ের জ্বর যেন তামসী অনুভব করল তার নিজের গায়ে। বললে 'আমার কাছে টাকা থাকলে এক্ষুনি আমি তা ফিরিয়ে দিতুম। যখন নেই তখন কিছু দিন আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।'

'না, অপেক্ষা করতে আমি প্রস্তুত নই। এই একেকটি দিন আমার কাছে একেকটা বছর মনে হয়েছে, জেলখানার চেয়েও কঠিন। আমার উপর দিয়ে যে তুমুল ঝড় বয়ে গেল তা আমি সামলে নিয়েছি শুধু একটা বড় আশায়। আপনি আসবেন। অভ্যর্থনা সম্মানিত করব আপনাকে।

'এবার বিতাড়নে সম্মানিত করুন।' তামসী চলে যাবার উদ্যোগে স্থির হয়ে দাড়াল 'যেহেতু আমি নিঃস্ব, নিসহায়, নিজের জীবিকার সন্ধানে ঘুরছি, ভেবে নিলেন আমি নর্মসখী হবার জন্যেই প্রস্তুত। ভেবে নিলেন সৌখিন প্রেমের নামে একটা সম্ভ্রমের আবরণ টেনে দিলেই আমার মহিমা ফুটে উঠল। ভেবে নিলেন টাকা আর বিলাসের খোলের মধ্যে এলেই আমি বেচে গেলুম। পেয়ে গেলুম চরম আশ্রয়, জীবনের সার্থকতা। না, দয়া করুন, ভুল করবেন না, বাইরটাই শুধু দেখবেন না আমার। আমার দেহ ও দারিদ্র্যের চেয়ে আমি বেশি।' তামসী নির্ভুল পায়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। বললে, 'অনেক টাকাই আপনার গেছে, ও কটাও না হয় গেল। চুরি গেছে, মূর্খ একটা অপব্যয় করেছেন, কেউ বঞ্চনা করে নিয়ে গেছে, বা ভিক্ষে দিয়েছেন কাউকে, যা ভেবে আপনি সান্ত্বনা পান ভেবে নেবেন। আর তা যদি না পান, কিছু দিন অপেক্ষা করুন, যদি আমার দিন আসে, আপনার টাকা শোধ করে দেব।'

তামসী সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা ফেলল। অন্ধকারে নামতে লাগল থেমে-থেমে, পা দিয়ে শূন্যতল অনুভব করতে-করতে।

হঠাৎ সিঁড়িটা আলো হয়ে উঠল। দেখল টলতে টলতে অধিপ এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে টর্চ।

তামসী কি ভয় পেল নতুন করে? থেমে পড়ল ক্ষণকাল? না, নামতে লাগল দ্রুত পায়ে?

অধিপ বললে, 'সিঁড়িটা অন্ধকার। দেখবেন আস্তে-আস্তে নামবেন। পড়ে যাবেন না যেন।'

এগারো

অধিপ তার বাবার কাছে গিয়ে বললে, 'কিছু টাকা দিন।'

প্রমথেশ ইজিচেয়ারে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন, কাগজ নামিয়ে ঈষৎ কৌতূহলী হয়ে জিগগেস করলেন, 'কত ?'

'পাঁচ হাজার।'

প্রমথেশ একবার তাকালেন অধিপের দিকে। 'এত টাকা দিয়ে কি করবে ?'

'ইলেক্‌শানে দাঁড়াব।'

'কেন, আমিই তো দাঁড়াচ্ছি।' প্রমথেশ খাড়া হয়ে উঠে বসলেন।

'আপনাকে দিয়ে কিচ্ছু হবেনা।' বললে অধিপ। দৃঢ়কণ্ঠে।

'আর তোমাকে দিয়েই হবে!' কাগজের আড়ালে মুখ ঢেকে উপেক্ষার ভঙ্গিতে ফের শুয়ে পড়লেন প্রমথেশ।

যদি হত তাকে দিয়েই হত। তার বাবাই তাকে ভ্রষ্ট, জাতিচ্যুত করেছেন। দুর্গমের পথ থেকে নিয়ে এসেছেন আরামের পঙ্ককুণ্ডে। মখমলের খাপের মধ্যে রেখে-রেখে তার তলোয়ারের ধার ভোঁতা করে দিয়েছেন। তার চেয়ে উল্কাপিণ্ডের মত সে যদি তখন শেষ হয়ে যেত, সেই অগ্নিময় ব্যর্থতার মধ্যেও থাকত হয়তো জীবনের সম্পূর্ণতা।

কিন্তু ফিরে যখন সে এসেছে সে থাকবে না নিঃস্ব হয়ে। কাজ কখনো কারো ফুরোয় না, তামসীর এই কথা মনের মধ্যে দাগ কেটে

আছে। কাজ দিয়ে মেজে-মেজে নিজেকে সে পরিচ্ছন্ন করবে। আলোকিত করবে। কিন্তু কাজ কী! কাজ কোথায়!

বাবার দিকে সে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। মেঘলা-মেঘলা দিন বলে গায়ে শাল জড়িয়েছেন। কামদার শাল, আঁচলে কল্কাকাটা। এই কল্কার মতই তাঁর স্বদেশিয়ানা। শুধু একটা শোভা, গরিমা। তাঁর আভিজাত্যের নিদর্শন। রক্তের জিনিস নয়, চামড়ার জিনিস। তাই সব সময়ে চলেছেন চামড়া বাঁচিয়ে। লম্বা কোঁচা যেন ভিড়ের মধ্যে কেউ পা দিয়ে চেপে না ধরে। কাঁটার পথে না হেঁটে চলেছেন ঘাসের উপর দিয়ে। অথচ চলেছেন খুব চিন্তাক্রান্ত মুখে। এমন একখানা ভাব, যেন কত ভাবছেন, দেশের জন্যে, দুঃখীর জন্যে, যত কিছু করছেন নেপথ্যে থেকে। আসলে ভাবছেন নিজের কথা, চেষ্টা করছেন নিজের উন্নতি। হয়তো এমন লোককেই দেশ নির্বাচিত করবে। দেশের দোষ কি। দেশ দল বোঝে। প্রমথেশ বুদ্ধিমানের মত সময় থাকতেই দলে নাম লিখিয়েছেন।

'আমরা দল বুঝি না, লোক বুঝি। দল যাই হোক লোক যদি ঠিক থাকে, খাঁটি থাকে, তা হলেই আমরা কৃতকর্ম।' তামসীর সেই প্রাণময়, উজ্জ্বল কথাটা মন্দিরের ঘণ্টার মত বাজতে লাগল বুকের মধ্যে। এমন আশ্চর্য কথা তামসী শিখল কোথায়, আত্মার কোন গভীর অনুভবে? ব্যক্তি বড় হয় বলেই দল বড় হয়, আর দল যখন অমানুষে ও অর্ধমানুষে ভরে যায় তখন দঙ্গল হয়ে ওঠে। তাই দলের চেয়ে ব্যক্তি বড়। দলেও সেই ব্যক্তিই খুঁজি। আর ব্যক্তি যদি পাই, একাকী, দলছাড়া, তাকে ঘিরে আপনা থেকেই দল ব্যক্ত হয়ে ওঠে।

ঘৃণায় জলতে লাগল অধিপ। একদিন বাপেরই নির্মম অতিশাসনের শোধ নেবার লোভে সে বেরিয়ে পড়েছিল উচ্ছৃঙ্খল ধূমকেতুর মত।

সেদিন শুধু ধ্বংসের কথাই ভেবেছিল বলে সহজেই সব চেষ্টা ভস্মে নিষ্ফল হয়ে গেছে। আজ সে ভাবছে নির্মাণের কথা। মহত্তর, পবিত্রতর বিপ্লবের কথা। কিন্তু নির্মাণের আগেও তো ধ্বংসের প্রয়োজন। চাষ করবার আগে আগাছা দূর করা চাই। আবিশের বোঝা ঝেঁটিয়ে ফেলে দিতে না পারলে পুরোনো বনেদে নতুন ইমারৎ খাড়া হবে কি করে? তাই সে বাবাকে বলতে এসেছিল, আপনি সরে দাঁড়ান আর আমি উঠে দাঁড়াই।

'দুশো পাঁচশো চাও দিতে পারি।' প্রমথেশ বললেন কাগজের আড়াল থেকে। 'অসুখ থেকে ভুগে উঠলে, কোথা থেকে না-হয় ঘুরে এস।'

'আপনার টাকা আর আমি ছোঁবনা।'

কাগজ সরিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন প্রমথেশ। বিদ্রূপ করে বললেন, 'হঠাৎ এই বিতৃষ্ণা?'

'নিজে যোগ্য হব। জীবনে অনেক হঠকারিতা করেছি, এবার আনব সত্যিকারের সাহস। সত্যিকারের শুচিতা।'

'নিজের পায়ে দাঁড়াবে? খুব সুখের কথা। কিন্তু পা যখন টলবে ঠকঠক করে?'

যেন কে থুতু ছিটিয়ে দিলে মুখের উপর।

'তবু প্রতিজ্ঞা টলবেনা। শস্তায় আর বিকিয়ে দেবনা নিজেকে। হেরে যাব জানি, কিন্তু জীবনে অনেক হার আছে যা অনেক জয়ের চেয়ে গৌরবের।'

'শেষকালে বুঝি আমার সঙ্গে লড়বে?' প্রমথেশ গলার স্বরে ব্যঙ্গ মেশালেন।

'উপায় নেই। এখন চলবে হয়তো শ্রেণীযুদ্ধ।'

তখুনি অবিপ চলে গেল না বাড়ি ছেড়ে। • এ-ঘর থেকে ও-ঘরে ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগল কপটাচারের চেহারা। তার দ্বিতীয় মা, তার ভাই-বোন। কোথাও স্বদেশস্নেহের লেশমাত্র পরিচয় নেই। শুধু সাজগোজ, হাবভাব, ছলাকলা। শুধু টাকার বহ্বাস্ফোট। খেলো, জোলো, ফাঁকা। কোথাও নেই ত্যাগ বা বীর্যে প্রতিশ্রুতি। ধনধান্যে পুষ্পেভরা এই বসুন্ধরার মাঝে আমাদের দেশই যে শ্রেষ্ঠ নেই তার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস।

দুপুরে মার্কা মারা টুপি পরে দেশের কাজে মিটিং করতে বেবিযে গেলেন প্রমথেশ। মোটরে কবে, বনেটে নিশান উড়িয়ে। আব সেই ফাঁকে অবিপ তাব অফিস ঘরে ঢুকে তার টেবিলের ড্রয়ার খুলে কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি সুরু করল। যেন কি একটা নিগূঢ় রহস্যের উদ্ধার হয়ে যাবে এখুনি। তাসের ঘর ভেঙে পড়বে এক ফুঁয়ে।

বেরুল চিঠিটা। যার গুজব তার কানে ভেসে এসেছিল আবছায়া ভাবে! প্রমথেশ বিপক্ষ দলের সঙ্গে গোপনে ষডযন্ত্র করেছেন। তাঁরা তাঁকে ভরসা দিযেছেন মন্ত্রাত্বে মনোনীত কববেন, যদি তিনি তাদের রীতিনীতিতে সায দেন। দলের নৌকো বানচাল করে দেন পারে ভিড়িযে। প্রমথেশেব অবিশ্যি লিখিত সমর্থন কিছু পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু তিনি যে এমন একটা টোপ গিলে বসে আছেন এই যথেষ্ট। দলকে যে তিনি এই হিসাবে ব্যবহার করছেন মাত্র তাতে আর সন্দেহ কি। শুধু খুঁজছেন নিজের বৃদ্ধি, নিজের অভ্যুদয়। আরো বাড়ি, আরো জমি, আরো খাজনা-আবওয়াব। মেয়েদের জমকালো বিয়ে, ছেলেদের উত্তুঙ্গ চাকরি আর জামাইদের ব্যাঙ্ক-ফাঁপানো কনট্র্যাক্ট। আর স্ত্রীর গা-ভরা গন্নগনে গয়না।

চিঠিটা নিয়ে অখিপ সটান চলে এল কৃষ্ণগোবিন্দের অফিসে।

কৃষ্ণগোবিন্দ ভটচাজ একটা তেজস্বব সাপ্তাহিকের সম্পাদক। রোগা, লম্বা, ফর্সা, পাকানো-শিটানো চেহারা, ছোট-ছোট চোখ, উদ্ধত, হননোদ্যত নাক। সব সময়ে হিংসায় জ্বলছেন বলে শীর্ণ হয়ে গেছেন। সব সময়ে পাপ দেখছেন বলে চোখে অমন বন্য লোলুপতা। আর কখন কার উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন নাকে সেই তীক্ষ্ণধার খড়্গের উদ্যতি। আব গায়ের রংটা যে অত উগ্র তা তাঁব স্বভাবের রং।

'এই চিঠিটা ছাপতে হবে আপনাব কাগজে। ব্লক করে।'

কৃষ্ণগোবিন্দের প্রলুব্ধ শ্যেনচক্ষু শিকাবের আনন্দে জ্বলে উঠল। চিঠিটা পড়ে চাপা খুশিতে ফেটে পড়তে-পড়তে সে বললে, 'আপনার বাবার কীর্তি?'

অরিপ লজ্জিত হল না। বললে, 'হ্যাঁ। যারই হোক, যেখানে যত ভণ্ডামি আছে সমস্ত ফাঁস কবে দিতে হবে। যা সত্যিই অশ্রদ্ধেয় সেখানে দয়া-মায়ার কথা ওঠেনা।'

অরিপ তাকাল ক্রূর দৃষ্টিতে। কৃষ্ণগোবিন্দ ভয় পেল মনে-মনে। কেননা সে তো জানে তার নিজের ভণ্ডামি। কিন্তু পরক্ষণেই হাসল সে নিশ্চিন্ত আত্মতৃপ্তিতে। বাংলা দেশেব পাঠক ধরতে পারবে না তার প্রতারণা। তার লেখনীর জাদু তাদেব চোখে মোহ মাখিয়ে দিয়েছে।

কৃষ্ণগোবিন্দ আবির্ভূত হয় সমাজসংস্কারকের ছদ্ম ধরে। ধর্মধ্বজ আর্যঋষির প্রত্যক্ষ বংশধর সেজে। লেখনীকে সম্মার্জনী করে। ক্ষীণকায় একটা মাসিকপত্রের বাহনে। যেখানে যত কিছু ধর্মহানি হয়েছে, সমাজে সাহিত্যে বা রাজনীতিতে, সমস্ত কিছুর উপর সে প্রহার করেছে উলঙ্গ নির্লজ্জতায়, যেটুকু বা আবরণ ছিল দিয়েছে উন্মোচন করে। আর, যাতে সহজেই সাধারণ পাঠক রসাস্বাদ করতে পারে,

অত্যন্ত মোটা, ভোঁতা রেখেছে ভাষাটা। ধর্মহানির শাসনে যে অধর্মাচরণ সেটা যে দেশের লোক ক্ষমা করবে তাদের এই দুর্বলতাটা ধরে ফেলতে তার দেরি হয়নি। নীতির সঙ্গে মিশিয়েছে তাই যৌনতা, আধ্যাত্মিকতা দেহতত্ত্বের সঙ্গে। তাই অশ্লীলতা নিবারণ করতে গিয়ে করতে হয়েছে বিকটতর অশ্লীলতার অবতারণা, বিষে বিষক্ষয়ের ব্যবস্থা। ধর্মোৎসাহী পাঠক কামমোহিত হয়ে উঠেছে। দিকে-দিকে কৃষ্ণ-গোবিন্দের অভ্যর্থনা।

সম্মার্জনীর তাড়নায় কোথায় কি আবর্জনা দূর হল কে খোঁজ রাখে, কৃষ্ণগোবিন্দ দেখল তার পুঁজি ফেঁপে উঠেছে দিব্যি। চিরকালই তার অভ্রভেদী অভিলাষ। খবরের কাগজের ফিরিওয়ালার থেকে প্রধান মন্ত্রীর গদিখানি। মত বা মন নেই, পথ বা আদর্শ নেই, যখন যেটা সুবিধে সেইটেই সু-বিধি। আজ যাকে দিচ্ছে গাল, কাল তাকে দিচ্ছে কোল, আজ যে বা কাঁধে, কাল সে কুক্ষিতে। কৃষ্ণগোবিন্দ উপার্জনের উপায় দেখল এত দিনে। খলভাষণকে নিয়ে গেল ব্যবসার পর্য্যায়ে। যারা জ্ঞানে-গুণে বরেণ্য, সমাজে-সংসারে মাননীয় চর পাঠিয়ে তাদের ছিদ্র খুঁজতে লাগল। কোথায় কার স্খলন, কোথায় কার পথচ্যুতি। অসত্য ও অর্ধসত্যের উপর দাঁড় করাল কর্ণরোচক কাহিনী। সত্যিকারের মূল্য নির্ণয় করতে পেরে কণ্ডূতি-উৎসুক পাঠকের আনন্দ আর ধরে না। সভা করে কৃষ্ণগোবিন্দকে তারা জয়মাল্য দিলে।

সব সময়ে লিখেই কৃষ্ণগোবিন্দ রোজগার করে তা নয়, বেশির ভাগ সময় রোজগার করে না-লিখে। মানে, লিখে ফাঁস করে দিতে পারি, অথচ, যখন বলছ, লিখব না, এই সর্তে রফা ক'রে। অতএব, দাও আমার মুখ বন্ধের সেলামি। উপায় নেই, কেউ দেয় নগদ টাকা, কেউ

মোটর গাড়ি, কেউ ছাপাখানা, কেউ স্ত্রীলোক। কিন্তু জ্ঞানাঞ্জন বকসির বেলায় কৃষ্ণগোবিন্দের খাইটা বেশি তেজী হয়ে পড়েছিল। জ্ঞানাঞ্জন তাকে এক থোকে কিনে নিলেন। এত বড় শক্তিধর লেখক, তাকে উপযুক্ত নজরানা দিতে বাধলনা জ্ঞানাঞ্জনের। মাসিকটা নিয়ে এলেন সাপ্তাহিকে, তাঁরই গুণবর্ণনে। কৃষ্ণগোবিন্দের বাড়ি উঠল। সম্পত্তি হল মালিকানা। তার অধীনে গজাল অনেক মুটে মজুরের আগাছা।

কৃষ্ণগোবিন্দ এখন জ্ঞানাঞ্জনের কীর্তি। একটা পাগলা কুকুরকে শিকলি বেঁধে তিনি লাগিয়েছেন তাঁর দ্বাররক্ষণের কাজে।

জ্ঞানাঞ্জন অনেক কারখানার মালিক, রাজনীতিতে সম্মুখস্থ। আধিপত্য বিস্তারের জন্য তার নিজের একটা কাগজ দরকার, আর সেটা দৈনিক কাগজ। জ্ঞানাঞ্জন স্বপ্ন দেখছেন মন্ত্রীত্ব পেলেই সাপ্তাহিকটা দৈনিকে নিয়ে আসবেন, আর কৃষ্ণগোবিন্দ স্বপ্ন দেখছে কবে আবার কার টাকায় কুপোকাত করবে জ্ঞানাঞ্জনকে।

'আচ্ছা আমি বলব জ্ঞানাঞ্জনবাবুকে।' বললে কৃষ্ণগোবিন্দ।

'কবে আর কখন দেখা করতে পাব জানাবেন আমাকে। ঠিকানা রইল। আর সেটা যত শিগগির হয়।'

অধিপ চলে যাচ্ছিল, ফিরল। কি যেন একটা চোখে পড়ল তার। দেখল সামনের প্রায়ান্ধকার ঘরের এক কোণে বসে একজন জরাজীর্ণ যুবক চোখে চশমা লাগিয়ে খুঁটে-খুঁটে কম্পোজ করে চলেছে। কার প্রত্যহিত যশোগাথা, না, নিজেরই মৃত্যুর পরিচ্ছেদ। একটা নিষ্পেষিত দীর্ঘশ্বাসকে যদি মানুষের আকার দেওয়া যায় তবে সে ঐ যুবক। যদি আকার দেওয়া যায় আশা-আশ্বাসহীন জীবনের অচরিতার্থতাকে।

অধিপ ফিরল। বললে, 'চারদিকে এত পাপ দেখেন, দুঃখ দেখেন না?'

'দুঃখ ?' কৃষ্ণগোবিন্দ চমকে উঠল। যেন অনেকদিন ঐ শব্দটা কানে আসেনি।

'হ্যাঁ, দারিদ্র্য। দারিদ্র্যই যে সব চেয়ে বড় পাপ, বড় অধর্ম, তা স্বীকার করবেন না ?'

'আপনি আবার কোথায় দুঃখ-দারিদ্র্য দেখলেন ?' কৃষ্ণগোবিন্দ অবাক হয়ে রইল।

'ঐ আপনার চোখের সামনে। ঐ যে চোখে চশমা লাগিয়ে অন্ধকারে মৃত্যুর অক্ষর খুঁজছে। সিসের বিষের বিন্দুতে লিখছে যে জীবনের ইতিহাস। তাদের কথা কিছু লিখবেন না ?'

কৃষ্ণগোবিন্দ আশ্বস্ত হল। ধর্মসম্মত নিরাসক্ত ভঙ্গি করে বললে, 'যিনি লেখবার তিনিই লিখবেন।'

হয়তো তিনিই লিখবেন। মনে মনে বিশ্বাস করল অরিপ। লিখবেন স্বেদে, ক্লেদে, অশ্রুতে। হয়তো বা রক্তে। কে বলতে পারে।

রাত্রে জ্ঞানাঞ্জনের সঙ্গে কৃষ্ণগোবিন্দ দেখা করল। কোটের নিচের পকেটে সেই চিঠি।

চিঠি পড়ে জ্ঞানাঞ্জন উল্লসিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু মুখে একটি রেখাও ফুটতে দিলেন না। এই তাঁর চরিত্রের বিশেষত্ব। মনের কথার লেশমাত্র আভাস জাগে না মুখে। উত্তাপ নেই, উত্তেজনা নেই, নিশ্চল নৃশংস তার গাম্ভীর্য। পতনে-উত্থানে সমান অনুদ্বেগ।

উদগ্ররূপে হিন্দু। তার ধর্ম, তার আইন, তার আচার বিচার। তার বিধি পদ্ধতি, তার পরিবার। পরিবারের পিতার সর্বময় প্রভুত্ব। তার সুনীতি। তার শৃংখলা। তার অনৈক্য।

দৃঢ়মুষ্টি ব্যক্তিত্ব, দণ্ডধর। এমন তাঁর শুচিতা যে ভেদ করা যায় না। এমন অহংকার যে ছোঁয়া যায় না। এমন শাসন যে সাধ্য কার

আর্জি পেশ করে! একা-একা অটল দাঁড়িয়ে আছেন স্থবির ভিত্তির উপরে।

শুধু তাঁর টাকার আকাঙ্ক্ষা। দুবল ভোগের জন্যে নয়, উদ্দীপ্ত শক্তির জন্যে। টাকা ছাড়া শান্তি পেতে পার, যশ পেতে পার, কিন্তু শক্তি পাবে কোত্থেকে? টাকা দিয়ে পাবে বশ্যতা, বাধ্যতা, তোমার প্রাবল্যের স্বীকৃতি। তোমার অধিকারের বিস্তার। তিনি কীর্তি চাননা, চান ক্ষমতা, বিশ্রাম চাননা, চান ব্যাপ্তি, মুক্তি চাননা, চান ভার। টাকা দিয়ে পেতে চান একটা জটিল বিষয়ক্রিয়া।

কিন্তু টাকা দিয়েই কি পাওয়া যায় যা চাওয়া যায়?

চারটিই মেয়ে, চিত্রিতা চিত্তরঙ্গিনী। বড়টির বিয়ে হয়েছে এক ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের ম্যানেজারের সঙ্গে। দ্বিতীয়টি পাখায় পুষ্পরেণু মেখে বসন্তে প্রজাপতিপনা করছে। পশ্চাদ্বর্তিনীরা এখন শুধু উপাঙ্গাভিনয়ে সচেষ্ট। আশ্চর্য, তার ছেলে নেই। তার স্ত্রী দীর্ঘদিন রোগশয্যায় লীন হয়ে আছে। এইখানেই জ্ঞানাঞ্জনের নৈরাশ্য আসে মাঝে-মাঝে। এত সব কাকে তিনি দিয়ে যাবেন, কোথায় তার রক্তের প্রতিনিধি, তাঁর চিত্তের প্রতিকৃতি! তার মৃত্যুর পরেও এই ঐশ্বর্যের তিনি স্বাদ পাবেন না এটাই তাকে লাগে একটা শূন্যতার মত। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকেন অপলকে। সহানুভূতিটা মিলিয়ে যায় বিরক্তিতে। না, কোনো আশা নেই তার ভাল হবার। অথচ জ্ঞানাঞ্জনের বয়েসই বা কত! এই সবে পঞ্চাশ পেরিয়েছেন।

'এই চিঠিটা এখন ছাপিয়ে কাজ নেই।' বললেন জ্ঞানাঞ্জন।

'আমারো সেই মত।' সায় দিলে কৃষ্ণগোবিন্দ। 'এখন শুধু হাড়িকাঠই পাতা হয়েছে, বলি এখনো গলা বাড়ায়নি। গলাও বাড়াবে আর অমনি কোপ বসাব।'

'হ্যাঁ, আগে দু'-একটা বক্তৃতা দিক, দেশের জন্যে কি ভাবে প্রাণ দেবে দু-একটা ফর্মুলা-টর্মুলা ঝাড়ুক, তখন ওটা বার করে দিতে হবে। লোকের হাততালি ফুরুতে-না-ফুরুতেই গলাধাক্কা।' জ্ঞানাঞ্জন এক-মুহূর্ত কি চিন্তা করলেন। বললেন, 'অধিপ কি চায়?'

'একটা চাকরি।'

'চাকরি?' জ্ঞানাঞ্জন যেন হতাশ হলেন।

'হ্যাঁ, বাপের সঙ্গে ঝগড়া করেছে। বাপ দেবেনা আর টাকা কড়ি। ছেলে এখন নিজের পায়ে দাঁড়াবে। একটা একশো টাকার চাকরি হলেই নাকি তার চলে যায়।'

এমন একটা চিঠির মূল্য এর চেয়ে আরো অনেক বেশি হওয়া উচিত। ভিক্ষা করলে জ্ঞানাঞ্জন এর চেয়ে আরো অনেক বেশি উদার হতে পারেন। কিন্তু মনের কথা মুখে প্রকাশ করে কোনো লাভ নেই। শুধু বললেন, 'ওকে বলবেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। দিন জেনে যাবেন একদিন।'

জ্ঞানাঞ্জন বকসি আজ ভাবি প্রফুল্ল। সোচ্চাবে নয়, সূক্ষ্ম প্রচ্ছন্ন ভাবে। তাঁর নিজের সৌভাগ্যে তিনি প্রফুল্ল হন না, গম্ভীর হন—যে গাম্ভীর্য গর্বেব প্রতিচ্ছায়া। তাঁব নিজেব সাফল্য হবে এ তো জানা কথা, তা নিয়ে আহ্লাদ করবার কি আছে। তাঁব সাফল্য, তাঁর মতে, তাঁর যোগ্যতার স্বীকৃতিমাত্র। তাঁর প্রফুল্লতাব অর্থই হচ্ছে পরেব সর্বনাশ।

হাটখোলার মন্মথ মিত্তিরের ছেলেটা মোটব চাপা পড়েছিল বলে তিনি প্রফুল্ল হয়েছিলেন। মন্মথ মিত্তিরেব অপবাধ, সে নাকি বলেছিল জ্ঞানাঞ্জনকে উদ্দেশ করে, 'ছেড়ে দাও, ঢের দেখেছি অমন বড়লোক,' আর বলাব সঙ্গে-সঙ্গে উত্তোলিত কবেছিল তার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ। জ্ঞানাঞ্জনের প্রচ্ছন্ন ধারণা, ঈশ্বর তার দিকে বলেই ঐ ঔদ্ধত্যেব জন্যে মন্মথর এই শাস্তি ঘটেছে। মন্মথর যা অপরাধ, হিমাংশু ঘোষের তো তাও নয়। হিমাংশু জ্ঞানাঞ্জনের বড় জামাইর মামার শালা। কোন-একটা ইস্টিশনে গাড়ি বদল করবার সময় তাঁকে সে দেখেও দেখেনি এই অপরাধে তার পক্ষাঘাতে তিনি মনে-মনে প্রফুল্ল হযেছিলেন। হিমাংশুকে তো তবু আত্মীয়তার ক্ষীণ সুতো দিয়ে ছোঁয়া যায়, কিন্তু পরমেশ পালিত তাঁর কে। কেউ না। শুধু এক পাড়াতে থাকে, মুখ চেনা। অপরাধের মধ্যে এই যে, সঙ্গতিপন্ন বলে তার নাম আছে বাজারে, তার স্ত্রী বি-এ পাশ। তাই ট্রাম থেকে পড়ে তার কোমরের হাড় ভেঙে গেলে তিনি

অসাধারণ খুশি হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন স্ত্রীকে যদি এখন একবার দেখাতে পান জানলা দিয়ে।

কিন্তু কে জানতে আসছে তাঁর মনের কথা। লোকে দেখে, বাইরে থেকেই বিচার করে। বন্ধু এটর্নি অটলবিহারীর মৃত্যুমুখ অসুখে জ্ঞানাঞ্জন তার চিকিৎসার অনেক তদারক করেছিলেন, লোকে বলেছিল বিরল এই বন্ধুতা, কিন্তু টের পায়নি কেউ তার মনের চেহারা, প্রতি-মুহূর্তে তিনি যে মৃত্যুকামনা করেছিলেন অটলের। উপেন ঘোষাল ব্যবসাতে ফেল মেরে যখন রাস্তায় এসে দাঁড়াল তখন তার সেই নিঃস্বতায় টাকা ধার দিয়ে সকলের তিনি প্রশংসাই কুড়িয়েছিলেন, কেননা কেউ টের পায়নি সেদিন তাঁর বুকের হর্ষস্ফীতি। যে লোক যে কোনো ব্যাপারে প্রসিদ্ধ তার বিপদে ও বিনাশে তিনি কৃতার্থম্মন্য, কিন্তু সে লোক যদি কখনো তাঁর করুণার প্রত্যাশী হয়ে তাঁর কাছে কৃতাঞ্জলি হয়ে দাঁড়ায়, তা হলে তিনি আর কৃপাকুণ্ঠ থাকেন না। দানে বিতরণে অজস্র হয়ে ওঠেন, সে লোক তখন তাঁর নিচে, আয়ত্তের অধীনে, তার প্রতি করুণাটা তখন তাঁর গর্বের মতই আস্বাদনীয় মনে হয়। পরমেশ পালিতের স্ত্রী কষ্টক্লিষ্ট মুখে তার ছেলে সমরেশের জন্যে একটা চাকরির আবেদন করলে তিনি তা দিয়ে দিতে এতটুকু দেরি বা দ্বিধা করেন নি। পরমেশের স্ত্রীর বৈধব্যের শুভ্রতাটা ঝাঁজালো মদের মত তাঁর রক্তে মিশে মাথায় গিয়ে ধাক্কা মেরেছিল। তাই আজ অধিপ যখন ভগ্ন ভঙ্গিতে তাঁর কাছে এসে চাকরি চাইবে তিনি তা অকাতরে দিয়ে দেবেন। লোকে জানবে শত্রুর পুত্রও যদি বিপন্ন হয় তিনি উপকার করতে বিমুখ হননা। কিন্তু মনে-মনে হাসলেন জ্ঞানাঞ্জন, কে জানতে আসছে তাঁর অন্তরের ক্রিয়াকলাপ।

যেমনটি ভেবে রেখেছিলেন জ্ঞানাঞ্জন। তাঁর অনুমান কখনো ভুল

হয় না। ন্যুব্জ ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকল অধিপ। ম্লান মুখে যে হাসি হঠাৎ ভেসে উঠে মিলিয়ে গেল সেটা তার পরাজয়ের স্বীকৃতি। খুব নরম তার গলার আওয়াজ, নরম তার সমস্ত উপস্থিতিটাই। রোগে চেহারা শুধু কাহিল হয়েছে নয়, বেশবাসের আদ্যোপান্ত পরিবর্তন হয়েছে। যে লোক টপ-গিয়ারে চলছিল সেই পড়েছে এখন চাকার তলায় ছিটকে। জ্ঞানাঞ্জন মনোরম আরাম পেলেন।

অধিপ অতি সংক্ষেপে জানাল তার দুর্দশার ইতিহাস। মোটরটা হাত ছাড়া, ব্যাঙ্ক নিঃশেষিত। পাহাড়ের গা বেয়ে গড়াতে-গড়াতে পড়েছে এসে খাদে, আর উঠতে পাববে কিনা ঠিক কি। তবু চেষ্টা করে দেখবে সে একবার। জীবনে একটি মুহূর্ত বাকি থাকলেও সেই শেষ মুহূর্তেই সৈন্য তার শেষ গুলি ছুঁড়তে পারে। আবার প্রথম থেকে, নিচে থেকে আরম্ভ করতে হবে। আমার জীবনেই সমাপ্তি না হয় তো না হোক, কিন্তু সূত্রপাত তো হবে। হ্যাঁ, কিছু সাহায্যের জন্যেই আসা।

হুবহু মিলে গেছে এবার। আরো মিলবে প্রমথেশ যখন এমনি অনুগ্রহের জন্যে আসবে তার ঘরের দুয়ারে, বসবে ভিক্ষুকের মত বিনয়-মলিন হয়ে। মনে-মনে প্রসারিত, বিস্ফারিত হলেন জ্ঞানাঞ্জন। এখন যখন অধিপ নিপতিত, নিম্নগত, তখন তাকে সাহায্য করতে খুব ভাল লাগবে তাঁর। গভীর আত্মপ্রসাদের ভাবটা গোপন করে বললেন, 'কিছু সাহায্য চাও, আমি করতে পারি। যা আমার সাধ্য।'

চরিতার্থের মত অধিপ মুখ করল। এমন অবনত মুখ তার কেউ দেখেনি। কিন্তু তার জীবনের রঙ গিয়েছে জলে। দিনের মুখ দেখছে সে এখন অন্য রকম চোখে। অন্য কোণ থেকে।

'আমি জানি আপনাকে।' অধিপের কণ্ঠস্বরে গদগদ কৃতজ্ঞতা।

'তুমি এখন কি করতে চাও? বিজনেস? অডার সাপ্লাইর কাজ যদি করো—'

'না, ও সব লম্বাই-চওড়াই কিছু নয়। একটি সামান্য সাধারণ চাকরি চাই আপনার আপিসে। আপনি ইচ্ছে করলে—'

'চাকরি? চাকরি করবে কি হে?' জ্ঞানাঞ্জন তাচ্ছিল্য প্রকাশ করলেন।

'ম্যাট্রিকটা শুধু পাশ—'

'তুমি আবার ম্যাট্রিক পাশ করলে কবে?'

'আমি নয়। আমি তো ভুঁইফোঁড়, বেবনিয়াদ। আমার কথা কে বলছে?'

জ্ঞানাঞ্জন আপাদমস্তক দেখলেন আরেকবার অধিপকে। বললেন, 'তোমার নিজের কথা বলছ না?'

'না। আমি পুরুষ, আমার কিছু ভয় নেই। আজ না জোটে কাল জুটবে, কাল না জোটে পশু হয়তো কেড়ে নিতে পারব। কিন্তু যার কথা বলছি—'

'কে সে?'

একটুও দ্বিধা করল না অধিপ। 'একটি নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালী মেয়ে। একেবারে একাকিনী।'

আঘাতের মত লাগল এসে চমকটা। সামলে নিয়ে জ্ঞানাঞ্জন প্রশ্ন করলেন, 'তোমার কোনো আত্মীয়?'

'না, আত্মীয় কোথায়!'

সন্দেহের একটু ঘোর এসে লাগল জ্ঞানাঞ্জনের চোখে। কিন্তু মেয়ে-পুরুষের সম্পর্কের ব্যাপারে বিশদ আলোচনায় তাঁর বিন্দুমাত্র রুচি নেই। তবু হঠাৎ তিনি অপ্রস্তুত বোধ করলেন। যে কেউই হোক, কোনো

স্ত্রীলোককে তাঁর অফিসে তাঁরই অধীনে কাজ দিতে হবে বিষয়টা তাঁর কাছে অত্যন্ত অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে।

'কিন্তু বড দুঃস্থ।' অবিপ একটু প্রগাঢ় হল: 'নির্বান্ধব। একটা তাকে দাঁড়াবার জায়গা করে দিতেই হবে আপনাকে।'

'মাস্টারি-টাস্টারি হয় না?'

পীড়িত মুখে অবিপ বললে, 'হয় হয়তো, কিন্তু সে বড্ড কম মাইনে। মেয়েটি ভদ্র। একটা ভদ্র সংস্থান তার দরকার।'

'কত টাকা মাইনে সে আশা করে?'

'অন্তত একশো।'

জ্ঞানাঞ্জন ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের ভঙ্গি করলেন। 'একটা ম্যাট্রিক পাশ মেয়ের একশো টাকা মাইনে? তাও যে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।'

অবিপ চুপ করে রইল। হতবলের মত।

'টাইপরাইটিং জানে?'

'না বোধহয়। এ বছব আই-এ দিয়েছিল শুনেছিলুম, গেজেটে নাম দেখলুম না।'

জ্ঞানাঞ্জন ডাঙায় বাঘ জলে কুমির দেখতে লাগলেন। ভেবে পেলেন না কী চাকরি দেয়া যায় এই শরণাগতাকে।

'যা হোক কিছু। কিছু একটা লেখাপড়ার কাজ। হিসেব রাখা, চিঠিপত্র নকল করা, যা আপনার পছন্দ।' অধিপের স্বরে মিনতি ফুটে উঠল: 'সে যাতে বুঝতে পারে নিঃসন্দেহে সে একটা চাকরি করছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাঁধা, নির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে, আর একটা রুচিকর মাইনে। বেশি দিন আপনাকে টানতে বলছি না, বড় জোর ছ মাস। এই ছ মাসের মধ্যে শিখতে দিন না তাকে স্টেনোটাইপিংটা। আপনি ইচ্ছে করলে—'

জ্ঞানাঞ্জন নিঃশব্দে হাসলেন, মানে গর্বের রেখা ফোটালেন। বললেন, 'আচ্ছা, তাকে একদিন পাঠিযে দিও আপিসে। দেখি একবার। কী নাম মেযেটির ?'

'তামসী দত্ত।'

বৃহৎ বৃক্ষেব শীর্ণ শাখায নিবীহ একটি পাখি এসে বসেছে, পল্লব-ঘনিমাব মাঝখানে। না, ওটা পাখি নয, মৃদু-মেদুব একটুকবো মেঘ, আকাশের এক কোণে শান্তমুখে ঘুমিযে আছে। সেই মেঘই কি ক্রমশ সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে পড়ল না ? কল্পান্তকালীন ঝড় উঠলনা আকাশে ? আব সেই ঝড়ে বলোদ্ধত বনস্পতি কি উন্মূলিত হযে গেল না ?

কিন্তু তামসীকে অবিপ কি কবে খবব দেয ? চিঠি লিখে ? চিঠি সে বিশ্বাস কববে না, ভাববে কোনো নতুন চক্রান্ত। সোজাসুজি গিযে দেখা কবাই ভাল। অন্তত সব কথা বুঝিযে বলে আসা যায স্পষ্ট কবে। সে কি আছে একনো 'ছাত্রীছত্রে' ?

আছে, কিন্তু লজ্জাবতী দেখা কবতে দেবেন না। কাবণ তামসীব অভিভাবকের লিস্টিতে অধিপেব নাম নেই। কাবই বা আছে জিগগেস কবি ? না থাক, তাই বলে যে-কেউ এসে ভিজিটার্স রুমে মাথা গলাতে পাবে না। আর অভিভাবক হলেই বা কি, তাব দস্তখতেব নমুনা দেযা আছে কই ? অবিপ চেনা আছে বলেই হস্টেলের আইন-কানুন অমান্য কবা যায না।

তা হলে এক কাজ কবা যাক। অবিপ ঢুকছে না ভিজিটার্স রুমে, বাস্তায়ই দাঁড়িযে থাকছে। যত কড়াক্কড় তো হস্টেলের ভিতরে, বাইরে নয। তাই মিস দত্তকে যদি দযা করে একটু বাইবে ডেকে দেন। একদিন মোটবে বেড়িযেছিলেন, আজ যদি একটু পাযে হাঁটতে না তার সংকোচ হয।

একটা তক্তপোষে আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়ে রাধারাণী কাঁদছে, আর তারই শিয়রে বসে হাসছে তামসী। দু' জনেই তারা ফেল করেছে আই-এতে। রাধারাণী ভাবছে সমুদ্রের অতলে দাঁড়াবার তার আর স্থান নেই; তামসী ভাবছে এই ব্যর্থতাটাকে যেন না প্রবঞ্চিত করি, যেন তাকে নিয়ে যেতে পারি বড় কোনো সার্থকতার সন্ধানে। তাই ভবদেব যখন তার অনেক বাধা-বিপদের কথা উল্লেখ করে অনেক প্রবোধ দিয়ে আরেকবার পরীক্ষা দেবার জন্যে প্ররোচিত করে চিঠি দিয়েছে, তখন জবাব দিয়েছে তামসী: *'আশীর্বাদ করুন, মানুষের বড় পরীক্ষার জন্যে যেন তৈরি হতে পারি, আর সে-পরীক্ষায় যেন না ফেল হই।'*

তামসী আজকাল বাড়ি-বাড়ি ঘুরে খদ্দর বিক্রি করে। একটা স্বদেশী দোকানের সঙ্গে সে বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। কাপড় সে নিজে কাঁধে করে বয়ে বেড়াতে পারেনা বলে শুধু নমুনা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। যার পছন্দ হয় তার চাহিদা মত ফের কাপড় দিয়ে আসে। একবারের জায়গায় দু বার হাঁটতে হয়। তবু পরিশ্রম করতে সে কার্পণ্য করে না। তারপর সকালে বিকেলে পাঁচ-টাকা করে দুটো টিউশনি করে; দুটি অপোগণ্ড ধনীদুহিতাকে ইংরিজি শেখায়। সব মিলিয়ে বড় জোর পচিশ টাকা রোজগার হয়। লজ্জাবতীর লজ্জা নিবারণ করে বিশেষ কিছু আর উদ্বৃত্ত থাকে না। যেটুকু বা থাকে, সবটুকুই সে নিষ্ঠুরের মত সঞ্চয় করে। নিজে কিছু খায়না পরেনা, টুকিটাকিও কেনাকাটা করেনা। একটা চিঠির খামের মধ্যে সিকি-দুআনি টাকা-পয়সা স্তূপীকৃত করে। আর থেকে-থেকে গোনে, পর দিনের সূর্যোদয়ের প্রসন্নতা কামনা করে। না, ভয় নেই, ত্রিশ টাকা পূরণ হয়েছে এত দিনে, তিলে-তিলে, কিছু-কিছু আয়ুক্ষয়ে। রক্তের শোধন হয়ে গিয়েছে। পাঞ্চালী বেণী বাঁধবে এত দিনে।

ঝি এসে বললে, অধিপবাবু এসেছেন।

'কে ?' তামসী চমকে উঠল।

'সেই যে গো সেই মোটরওয়ালা বাবু। যার গাড়িতে চড়ে তুমি আর সেই চন্দ্রবদিদিমণি হাওয়া খেতে যেতে—'

সিদ্ধান্ত করতে তামসী এক মুহূর্ত দেরি করল না। বাক্স থেকে ভারি খামটা বার করে নিল। আঁচলটা শুধু গুটিয়ে নিল জামার উপর। জুতো নেই, খালি পা, ধুলো মাখা। চুল আবাধা। তরতর করে নেমে এল নিচে। অশাসন মুক্তিতে। রোয়াক থেকে নেমে এল রাস্তায়।

স্নিগ্ধ অভিনন্দনের হাসি হাসতে গিয়ে তামসী কি চমকালনা একটুও? অধিপের চেহারা এ কী হয়ে গিয়েছে। কেমন রুক্ষ আর ঢিলে। আগাগোড়া বিশ্রী সহান। পরনের প্যান্টটা শাদা, কতখানি ময়লা তাই বোঝা যায় স্পষ্ট। গায়ের হাফ শার্টের উপরে কোট নেই বলে শরীরের জীর্ণতা নজরে পড়ে। পায়ে স্ট্র্যাপ বাঁধা জুতো, মোজা নেই। খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। চোখের কোলে কালিমা।

আর তামসীর মাঝে কী দেখল অধিপ? উপেক্ষা। নির্লিপ্তি। প্রত্যাহার। তার সজ্জায় তার ভঙ্গিতে তার চক্ষের নিক্ষেপে।

'রাস্তা ছাড়া আর জায়গা নেই। তবু রাস্তাটা ছিল বলে দেখা হল। কথাটা বলতে পারব। চিঠি লিখে যে কাজ হবে না তা আমি জানি।'

তামসীর এতটুকু ভয় নেই। বললে, 'বিস্তারিত যদি কিছু হয়, চলুন, হাঁটতে-হাঁটতে বলবেন।'

এই পোশাকে? খালি পায়ে? হ্যাঁ, পোশাকের মেকি দিয়ে সম্ভ্রান্ত সাজতে চায়না তামসী। আর খালি-পায়ে রোজ সে চার-পাঁচ মাইল হাঁটে। যখন তার নেই তো নেই। আবার যদি কখনো হয় তো হবে। তা বলে পথ-চলা তো বন্ধ করা যাবে না।

'না, বক্তব্যটা আমার অত্যন্ত ছোট।' কি রকম গুটিয়ে গেল অধিপ : 'অনায়াসেই আপনার আঁচ করা উচিত!'

চিহ্নহীন চোখে তাকিয়ে রইল তামসী।

'বুঝতে না পারারই কথা। যাক, বেশি কিছু নয়, আমার সেই টাকা তিরিশটা চাই।'

এক মুঠ ধুলো কে তামসীর মুখের উপর ছিটিয়ে দিল। এক মুহূর্ত রইল সে রুদ্ধ নিশ্বাসে।

'বলবেন কাজ নেই। তা আমি জানি। তাই যাতে টাকা কটা ফিরে পাই তারি জন্যে আমাকে একটা কাজ পর্যন্ত জোগাড় করে আনতে হয়েছে।'

কাজ? একটা সৌরভময় স্পর্শ যেন লাগল তার শরীরে। সত্যি, তার একটা কাজ দরকার, যাতে কিছুটা বিশ্রাম, কিছুটা নিশ্চিন্ততা। বাইরে সে স্বীকার করে না, কিন্তু নিজে সে তো জানে কী কষ্ট এমনি দোরে-দোরে ফিরি করা! কী লজ্জার এই দারিদ্র্য! সে তো জানে।

তা ছাড়া, আইনে বাধছে বলে লজ্জাবতী তাকে আর এখানে থাকতে দিতে প্রস্তুত নয়। যারা পড়বে তারাই এখানে থাকবে, যারা ফিরি করে জীবিকার্জন করবে তারা নয়। তাদের স্থান বস্তিতে। এর পর হয়তো কোনো ভদ্র বস্তির দরিদ্রতম অংশে গিয়ে তাকে বাসা নিতে হবে। কলেজের নতুন সেশন আরম্ভ হলেই খসে যেতে হবে তাকে। শীতের শুকনো পাতার মত। কোথায় উড়ে যাবে তা কেউ জানে না।

'না, দরকার নেই। আর কোনো কাজ চাই না আমার। এই নিন আপনার টাকা।' বলে টাকা-ভরতি খামটা অধিপের অনড় হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে তামসী বাড়ির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তেরো

চওড়া, মোটা একটা খাম এল তামসীর নামে। মেয়েরা লোকালুফি সুরু করল। ভাবল বুঝি-বা প্রেমপত্র।

জ্ঞানাঞ্জন কটন মিলস থেকে চিঠি এসেছে। তামসী যে চাকরির জন্যে দরখাস্ত করেছিল তা প্রায় হয়ে গিয়েছে। শুধু প্রাথমিক একটা ইণ্টারভিয়ু দরকার। হ্যাঁ, একশো টাকা মাইনেতেই তারা রাজি।

'তুই কবে দরখাস্ত করলি?' মেয়েরা তাকে ঘিরে ধরল।

তামসী আর বোকা বনবে না। গম্ভীর হয়ে বললে, 'করেছিলাম এক দিন। কাউকে বলিনি। আগে থেকে বললে হয় না।'

লজ্জাবতী মুরুব্বির মত; তার কাছে পরামর্শ চাইল তামসী। তিনি পই-পই করে বারণ করলেন। বললেন, জ্ঞানাঞ্জন একটি গো-বাঘ, নিরীহ দেখলেই ঘাড় মটকান। আর কে না জানেন, ও-সব কলকারখানায় ভদ্রমেয়েদের শ্রী-ছন্দ কিছুই বজায় থাকে না। সমস্তক্ষণ মনে-মনে এই আশা করতে লাগলেন, তামসী ভয় পেয়ে সরে দাঁড়ালেই তিনি নিজে গিয়ে প্রার্থী হবেন সংক্ষেপে। বয়েস চল্লিশ পেরিয়ে গেলেও তাঁর চালচলনে সম্ভ্রান্ততা এখনো নিখুঁত আছে।

কিন্তু তামসী ভয় পাবে না। সে একা, সে মুক্ত। পিছনে তার পরিবার নেই, সমাজ নেই চারপাশে। সে দুঃসাহসী। সে দুর্বারণ।

পথরেখা যেখানে এসে লুপ্ত হয়েছে সেখান থেকে করতে হবে তাকে নতুন পথের সূচনা। সে যদি না এগোয় তো কে এগোবে?

কিন্তু, সে কি এগুচ্ছে, না, কেউ তাকে ঠেলে দিচ্ছে পিছন থেকে? ঠেলে দিচ্ছে। কে সে? বর্বর নাম, ক্ষুধা। সভ্য নাম, জীবনমর্যাদা।

অত্যন্ত শস্তায় একজোড়া স্যাণ্ডেল কিনলে। হাতে কেচে নিল শাড়ি, সেমিজ-ব্লাউজ। পরিধানের ভঙ্গিতে ফোটাল একটা দৃপ্ত দৃঢ়তা। চুলগুলি অচিক্কণ। খোঁপাটা উদ্ধত। সমস্ত মুখভাবে নিষ্ঠুর অস্পৃহা। দেখা যাক কী হয়। সে প্রস্তুত জীবনকে দেখতে।

সে বৈফল্যের কথাই ভাবছে। মনে-মনে সে হাসল। কে জানে, তার হয়ে যেতেও তো পারে চাকরিটা। কিছুটা আথিক স্বাধীনতা, শোভন জীবিকা, আত্মপ্রত্যয়।

দশটা বাজে। খানিক ট্র্যামে, খানিক পায়ে। হাতে ব্যাগ বা ছাতা নেই, কেমন নির্বোধ দেখাচ্ছে হয়তো। দেখাক। দৃকপাত না করে সোজা উঠে গেল সে সিঁড়ি দিয়ে। অনিবার্যের মত। কেউ নেই তাকে বাধা দেবার। না কোনো লজ্জা, না কোনো রূঢ়তা।

আপিস বসে গেছে মোটা-মোটা খাতা মেলে। দোরগোড়ায় একটা সসজ্জ চাপরাশি দাঁড়িয়ে। নাম-লেখা কাগজের একটা টুকরো তার হাতে দিল তামসী। একেবারে বড় সাহেব।

তখনি ডাক পড়ল। তাঁর কামরায় জ্ঞানাঞ্জন একা। উঁচু চেয়ারে নিখুঁত বসে আছেন। তামসী সমুখে এসে দাঁড়াল। চাপরাশি দরজার ধার থেকেই অন্তর্ধান করলে।

জ্ঞানাঞ্জন দেখলেন তামসীকে। তার জীবত্বব্যঞ্জনাকে। এততেও যেন মেয়েটি বেঁচে আছে, মিইয়ে যায়নি। টান-টান চেহারা, আঁট দিয়ে গেরো বাঁধা। রঙ শামলা, কিন্তু ধারালো একটা দীপ্তি আছে। সব

চেয়ে আছে চামড়ার স্বাস্থ্য। গ্রাম্য সবুজের তীক্ষ্ণতা। সমষ্টিতে উপনীত একটা সুস্পষ্ট সুসাম্য।

'আপনিই বুঝি অধিপের—'

প্রশ্নটা মুহূর্তে আঁচ করে নিল তামসী। অকপট মুখে বললে, 'হ্যাঁ, তিনিই আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

'বসুন।'

বসল সামনের চেয়ারে। পরের কথার জন্যে প্রতীক্ষা করে রইল। প্রস্তুত করে রাখল নিজেকে।

'আছেন কোথায়?'

বললে তামসী। শেষে যোগ করল: 'এ মাসের পর আব থাকা যাবেনা। হস্টেলের পাওনা বাকি পড়ে গেছে।'

'হ্যাঁ, শুনেছি। কিন্তু কী আপনাকে চাকরি দিই বলুন তো?' জ্ঞানাঞ্জন তাকালেন তামসীর দিকে। চাউনিটা কেমন অসহায়।

তামসী চোখ নামাল। বললে, 'যা হয় একটা কিছু।' শেষে যোগ করল: 'যা ভালো হয়।'

জ্ঞানাঞ্জন হঠাৎ সরে গেলেন সেদিক থেকে। প্রশ্ন করলেন: 'কে-কে আছে আপনার?'

'কেউ না।' বলতে যেন অনেক নিবৃত্তি পেল তামসী।

'এ একটা কাজের কথা হল না। একেবারে কেউ নেই এ কখনো হতে পারে?'

'তা নয় ঠিক। তবে যাঁরা আছেন তাঁরা আমাকে টানেন না, ঠেলেন। দায়িত্বও নেন না, নির্ভরও করেন না।'

'তবু শুনি।'

'দেশের বাড়িতে কাকা-কাকি আছেন, দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন

মুখের উপর। বলেছেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে।' তামসী ঢোক গিলল।

কেন দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন, জ্ঞানাঞ্জন কারণ জানতে চাইলেন না। হয়তো দারিদ্র্য, নয় তো কোনো কালো ইতিহাস। কালো ইতিহাসই সহজে অনুমান করে নিলেন। অনুমান করে নিতেই তার আনন্দ হল। বললেন, 'ভাই-বোন?'

'নিজের ভাই নেই। একটি বোন আছে ছোট। বিয়ে হয়ে গেছে।'

'সে কি! আপনার নিজের তো এখনি বলে মনে হচ্ছে। কি, হয়েছে?'

'না।'

আরো ঘোরালো হয়ে উঠল সেই ইতিহাসের কল্পনা। আরো উপভোগের।

'কেন হলনা?'

তামসীর কানে বিশ্রী লাগল। প্রত্যেক মেয়ের বেঁচে-থাকাটা কি কেবল বিয়ে-হওয়া দিয়েই নিষ্পন্ন হবে? বিয়ের সম্ভাব্যতা ছাড়া আর কোনো যোগ্যতার সংকেতই কি থাকবেনা তাদের জীবনে, তাদের আকৃতিতে? কিন্তু অবিনীত কিছু বলতে পারেনা তামসী। না, মন্দ কি বিবেটা। অনেক দিনের প্রতিষ্ঠান তো একটা বটে।

'ভাগ্য কি সবার সমান হয়?'

'ও! তাই চাকরির খোঁজে বেরুতে হয়েছে। তা, অধিপ আপনার কে?'

'কেউ না।' গলায় ঝাঁজ ফোটাল তামসী।

'কেউ না? কিন্তু আপনাকে চাকরি দেবার জন্যে তার ঝোলাঝুলির তো অন্ত নেই। তার আগ্রহের রহস্যটা কি, জানতে পারি?'

'আমি কটা টাকা ধারি ওঁর কাছে। কিছুতেই শোধ দিতে পাচ্ছিলুম না। তাই যাতে শিগগির ঋণমুক্ত হতে পারি তিনি আমার জন্যে একটা চাকরির চেষ্টা করছিলেন—'

জ্ঞানাঞ্জন এমন নন যে ব্যাখ্যাটা তাঁর মনঃপূত হবে। বললেন, 'টাকা ধার করেছিলেন কেন?'

'ঠিক ধার নয়। একটা চাকরির মাইনে বাবদ আগাম নিয়েছিলুম টাকাটা।'

'ওর অধীনে চাকরি? কী চাকরি?' ভারি মজা পেলেন জ্ঞানাঞ্জন।

'প্রথমটা বুঝতে পারিনি কী চাকরি! ভেবেছিলুম ছেলেমেয়েদের মাস্টারি বুঝি। তাই অন্তত বুঝতে দিয়েছিলেন আমাকে। তখন দিন যাচ্ছে আমার ভীষণ টানাটানিতে, তাই হাত বাড়িয়ে আগাম নিতে হয়েছিল টাকাটা। তিনিও দিয়েছিলেন খুশি হয়ে। কিন্তু—'

'অদ্বিপের আবার ছেলেপিলে কোথায়?' জ্ঞানাঞ্জন হেসে উঠলেন।

'ধোঁকা দিয়েছিলেন স্পষ্ট। ওঁর বাড়ি গিয়ে দেখলুম, কাজটা মোটেই পরিচ্ছন্ন নয়। উনি ভাবেনইনি পরিচ্ছন্ন ভাবে। তাই রাগ করে আমাকে বেরিয়ে আসতে হল।'

এত অল্পে জ্ঞানাঞ্জনের তৃপ্তি হল না। 'কেন, ও কী বলেছিল আপনাকে করতে?'

'উনি ভেবেছিলেন আমি ওঁর নর্মসখী হব। তারি জন্যে আমি মাইনে নেব মাস-মাস।'

কথাটা দুরূহ ঠেকল জ্ঞানাঞ্জনের। 'কী সখি বললেন? বুঝতে পারলুম না ব্যাপারটা।'

'মানে, সাময়িকভাবে ওঁর সঙ্গিনী হতে হবে আমাকে। ওঁর সঙ্গে

বেড়াতে হবে মোটরে, যেতে হবে হোটেলে, বসে গল্প-গুজব করতে হবে বাড়িতে। এ রকম যে একটা চাকরি হয়, এ রকম একটা চাকরির প্রস্তাব যে কোনো ভদ্রলোক কোনো ভদ্রমেয়েকে করতে পারেন আমার ধারণা ছিল না। আশ্চর্য।'

'কিছুই আশ্চয নয়। অন্তত অধিপের পক্ষে। আমি জানি ওর ভিতরকার চেহারা। কিন্তু আমি আশ্চয হচ্ছি, ওর সঙ্গে আপনার চেনা হল কি করে?'

তামসী বুঝতে পারছে আলোচনাটা উপভোগ করছেন জ্ঞানাঞ্জন। করু•, কিন্তু তামসী আর ভয় পাবে না। উন্নতির সিঁড়ির কাছে এসে সে আর ফিরে যাবে না সর্বশূন্য রাস্তায়।

'সে আর বলবেন না। আমার হস্টেলের এক ছাত্রীবন্ধু ভারি কাঁদত আমার দুর্দশায়। আমার কষ্ট লাঘব করার জন্যে সে আমার সঙ্গে অধিপবাবুর আলাপ করিয়ে দিল। কলকাতার এক রাতের হোটেলে। অধিপবাবু আমাকে মদ নিয়ে সাধলেন।'

'কী সাংঘাতিক!'

'ছাত্রীবন্ধুটি যে আমার এমন হিতাকাঙ্ক্ষী তা বুঝতে পারিনি আগে। আসলে ও দূতী ছিল অধিপবাবুর।'

'এমনি অধিপের অনেক জোগাড়ে আছে বলে শুনেছি।' জ্ঞানাঞ্জন ভারি স্বস্তি পেলেন তামসীর এই জাজ্জ্বল্যমান বিতৃষ্ণায়। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন ওর খপ্পর থেকে।'

'কিন্তু যদ্দিন ওঁর টাকাটা না শোধ করতে পারব ততদিন উনি আমার পিছু ছাড়বেন না। মানুষে যে সামান্য কটা টাকার জন্যে এমন করে কাউকে পীড়ন করতে পারে জানতুম না কোনোদিন।' সাহসে জ্বলতে লাগল তামসী।

জ্ঞানাঞ্জন হঠাৎ তাঁব টেবিলেব টানা টেনে ধবলেন। ভিতব থেকে কতগুলি দশ টাকাব নোট বেব কবে এগিযে ধবলেন তামসীব দিকে। বললেন, 'কত? একশো?'

'কাছাকাছি।' তামসীব গলাব স্বব এতটুকু কাঁপল না।

'এব পব যদি আসে, শিগগিবই আবাব আসবে ভয কবছি, ওব মুখেব উপব ছুঁড়ে দেবেন টাকাটা। তাবপব দেখি কেমন ও আব আপনাব ছাযা মাড়ায।'

স্বচ্ছন্দেই টাকাটা গ্রহণ কবল তামসী। হাতেব কাছে সুযোগ এসে পড়লে তা আব সে ফিবিযে দেবে না।

'না না, এটা কিন্তু তেমনি ধাব মনে কববেন না।' জ্ঞানাঞ্জন কুণ্ঠিত হবাব ভান কবলেন 'এ আপনাব মাইনে। আপনাব চাকবিব বাবদ।'

তামসী জানত চাকবি তাব হবে।

'আব টাকা নিয়ে যদি সবেও পড়েন, না এ আসেন চাকবিতে, আমি ঐ টাকাব জন্য আপনাব পিছু নেবনা।'

'ছি ছি, কাব সঙ্গে কাব তুলনা।' তামসীব স্বব গদগদ হযে উঠল।

'দেখুন, মোটবে কবে শুধু শুধু হাওয়া খেযে বেড়াবাব আমাব সময নেই। আমি কাজেব মানুষ, কাজ চাই।' জ্ঞানাঞ্জন একটা আবেশ অনুভব কবলেন।

কিন্তু কাজটা কী। আপাতত বিশেষ কিছুই নয। বড জোব কয়েকখানা চিঠি নকল কবা। আব পাবলিসিটিব কিছু সাহায্য কবা। আসল কাজ হবে টাইপবাইটিং শেখা। একটা মেশিন আসবে, তাই বেশিব ভাগ সময বসে-বসে ঠুকঠুক কবা। হ্যাঁ, মাইনে এখন একশো। তবে টাইপবাইটিং শেখা হযে গেলে কি দাঁড়ায বলা যায না। তখনকাব কথা তখন। কাল থেকেই লেগে যান কাজে। কি বলেন?

এতক্ষণে তামসীর রুক্ষ চোখ ভরে উঠল নম্র, নিষ্পলক কৃতজ্ঞতা। এমন চক্ষু জ্ঞানাঞ্জন দেখেন নি। এমন অলস, আচ্ছন্ন চক্ষু।

তারপর, খানিক পর, তামসী যখন চলে গেল, তখন তার মধ্যে জ্ঞানাঞ্জন দেখতে পেলেন একটা অদ্ভুত একাকীত্বের চেহারা। অনুভব করলেন তিনিও অত্যন্ত একাকী।

পর দিন প্রথম আপিস যাবার মুখে তামসী ট্র্যামে চড়ল। সে বাঁচছে, এগিয়ে যাচ্ছে, অদ্ভুত একটা শিহরণ তাকে স্পর্শ করছে বারে-বারে। বহুলোকের জনতায় সেও তার স্বাধীন জীবনের স্বত্ব সাব্যস্ত করতে চলেছে। আঘাত লাগুক, মালিন্য লাগুক, তবু সে টলবে না, পিছু হটবে না—সেই সংকল্পের কাঠিন্য ফুটেছে শরীরে। পরনে সেই মোটা আধ-ময়লা খদ্দর শাড়ি, পায়ে শস্তা স্যাণ্ডেল, চুলে কর্কশ বিশৃংখলা।

তার জায়গা হয়েছে জ্ঞানাঞ্জনের পাশের ঘরেই, পুরু কাঁচের আধখানা বেড়ার আড়ালে। আগে ওখানে যে প্রাইভেট সেক্রেটারি বসত সে একটা দূরের ঘর পেল। টাইপরাইটার আসেনি বটে, কিন্তু আর সব নিখুঁত, ফিটফাট। টেবিল, চেয়ার, ব্লটিং-প্যাড্, দোয়াতদান, কাগজচাপা, অনেক রকম সরঞ্জাম। একটা কিছু বোধগম্য স্পর্শসহ বলে মনে হয়। আর কিছু না হোক, জানলা দিয়ে ব্যস্ত রাস্তাটা তো দেখা যাবে। খবরের কাগজ—হ্যাঁ, আজকের খবরের কাগজই রেখে গেছে তার জন্যে—পড়া যাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

কলিং-বেলে জ্ঞানাঞ্জনের মোটা আঙুলের বাড়ি পড়ল। আবির্ভূত হল চাপরাশি। ডেকে নিয়ে গেল তামসীকে।

'বসুন।' বললেন জ্ঞানাঞ্জন।

কাজের কথা যদি থাকে তবে তো তা তামসী দাঁড়িয়েই শুনে নিতে পারে। মুখোমুখি চেয়ারে বসে সম্পর্কটা ফিকে করে দেয়া কেন?

তামসী নিজেকে ধমকে উঠল। সে স্ত্রীলোক বলেই মর্যাদা পাচ্ছে। আর বসলেই সে একেবারে ভেঙে পড়ছে না।

এই কটা লেখা এসেছে ডাকে, আমাদের কাপড়ের বিজ্ঞাপনের প্রতিযোগিতায়। পড়ে দেখুন কোনটা সব চেয়ে ভাল হয়েছে।' ফিতে-বাঁধা একটা ফাইল জ্ঞানাঞ্জন তামসীর দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

ফাইল নিয়ে তামসী চলে যাচ্ছিল, জ্ঞানাঞ্জন বাধা দিলেন। বললেন, 'অদিপ এসেছিল ?'

'না।'

'এলেই, আর কথা নেই, সটান টাকাটা ছুঁড়ে মারবেন মুখের উপর। ভুলবেন না কখনো।'

'কখনো না।'

এবার ঠিক তামসী উঠে যাবে, জ্ঞানাঞ্জন হঠাৎ গলা নামিয়ে বললেন, 'আপনি হাতে কাঁচের চুড়ি পরেছেন কেন ?'

তামসীর ইচ্ছে হল হাত দুটোকে কেটে ফেলে দিতে। তার হাত খাটবার জন্যে, সাজবার জন্যে নয়। তাই যদি হয়, সে দু'হাত শূন্য, রিক্ত রাখেনি কেন ? চোখ নামিয়ে অস্ফুট হেসে তামসী বললে, 'সোনার চুড়ি পাব কোথায় ?'

জ্ঞানাঞ্জন গম্ভীর হলেন।

এইবার সত্যিই তামসী উঠে দাঁড়াল।

'আর শুনুন, আমি আরো আপনাকে কিছু টাকা দিচ্ছি, আপনি ভাল দেখে কিছু জামা কাপড় কিনুন। পোশাকটা একটু বেশ সম্ভ্রান্ত হওয়া দরকার। নয় কি ? পোশাকটা গরিব করে রাখলে লোকে একটু অন্য চোখে তাকাতে চেষ্টা করে—বিশেষত আপিসে। মানী আপিসে। কি বলেন; ঠিক নয় ?'

তামসী কিছু বলল না। কিন্তু তার স্তব্ধতা এমন ভাব বহন করল যেন সে জ্ঞানাঞ্জনকে সমর্থন করছে।

'আর দেখুন, আপনার ঐ হস্টেলের পাওনা কত বাকি পড়েছে? মিটিয়ে দিন সেটা। সেটাও আমি দিয়ে দিচ্ছি। হস্টেল ছেড়ে চলে আসুন ফ্ল্যাটে। রসা রোডে আমার একটা ফ্ল্যাট বাড়ি আছে। তারই দোতলায় ছোট ফ্ল্যাট একটা খালি পড়ে আছে। সেটা আপনি অনায়াসে ব্যবহার করতে পারেন। মিছিমিছি কী হবে হস্টেলে খরচা করে?'

এত দিন এই কি চেয়ে আসেনি তামসী? নিজের ঘর, নিজের টাকা, নিজের সাজগোজ। সব মিলিয়ে নিজের স্বাধীনতা। তার কি ইচ্ছে ছিল না ভালো শাড়ি পরবার, গয়না পরবার, স্পষ্টভাবে প্রস্ফুটিত হবার? তার কি লোভ ছিলনা ভালো খাওয়ার, আরাম-কোমল বিস্তারিত বিশ্রামের? তার অর্থের স্বাধীনতার অর্থ কি এই ছিলনা তার মনে, যে, তার উপরে এক মনিব থাকবে যার কর্তৃত্বে সে হবে চালিত? সে কি কোনো মনিবহীন চাকরি ভাবতে পেরেছিল? মনিব যদি তার কাজের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, বেশবাসেরই বা পারবে না কেন? বিশেষ-বিশেষ চাকরিতে বিশেষ-বিশেষ পোশাক থাকে, বিশেষ-বিশেষ থাকবার জায়গা—তেমনি করে ভেবে নিলেই তো চলে যায় স্বচ্ছন্দে। সমস্ত কিছুই তো চাকরির প্রয়োজনে। জীবনের প্রয়োজনে। হ্যাঁ, তেমনি করেই তামসী ভাববে।

তবু কুণ্ঠিতের মত জিগগেস করলে তামসী: 'কত ভাড়া আপনার সেই ফ্ল্যাট? যদি বেশি হয়—'

'সে জন্য আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। যত শিগগির হয় আপনি চলে আসুন। আমার লোক গিয়ে ফার্নিশড করে দিয়ে

আসবে। একটা মানী ফার্মে কাজ করছেন, চালটা একটু উঁচু রাখতে হবে বৈকি। ফার্মের নামের খাতিরেই আপনাকে একটু ব্যস্ত হতে হবে। আর কোনো কারণে নয়।'

পরিপূর্ণ প্রসন্নতায় তামসী চোখ মেলে রইল। তার আপত্তি নেই। সে ভয়শূন্য।

'যান, কাজ করুন গিয়ে।' অশ্রুতপূর্ব পরুষকণ্ঠে জ্ঞানাঞ্জন হঠাৎ ঘোষিত হলেন। ভুললে চলবে না তিনি প্রভু, তিনি শাসক।

কত দিন পর, তামসী উঠছে আপিসের সিঁড়ি দিয়ে, শুনল একজন কর্মচারী আরেকজন কর্মচারীকে বলছে, 'ঐ আসছেন।'

'কে ?'

'মিস পাবলিসিটি।'

চোদ্দ

নিন্দা আর স্তব—সব বাক্যের বুদ্বুদ। নিন্দার আসল মানে হচ্ছে ঈর্ষা, অক্ষমতা। আর স্তবের আসল মানে হচ্ছে সুদূর স্বার্থের অভিসন্ধি। ও সব গায়ে লাগে না তামসীর। আসল হচ্ছে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, আর সেই স্বাধীনতাকে সতেজ রাখবার জন্যে অর্থের পর্যাপ্তি। একার পক্ষে সেই পর্যাপ্তি কি ঘটেনি তামসীর? পর্যাপ্তিরও অধিক ঘটেছে। যা মাইনে জুটেছে তার চেয়ে উপরি জুটেছে বেশি। জুটেছে চিত্রবিচিত্র শাড়ি, নানা ছন্দের জামা, নানা ধ্বনির জুতো। জুটেছে গয়না। গলায় আর হাতে আর কানে। (ডান হাতের অনামিকার জন্যে জ্ঞানাঞ্জন একটা আংটি আনিয়েছিলেন, সেইটেই শুধু সে ফিরিয়ে দিয়েছে। পরে মনে হয়েছে, একটা বোকা ভূত হঠাৎ কাঁধে চেপেছিল তার। যদি বিশ্রীই লাগত, আংটিটা অনায়াসেই রেখে দিতে পারত বাক্সে। ঝকঝকে দাম ছিল ওটার।) জুটেছে ঘর, ঘরের নিভৃতি। ঘরের দুর্ভেদ্যতা। কী যায়-আসে 'ছাত্রীছত্রে'র মেয়েরা তাকে কী ভাবে। কী যায়-আসে লজ্জাবতী কী রাষ্ট্র করে বেড়ান। কী যায় আসে যদি আপিসের লোকেরা তাকে বিজ্ঞাপনের পোস্টার বলে, বলে বা বইয়ের জ্যাকেট। কলরব সংসারে সব শুধু বাক্যের বুদ্বুদ।

'ছাত্রীছত্র' ছেড়ে চলে এসেছে সে রসা রোডের ফ্ল্যাটে। দোতলায় তিনখানা ঘর। বসবার, শোবার, খাবার-রাঁধবার। প্রত্যেকটি ঘরে

পরিমিত ও পরিচ্ছন্ন আসবাব : চেয়ার টেবিল, বুক-কেস আর আলনা, খাট আর ড্রেসিং-টেবিল। (খাটটা দেখে প্রথমে হাসি পেয়েছিল তামসীর। খাটটা বেজায় বড়, দু জনের মত।) কিছু বাসন-কোসন, কটা বাক্স, কখানা বই। প্রসাধনের টুকিটাকি। দরজা-জানলায় মোটা রঙিন পর্দা। দিন-রাত্রের ঝি। ফরমাজখাটার চাকর। আর, নিচে টুল পেতে বসে থাকা সরকারী দারোয়ান। তামসী আর কী চায়! যখন সে ফোয়ারার জলে বাথরুমে স্নান করে, যখন সে সাজগোজ করে, শাড়ির ঘূর্নিটা ঠিক করে ঘুরে-ঘুরে, যখন সে টেবিলের উপর খাবার সাজিয়ে কাঁচের প্লেটে করে খায় যখন সে ঢালা বিছানায় বিশ্রামে গা ডুবিয়ে শুয়ে পড়ে, জানলায় দুই গরাদের মধ্যে দিয়ে সুদূর অথচ পরিমিত আকাশাংশের দিকে চেয়ে থাকে, তখন মনে-মনে প্রশ্ন করে সে নিজেকে, সত্যি, আর তার কী চাই। এই সুখ এই শ্রী এই স্বাধীনতা। এর বেশি কী আর চাইবার আছে সংসারে! দেশ যখন একদিন সুদিন ফিরে পাবে তখন এর চেয়ে বেশি কী সৌভাগ্য সে অর্জন করবে! এই আরাম এই স্বাচ্ছন্দ্য এই উচ্ছলতা।

মাঝে-মাঝে বড় একা-একা লাগে, তাই না? একটা নিঃশেষনিবিড় স্পর্শের জন্যে মাঝে-মাঝে তার রাত্রের শরীর শীতার্দ্র হয়ে ওঠে, শুধু এইটুকু না তার অনটন?

আপিসে কাজ করছে তামসী, হঠাৎ একটি যুবক জ্ঞানাঞ্জনের ঘরে ঢুকল। চলাটা ত্বরান্বিত, স্বরে উত্তেজনা। পাশের ঘর থেকে সব তামসী শুনতে পাচ্ছে।

'আমি নিজে গিয়েছিলুম খোঁজ করতে। দেওকিরামের সত্যি-সত্যি অসুখ।'

'কী হয়েছে?' এটা জ্ঞানাঞ্জনের গলা। প্রভুত্বগম্ভীর।

'বসন্ত।'

'কোথায়? বাড়িতে না হাঁসপাতালে?'

'এ কদিন বাড়িতেই ছিল, আমি গিয়ে পাঠিয়ে দিলুম হাঁসপাতাল।'

'ভাল করেছ।'

'কিন্তু করার আরো বাকি আছে। সেটুকু আপনাকে করতে হবে।'

জ্ঞানাঞ্জন অবাক হলেন এক মুহূর্ত।

'ওর জন্যে কিছু টাকা আগাম দিতে হবে আপনাকে। ওর জন্যে মানে ওর স্ত্রী আর ছেলে-মেয়ের জন্যে। আমি ক্যাশিয়ারের কাছে গিয়েছিলুম। কিন্তু সে বললে, হবে না। কিন্তু আপনি যদি বলেন—'

'ক্যাশিয়ার ঠিকই বলেছে।'

'ঠিকই বলেছে? এটা কখনো ঠিক হতে পারে? এতদিন ধরে যে কাজ করছে তার তবিলে কিছু ছুটি জমেনি?'

'কুলি-মজুরের আবার ছুটি! না, ছুটি নেই। যতদিন কাজ ততদিন মজুরি। কাজও নেই, মজুরিও নেই।'

'অসুখ হলেও?

'হ্যাঁ, মৃত্যু হলেও। মানুষ মরে, কিন্তু মেশিন মরেনা।'

যুবক বোধহয় এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল। পরে বললে, 'বেশ, ছুটি নেই, না থাক, ভাঙা মাসের এ কটা দিনের মাইনে তো সে পেতে পারে।'

'পাবে, যদি সে কাজে ইস্তফা দেয় এক্ষুনি। নইলে মাসকাবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।'

'এমন ঘোরতর অসুখে কারু উপকার করতে গিয়ে এটুকু নিয়মও কি ভাঙা চলবে না?'

'সমরেশ!' জ্ঞানাঞ্জন রূঢ় হয়ে উঠলেন: 'নিজের কাজ করোগে যাও।'

'নিজের কাজে মন বসছেনা, স্যর। নিজের চোখে ওদের ঐ অবস্থা দেখে আসার পর থেকে কেবলই মনে হচ্ছে আমরা শুধু নিজের জন্যেই নই। নিজের সুখসমৃদ্ধি হলেই আমাদের সব হল না। অন্যে যদি অনেক নিচের পাঁকের মধ্যে পড়ে থাকে, কুৎসিত দারিদ্র্যের মধ্যে—'

'চুপ করো।' সরাসরি ধমকে উঠলেন জ্ঞানাঞ্জন: 'এটা বক্তৃতার জায়গা নয়।'

'মাপ করবেন, স্যর। কিন্তু আপনার কাছ থেকে কিছু ভিক্ষে ওরা পাবে না এ আমি চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারব না। ওদের অবস্থা ভাল হোক, ওরা পাক কিছু আরাম আর বিশ্রাম এ তো আপনারও ইচ্ছা। ওদের জীবনে সুখের যে মূল্য আছে তা তো আপনিও স্বীকার করেন। তবে ওদেরকে কটা টাকা পাইয়ে দেয়া এমন কী অসম্ভব হবে! কত লোককে আগাম টাকা তো আপনি দিয়ে থাকেন, যোগ্যতার অতিরিক্ত অনেকে এখানে উপার্জন করে থাকে, তবে এদের বেলায় এটুকু অপচয় কেন হতে পারবে না? আমাদের কয়েকটি রঙিন মুহূর্তের জন্যে ওদের সমস্ত জীবনটাই কি অপচয় নয়?'

'থামবে কি না বলো?' জ্ঞানাঞ্জন গর্জে উঠলেন।

যুবক আবার চুপ করল।

'তোমার মাকে গিয়ে বোলো একদিন তাঁর কষ্ট দেখে তাঁর ছেলেকে চাকরি দিয়েছিলুম কি না—'

'তেমনি দেওকিরামের স্ত্রীকে দেখে তার ছেলেমেয়েগুলোর যদি কিছু ব্যবস্থা করে দেন—'

'গেট আউট।' জ্ঞানাঞ্জনের বজ্রমুষ্টি টেবিলের উপর সবলে নিক্ষিপ্ত হল।

জ্ঞানাঞ্জন আপিসে বেশিক্ষণ থাকেন না। বড় জোর দু ঘণ্টা।

তারপব চলে যান অন্যত্র, অন্য আপিসে। অন্যতর অধ্যক্ষতায়। তিনি চলে গেলে বেয়ারাকে ডেকে তামসী সমরেশের কাছে একটা চিরকুট পাঠাল। 'আমার সঙ্গে আপনার একবার দেখা হতে পারে?'

অনেকক্ষণ পর্যন্ত সমরেশ এল না। এল, যখন আপিস ভেঙে যাচ্ছে। এসেই চলে যাবে এমনি একটা তাড়া নিয়ে সে ঘরে ঢুকল। ঢুকেই ইংরিজিতে অভিনন্দন করলে তামসীকে।

'নমস্কার। আমি কিন্তু আপনাকে বাঙলাতে চিঠি লিখেছিলুম।' তামসী স্বচ্ছ মনে হাসল। বললে, 'বসুন।'

'আমার বসবার সময় নেই।'

'তবে চলুন বাড়ি ফেরাব মুখে পথে হাঁটতে-হাঁটতে কথাটা আপনাকে বলি।'

'আমি এখন হাঁটবনা, ট্র্যাম নেব। দরকার বুঝলে ট্যাক্সিও নিতে পাবি। যা বলবার চট করে বলে ফেলুন।'

তামসী শান্তমুখে বললে, 'দেওকিরামের বাড়ির ঠিকানাটা আমাকে দিতে পারেন?

'কেন?' সমরেশ ভুরু কুঁচকোলো।

'আমি যেতুম একবার সেখানে।'

'কী সর্বনাশ! এমনি ওখানে একজনের দয়া হয়েছে, আপনি আবার দয়া করবেন না।'

ঘৃণার ঝাঁজটা স্পষ্ট গায়ে লাগল তামসীর। বললে, 'কেন, দরিদ্রের বন্ধু হবার বিলাসিতাটা কি আমরা একটু উপভোগ করতে পারি না?'

'এত করছেন, এটুকু নাই বা করলেন। এত শোভা-সজ্জা নিয়ে গিয়ে ওখানকার নোংরা আর আবর্জনাকে উপহাস করবেন না।'

তামসী কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। পরে বললে, 'থাক, নাই বা

গেলুম। কথাটা তা নয়। কথাটা হচ্ছে, আমি দেওকিরামের পরিবারকে কিছু অর্থসাহায্য করতে চাই। আপনার হাতে দিলে আপনি সেটা ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়ে আসতে পারবেন?'

ভেবেছিল এবার একটু নরম হবে সমরেশ। কিন্তু সে খড়ের আগুনের মত জ্বলে উঠল: 'আপনি তাদেরকে সাহায্য করবার কে?'

'কাউকে বাঁচানোর মধ্যেও জাতবিচার আছে নাকি?'

'আছে বৈকি। যেখানে রয়েছে একটা নীতির প্রশ্ন। এ তো আর জলে ডোবা নয় যে যেই হোক টেনে তুলবে। নইলে, মনে করেন আমরা আপিসের পাঁচ জনে মিলে দেওকিরামের একটা সংসার চালাতে পারি না? কথাটা তা নয়। কথা হচ্ছে যিনি মালিক তাঁর থেকে এই অনুগ্রহ দাবির জোরে আদায় করতে হবে।'

'সেই জোর যাতে আসতে পারে তার জন্যেই বা একটা তবিল খোলা মন্দ কি। দেওকিরামের মত তো আরো অনেকেই বিপন্ন হতে পারে ভবিষ্যতে।'

'ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যৎ ভাববে। এখন সমূহ দেওকিরামের দাবির পূরণ হওয়া দরকার। এতই যদি আপনার ব্যথা, তবে আপনার বস-এর থেকে ওর অসুখের জন্যে ছুটি আর ছুটির বাবদ পুরো মাইনে এই অধিকারটুকু আদায় করে দিন না। দেখিয়ে দিননা আপনার জাদুবিদ্যা। সুবিধে আদায়ের ফন্দি।' একটা মলিন কটাক্ষ করে সমরেশ বেরিয়ে গেল।

আমরা শুধু নিজের জন্যেই নই, নিজের সুখসমৃদ্ধি হলেই আমাদের সব হল না। কথাটা পথহারা ভ্রমরের গুঞ্জনের মত তামসীর মনের মধ্যে ঘুরতে-ফিরতে লাগল। তিন ঘরের পুঞ্জীভূত আরাম-উপকরণের দিকে চেয়ে সে অলক্ষিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলল—এই কি তার সুখসমৃদ্ধির চেহারা?

উপকরণের সমতা থেকেই কি উপভোগের সমতা আসে? কিছু খাদ্য, কিছু শান্তি, কিছু ভয়হীনতা, এই থেকেই কি মানুষ স্বর্গরচনা করতে পারে না? কিন্তু কোথায় রুচি, কোথায় নিশ্চিন্ততা, কোথায় সাহস-উজ্জল বিজয়ী জীবন! তার বদলে এত বস্তু, এত ভার, এত শূন্যতা! এত জায়গা নিয়েছে, তবু এত সঙ্গস্পর্শহীন!

জ্ঞানাঞ্জন দুয়েকদিন দোরগোড়া পর্যন্ত এসেছিলেন, আজ বিকেলে একেবারে বাইরের ঘরে উঠে এসেছেন।

তামসী আপ্যায়িত হবার ভঙ্গি করে বললে, 'আসুন।'

মাথার টুপিটা হাতে নিয়ে জ্ঞানাঞ্জন এগিয়ে দিলেন তামসীর দিকে। যেন গৃহস্বামী বাড়ি ফিরে এসেছেন, এবার রাজবেশ ছেড়ে গৃহীবেশ ধরবেন এমনি একটা অভ্যাস বা অন্তরঙ্গতার সংকেত। তামসী হাত বাড়িয়ে টুপিটা অনায়াসে গ্রহণ করল। রেখে দিল ব্র্যাকেটে ঝুলিয়ে।

একটা গদি আঁটা চেয়ারে বসলেন জ্ঞানাঞ্জন। রুমালে ঘাড়ের ঘাম মুছতে-মুছতে বললেন, 'এ কি, আপনার ঘরে ফ্যান দেয়নি? শোবার ঘরেও নয়? মাই গুডনেস।' তারপর একটু থেমে: 'উফ্, এবার আপনার বিজ্ঞাপনের বয়ানটা কী চমৎকার হয়েছে! সুপার্বলি সুইট। কেমন করে এমন সুন্দর যে আপনি লেখেন—'

তামসী বুঝল এবার নির্ঘাৎ তার পাখা হবে। ভাল কাজ করবার জন্যেই যে মাইনে এ নিয়ম যেন উঠে গেছে তার বেলায়। সে যেন মাইনে পায় ন্যূনতম খারাপ কাজ করবার জন্যে। যদি কালে-ভাদ্রে কাজটা ভাল হয়ে ওঠে তার জন্যে আলাদা বকশিসের ব্যবস্থা। আর তামসীর এমন সৌভাগ্য যে তার সব কাজই ভাল। পানের থেকে চুন যদিও খসে তাতেও পানের স্বাদ বাড়ে, মুখ পোড়ার থেকে রেহাই পাওয়া যায়। আপনার হাতের লেখাটি কী সুন্দর, আঙুল থেকে যেন

মুক্তো খসে পড়ছে, ঠিক আপনার হাসিটির মত। সেদিন তামসীর জন্যে একটা কাঁচের পাল্লাওয়ালা বিরাট আলমারি এসেছিল।

'এক পেয়ালা চা খাব।' জ্ঞানাঞ্জন একটু বা আখুটে গলায় বললেন।

তামসী বিনীত ভঙ্গিতে কাছে বসে চা করতে লাগল।

'অধিপ আর এসেছিল ?'

'না।'

'উনি কেঁচো খুঁড়তে গিয়েছিলেন, বেরিয়ে এল জাতসাপের বাচ্চা।' জ্ঞানাঞ্জন নিজের খেয়ালে হাসতে লাগলেন।

তামসীও হাসল, একটু ম্লান হাসি। যেন জাতসাপের বাচ্চাই কেঁচো হয়েছে।

'ওকে একদম ঠাণ্ডা করে দিতে হবে। যদি কোনোদিন আসে এখানে, একবারটি খবর দেবেন, ক্রিমিন্যাল ট্রেসপাসের মামলা বসাব।' মনের বিষাক্ত অভিসন্ধিটা অলক্ষ্যে প্রকাশ করে ফেললেন জ্ঞানাঞ্জন। তামসীও যা, একা ঘরে তাঁর স্বগতোক্তিও তা।

তামসী নিচু হয়ে পেয়ালায় চামচ নাড়তে লাগল।

'আর একজন সমরেশ। কুলোপানা চক্র দেখাচ্ছেন। লাঠির ঘায়ে থেঁতো করে দেব মাটির সঙ্গে।' তামসীর হাতের থেকে চায়ের কাপটা তুলে নিলেন জ্ঞানাঞ্জন। বললেন, 'ওর সঙ্গে তো আপনার আলাপ নেই।'

'না।'

'ঘুরঘুর করছে ছোকরা। একদিন না একদিন খাতির জমাতে চাইবে। আমাকে শুধু একটু জানিয়ে দেবেন আভাসে, মুঠোর মধ্যে ফেলে পিষে গুঁড়ো করে ফেলব।'

তামসী ভাবল সে যেন ইঁদুর মারবার জাঁতিকল।

না, আলাপটা এবার একটু অন্তরঙ্গ করা যাক। কোথাও একটু গান বা বাজনা থাকলে মন্দ হতনা।

'আপনার রেডিয়ো আসেনি দেখছি।'

সর্বনাশ! তামসীর মনে হল তিন চার চুমুক দেবার পর জ্ঞানাঞ্জন এবার তার চায়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করবেন। তামসী তার জন্যে অপেক্ষা করে রইল।

'এই চা কোত্থেকে কিনেছেন বলুন তো? ফার্স্ট ক্লাশ। আসল জিনিস চায়ে নয় চা কবার কৃতিত্বে। সত্যি, এমন চমৎকার চা খাইনি টি-পার্টিতেও।'

তামসী হাসি গোপন করার হাসি হাসল। বললে, 'রেডিয়ো আমার দরকার নেই। ঘরে এত জিনিস জমে উঠেছে যে শেষকালে জিনিসকে জায়গা করে দিতে গিয়ে আমাকেই চলে আসতে হবে বাইরে।'

জ্ঞানাঞ্জন এতে হাসির কী পেলেন, সশব্দে হেসে উঠলেন: 'বা বেশ, খাসা বলেছেন, শেষকালে জিনিস এসে মানুষ তাড়ালে, ঘাড় চেপে ধরে মানুষকে খুন করলে জিনিস। মার্ভেলাস বলেছেন। বর্তমান সভ্যতায় সব দেশের এটা শেখবার জিনিস।'

এই আশ্চর্য উক্তির জন্যে আবার না জানি কোন জিনিস জুটে যায় তামসীর ভাগ্যে!

'কিন্তু আসল জিনিসই তো আপনার এখনো হয়নি।'

সেটা কী? বড়-বড় চোখ মেলে তামসী চেয়ে রইল।

'একটি সঙ্গী। স্বামী।' জ্ঞানাঞ্জন বিদগ্ধজনের মত হাসতে লাগলেন।

গেট আউট। সেই বজ্রবিদারণ শব্দটা তামসীর কানের মধ্যে বেজে

উঠল একবার। আশ্চর্য, তার গলায় স্বর নেই। ভঙ্গিতে প্রখরতা নেই। সে আফিং-খাওয়া সার্কাসের বাঘ হয়ে গিয়েছে।

মুখ মুছতে-মুছতে জ্ঞানাঞ্জন উঠে দাঁড়ালেন। পর্দার ফাঁক দিয়ে ভিতরের ঘরের দিকে লক্ষ্য রেখে বললেন, 'আপনার ঘরটিতে যেন ফুলের গন্ধ, ওষুধের গন্ধ নয়।'

তামসীর মনে হল পুঞ্জপুঞ্জ বস্তুভার কি সমস্তই নিষ্প্রাণ? ব্র্যাকেট থেকে নামিয়ে টুপিটা সে তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিল জ্ঞানাঞ্জনের হাতে। বললে, 'হ্যাঁ, আসবার সময় মার্কেট থেকে কিছু ফুল কিনে এনেছি।'

পনেরো

রণধীর বেরুল জেল থেকে।

কলকাতা।

নামহীন জনতার মধ্যে নিজেকে কেমন যেন তার নিরাশ্রয় মনে হতে লাগল। নিতান্ত দলছাড়া, সহায়-সম্বলহীন। ভেবে পেল না, কি করে, কোথায় যায়। দেশের বাড়ির কথা মনে করতে গেল, কিন্তু কোনোই আকর্ষণ অনুভব করল না। আগাছা-জঙ্গলে চারদিক বোঝাই হয়ে দোর আগলে বসে আছে, আর তার মাঝে ভগ্নপ্রায় বাড়িতে তার বড়দা নানারকম ভূতের সঙ্গে লড়াই করছেন: রোগের ভূত, অভাবের ভূত, অজন্মার ভূত। তবু নড়বেন না ভিটে ছেড়ে, জঙ্গলের মাঝে জমির স্বপ্ন দেখবেন। শুধু ফুঁ দিয়েই তৈলহীন প্রদীপে শিখাসঞ্চার করবেন এই সাধনায়ই তার শ্বাস ক্ষয় হয়ে গেল। সেখানে বনবে না রণধীরের। আর-আর দাদারা যার-যার কর্মস্থলে, নিজের-নিজের স্বার্থের কেন্দ্রে ক্ষুদ্রীকৃত। সেখানে রণধীরের জায়গা হবে না। এখানেই, এই বিশাল-বিস্তীর্ণ কলকাতাতেই কোথাও একটু তাকে স্থান করে নিতে হবে। একটু মাথা গোঁজবার ঠাঁই। জোগাড় করে নিতে হবে একটা চাকরি। মুখে গোঁজবার কিছু খাদ্য।

চারদিকে ফাঁকা আকাশ, অফুরন্ত হাওয়া, পায়ের নিচে উন্মুক্ত রাস্তা, তবু এতটুকু উত্তেজনা নেই রণধীরের। বরং যেন চলেছে নির্জীবের

মত, নিরুদ্দেশের মত। তার মনে হচ্ছিল জেল থেকে বেরিয়েই পরিচিত কাউকে সে দেখতে পাবে। এগিয়ে এসে হাত ধরবে তার। হাসিমুখে বলবে, চল আমাদের বাড়িতে: হয়ত বেশি দূরে তাদের বাড়ি নয়। সেখানে গেলে প্রথমেই তাকে খেতে দেবে। গল্পটল্প পরে হবে, আগে কিছু খেতে দাও শিগগির। রণধীর হাসতে চেষ্টা করল, পারল না। খাবার পর তাকে শুতে জায়গা দেবে একফালি। বেশিদিন সেখানে সে থাকতে চায় না। তাকে থাকতেই বা দেবে কেন বেশিদিন? শুধু আজকের দিনটা। আজকের দিনের পর কালকে কী হবে কে তার হিসাব করবে। আজকের দিনটা তো আগে কাটুক।

এখনো যে সে পথ হাঁটছে কেবলই মনে হচ্ছে এই বুঝি কারু সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। এই বুঝি তার নাম ধরে কেউ ডেকে ওঠে। কার সঙ্গে দেখা হবে? কে ডেকে উঠবে তার নাম ধরে? বা, কত তার বন্ধু ছিল, কত আলাপিত-পরিচিত, কত বা অন্তত মুখ-চেনা। এমন কারু সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যেতে পারে না? কেউ ছিটকে এসে পড়তে পারে না তার চোখের সামনে? যার থেকে সামান্য কয়েক আনা পয়সা সে অন্তত ধার চাইতে পারে। ধার না দিক, নিদেন একবেলা খাইয়ে দিতে পারে ডাল-ভাত।

তামসীর কথাও তার মনে হয়েছে, সে প্রায় একটা মুছে-যাওয়া ভাঙা-চোরা স্বপ্ন। কোথায় আছে, কেমন আছে তার ঠিক কি। চলে গেছে কোন অন্তঃপুরের গভীর অন্তরালে কে বলে দেবে। এইখানেই থাক বা অন্যখানেই থাক, কোথাও আজ আর কোনো পথ নেই। হয়তো হাঁড়ি ঠেলছে, মশলা পিষছে, আর কারু বিছানা করছে। ঠিকানা জানলেও তার দরজায় গিয়ে করাঘাত করবার আজ আর দিন

নেই। করাঘাত করলেও সেদিনের মত সে আর দরজা খুলে ধরবে না। তার আর নেই সেই স্বাধীনতা, নেই সেই দুঃসাহসের ঔজ্জ্বল্য।

পার্কে ঢুকে বসল একটা বেঞ্চিতে। রোদ চড়ছে। ধুলো বাড়ছে রাস্তায়। আপিসের মুখে চলেছে সব ঊর্ধ্বশ্বাস ট্র্যাম-বাস। যে যার জীবিকার জাঁতায় ঘুরছে। কতক্ষণে আপিসে পৌঁছুবে, কতক্ষণে ছুটি হবে, কত দিনে মাস কাবার হবে, কত বছরে মাইনে বাড়বে, সবাইর মুখে শুধু এই জিজ্ঞাসা। এর বাইরে আর কিছু জানবার নেই, আর কিছুর জন্যে কাঁদবার নেই। যেটুকু সংগ্রাম করবার তা শুধু উদরের জন্যে। পেট ভরলেই সব ক্ষুধা মিটে গেল। ঘুমুতে পারলেই কেটে গেল রাত্রি। সুন্দর সুখে আছে এরা। ভরা পেটে পান-মুখে মন্থর ঢুলুনির মত সুখ কোথায়। এমন নিশ্চিন্ত নিটোল একটি চাকরি যদি পেত রণধীর।

আবার সুরু করল হাঁটতে। কোথায় যাবে তার কোনো লক্ষ্য নেই। শুধু এলোমেলো হাঁটছে। মনের মধ্যে কেবলই ডাক দিচ্ছে, এই কারু সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। বলবে, এ কি, তুমি? এস, এস আমার ঘরে।

'ধারে-কাছে কোথাও মেস আছে বলতে পারেন?'

'মেস? দেখুন না ইদিক-ওদিক।'

এখন, দুপুরবেলা, মেস ঘুরে কিছু লাভ নেই। যে যার কাজে বেরিয়ে পড়েছে। বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। জামার পকেটে কিছু নেই রণধীর জানে, তবু আরেকবার পকেটে সে হাত ঢোকাল। এ-পকেটের পর ও-পকেট।

এবার আরেকটা পার্ক। এবার বসল সে ঘাসের উপর, ছায়া দেখে। কতক্ষণ পর শুয়ে পড়ল। দুপুরটুকু ঘুম দিয়ে মুছে দেবে ভাবল। কিন্তু

আসেনা ঘুম। মাত্র খিদের জন্যে কষ্ট পাচ্ছে এ কথা ভাবতে খিদের চেয়েও বেশি যন্ত্রণা। না, এমনি ইচ্ছে করেই উপোস করে আছে। খেতে হলে যে কোনো বাড়িতে বা রেস্টোরেণ্টে ঢুকে জোর করে খেয়ে আসতে পারে সে। ডাকাতি করেছে সে এক দিন। আজও ডাকাতি করে লুট করে নিয়ে আসতে পারে খাবার।

চোখে ঘুম এসে গেল। যখন জাগল তখন ঘরমুখো সব আপিসের ট্র্যাম-বাস। রণধীর চলল এবার মেসের সন্ধানে। এ-মেস থেকে ও-মেস।

'কাকে চান মশাই ?' ঘরে-ঘরে উঁকি মেরে বারান্দা দিয়ে চলে যাচ্ছে রণধীর, কে একজন জিগগেস করলে।

রণধীর উত্তর দিল না।

'কাকে খুঁজছেন ?' আরেকজন কে ফোঁস করে উঠল।

'বিশেষ কাউকে নয়।'

'তার মানে ?'

'তার মানে নাম জানিনা।'

'তবে জানলেন কি করে এই মেসেই আছেন ?'

'তাইতো ঘুরে-ঘুরে খুঁজে দেখছি আছেন কি না।'

জবাবটা কারুই মনঃপূত হল না। নিশ্চয়ই বদ মতলবে ঢুকেছে, দরজা খোলা পেলে কোনো জিনিস নিয়ে সটকান দেবে। চেহারাটার মধ্যেও ভদ্রতার লালিত্য নেই, চোর-ছ্যাচড়ের মত। না, মশাই, কেলেংকারি বাধাবেন না, মানে-মানে সরে পড়ুন। রণধীরকে তারা বার করে দিলে।

এবার একটা নাম ঠিক করে নিয়েছে রণধীর। এবার অন্য গলি। অন্য মেস।

'আচ্ছা, ব্রজেন চৌধুরী এই মেসে থাকেন ?'

'কে ব্রজেন চৌধুরী ?'

জায়গার একটা নাম বললে রণধীর। কী করে? নাম বললে একটা আপিসের। দেখুন এগিয়ে। আচ্ছা, মশাই, সুনীল সরকার এই মেসে ছিল না? সে কি উঠে গেছে? কে সুনীল সরকার? বেলডাঙার। করে কী? টমাস ফিলিপে কাজ করে। পাশের ঘরে গিয়ে জিগগেস করুন দিকি। আচ্ছা মশাই, সুধাংশু ভটচাজ বলে এখানে কেউ থাকত ?

এমনি আরেকটা মেস। আরো একটা মেস।

ক্রমশ রাত বাড়ছে। এর পর সদর দরজা বন্ধ হয়ে যাবে আস্তে-আস্তে। এবার যে-মেসে সে ঢুকবে সেখানে সরাসরি চাট্টি সে খেতে চাইবে। নিভৃতে কারু কাছে সব কথা খুলে বলতে পারলে হয়তো সহজেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে। হয়তো একেবারে রাস্তার ভিক্ষুক বলে ভাববেনা। ভিক্ষুকের খাওয়ার দিকে যেমন চেয়ে থাকে তেমনি করে চেয়ে থাকবেনা কেউ। বরং তাকে খাইয়ে ভাববে, দেশের কাজ করছি। এ কি সত্যিই অসম্ভব ?

অসম্ভব শুধু মুখ ফুটে বলা, আমাকে চাট্টি খেতে দিন।

না, সে বলবে। মুখের লজ্জাকে সে বিসর্জন দেবে। না, এ আর এমন কি কঠিন কথা!

এই শেষ মেস। সদরের ধার থেকেই সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে। নিচেটা অন্ধকার-মতন, একজন ভদ্রলোক গুটি-গুটি পায়ে ঢুকছেন কুঁজো হয়ে। রণধীর তাঁকে ডাকল পিছন থেকে। বললে, 'আমার একটা কথা শুনবেন ?'

'কে ?' ভদ্রলোক থমকে দাঁড়ালেন।

'আপনাদের এখা ন আমি চাট্টি খেতে পাব ?'

'তা আমাকে জিগগেস করছেন কেন ? ভেতরে ম্যানেজার আছে তাকে গিয়ে জিগগেস করুন না।' ভদ্রলোক খেঁকিয়ে উঠলেন।

'গেস্ট-চার্জ কত একবেলার ?'

'সে-সব ফর্দ-ফিরিস্তি কি আমার মুখস্ত নাকি ?' ভদ্রলোক মুখ ঝামটে উঠলেন। গজগজ করতে-করতে উঠে গেলেন সিঁড়ি দিয়ে।

শ্রান্তিতে পা টানতে-টানতে রণধীর আরেকটা পার্কে গিয়ে ঢুকল। রাস্তার শব্দ কমে আসছে, বাড়ির আলো নিবে যাচ্ছে একেক করে। বন্ধ হয়ে গেছে দোকানপাট। বার্তাহীন চোখের মত তাকিয়ে আছে রাস্তার গ্যাসগুলো। রণধীর একটা বেঞ্চিতে বসল। বেশিক্ষণ বসতে পারল না, শুয়ে পড়ল। শুয়ে-শুয়ে তারা দেখতে লাগল। জেলে থাকতে এক চিলতে আকাশ বা এক ফোঁটা একটা তারা দেখতে পেলে কত ভাল লাগত। আজ এত বড আকাশে এত খুদি-খুদি তারাব অক্ষরে এতটুকু সাান্তনার কথা লেখা নেই। আশ্বাসভরা চোখের ক্ষণিক একটি চাউনিও কোথাও জ্বলছেনা। ভাবতে চেষ্টা করল রণবীর, কী সে অপবাধ করেছে যার জন্যে আজ সমস্ত দিন আর সমস্ত রাত সে অভুক্ত থাকবে! এ কী অন্যায় এই সংসারের।

সামনের বেঞ্চিতে একটা মাতাল এসে বসেছে। মাতলামো করছে। টলে-টলে পডছে। নিতান্ত কাঠেব বেঞ্চিটাকে ভাবছে কোমলাঙ্গী অভিমানিনী বলে। সুমধুর ভুলের মধ্যে ডুবে আছে। এখুনি ঘুমিয়ে পড়বে একখানে। স্থূল খাদ্য না পেয়ে তরল যদি সে এমনি পানীয় পেত, বেঁচে যেত রণধীর। অন্তত ভাবতে পারত, সে কোনোই অপরাধ করেনি যার জন্যে সে অভুক্ত থাকবে।

একটু তন্দ্রা এসেছিল বোধহয়। গায়ে কার হাত ঠেকল। যা ভয়

করেছিল, পাহারওলা নিশ্চয়ই। হয়ত তাড়িয়ে নিয়ে যাবে থানায়। পুলিশ-হাজতে রেখে দেবে সারা রাত। এই খোলা আকাশটুকু থেকেও বঞ্চিত করবে। না, পাহারওলা নয়, বাগানের মালী। গেট বন্ধ করে দেবে এখন। কাঠ ছেড়ে নেমে আসতে হবে পাথরে। পার্ক ছেড়ে ফুটপাতে।

সারে-সারে লোক শুয়ে আছে রাস্তায়। মুটে, মজুর, ভিখিরি। গৃহহীন বেকার। জেলফেরৎ আসামী। চোর আর পকেটমার। সমাজের যত তলানি—যাদেরকে সে আশ্রয় দেয়নি, মর্যাদা দেয়নি। যত সব ফৌতফেরার, গরলায়েকের দল। তাদেরই এক পাশে শুয়ে পড়ল রণধীর। নামহীনদের খাতায় সে নাম লেখাল।

কলকাতার সেই আশ্চর্য নীল ভোর হচ্ছে। আলো জ্বেলে ডিপো থেকে বেরিয়েছে প্রথম ট্র্যাম। রাস্তায় জল দিচ্ছে। পর-পর নিবে যাচ্ছে গ্যাস। কোন ঘুম-ভাঙা বাড়ির থেকে ভেসে আসছে শিশুর কান্না। এখুনি সূর্য উঠবে, কমলা রঙের সূর্য, কুয়াশার ভিতর দিয়ে। তারপর কুয়াশা সরে যেতেই ঝলমল করে উঠবে কাঁচ আর পিচ, পালিশ আর পলস্তরা। আরেকটি দিনের আরম্ভ হবে। এই দিনটিও কি এমনি ব্যর্থ প্রতীক্ষায় কাটিয়ে দেবে নাকি ?

না, সটান সে ও-বাড়িটার মধ্যে ঢুকে পড়বে। যা থাকে অদৃষ্টে। বাইরের ঘরে ঘরের কর্তা একা বসে।

'কি চাই ?'

'দেখুন, একটা কথা—আপনার এখানে কি—আজ দু'দিন ধরে আমি—সত্যি যদি শোনেন—' টেবিলের ধারটা আঁকড়ে ধরল রণধীর। তার গলার কাঁদুনিটা সমস্ত গা বেয়ে চলে এসেছে।

'কি চান তাই বলুন না।'

কি বলতে কী বলে ফেলল রণধীর। বললে, 'আমাকে একটা চাকরি দিতে পারেন?' চাট্টি ভাত দিতে পারেন—তার চেয়ে এ অনেক সম্ভ্রান্ত আবেদন। চাকরি হবেনা এ প্রত্যাখ্যানের মধ্যে অপমান নেই। কিন্তু যদি বলে, খেতে দিতে পারবনা!

নিজের কথা শুনে নিজেরই হাসি পেল, ভদ্রলোক আর কী হাসবেন। বললেন, 'খাসা আছেন যা হোক। আপনাকে চাকরি দেবার জন্যেই পথের দিকে চেয়ে বসে আছি তা মোটেও ভাববেন না। বসে আছি একটা মুচির জন্যে। আর রাস্তা দিয়ে যত বাক্স-হাতে নাপিত যাচ্ছে। আপনি যখন মুচি চাবেন, পাবেন শুধু নাপিত, আর আপনার যখন নাপিতের দরকার তখন কানের কাছে শুনবেন শুধু জুতো-সেলাই। আর বাড়িতে যখন একটা চাকরের টানাটানি তখন রাস্তা থেকে ভদ্রলোক এসে বলবে, চাকরি দিন।'

না, ওরকম দ্বিধা-দুর্বলতার কোনো মানে হয় না। পষ্টাপষ্টি বলবে এবার রণধীর। আর এরা ওরকম বড়লোক নয়। গরিব-গরিব দেখতে বাড়িটা। অন্যের কষ্ট বোঝবার মত হৃদয়ের হয়তো গুণ আছে।

'দেখুন, আজ দু'দিন আমি অভুক্ত। আমাকে চাট্টি খেতে দিতে পারেন?'

'বলি আমরাই খেতে পাইনা, তাই আবার দানছত্র। জোয়ান মরদের মতো তো চেহারা, খেটে খেতে পারনা?'

'খেটেই খাচ্ছিলাম এত দিন। যদি খেতে না দেন তবে ফের খাটতেই হয়তো যেতে হবে।'

'সে আবার কি রকম খাটা।'

'জেলখাটা।'

ভদ্রলোক আঁতকে উঠলেন: 'তুমি জেল থেকে বেরিয়েছ নাকি?'

'আপনার ভয় নেই। স্বদেশী জেল।'

ভদ্রলোকের তাতেই বরং বেশি ভয়। তার চেয়ে সাধারণ চোর-ডাকাতও বেশি নিরাপদ ছিল। দুই হাত শূন্যে তুলে ভদ্রলোক প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন: 'রক্ষে করো বাবা। শেষকালে স্বদেশীর জন্যে আমার উপরে পুলিশের নজর পড়ুক। দোহাই বাবা, ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করছি, আমাকে আর নাকানি-চুবুনি খাইও না।'

তবু কিছুক্ষণ গড়িমসি করল রণধীর। সে কি এমনই অপাঙক্তেয়? তার থেকে কি দেশের কোনো ভালোই হতে পারত না? এই ভদ্রলোকের দুর্দশা মোচনের কোনো সম্ভাবনাই কি তার হাতে ছিল না? যেখানে যাবে সেখান থেকেই সে পর বলে দূর হয়ে যাবে এমনি?

না, এ ভাবে চলতে পারে না। ভিক্ষার ভঙ্গিটা মৃত্যুর ভঙ্গি। ক্লান্ত হয়ে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত মরতে হবে তাকে মুখ থুবড়ে। কিন্তু রণধীর মরতে প্রস্তুত নয়। সে বাঁচবে, যেমন করে হোক, বেঁচে থাকতে হবে তাকে। পায়ের নিচে যে পিঁপড়ে সে পর্যন্ত বাঁচতে চায়।

একটা রেস্টোর‍্যাণ্ট দেখা যাচ্ছে। খাচ্ছে অনেক কলেজের ছোকরা: রণধীরও ঢুকে পড়বে সেই ভিড়ের মধ্যে, বসবে একটা চেয়ার নিয়ে। ক্রমাগত অর্ডার দিয়ে-দিয়ে খাবে সে গলায়-গলায়। যখন দাম দেবার সময় আসবে তখন বলবে, নিরাবরণ নিঃসংকোচে বলবে, পয়সা নেই। কী হবে তার পর? অনায়াসেই ভাবতে পারছে রণধীর। দোকানের লোকেরা তাকে অপমান করবে, মারধোর করবে। করুক, তবু এই না খেয়ে মরার মত অপমান নয়। তারপর তাকে না হয় পুলিশে দেবে। অত দূর নাও হতে পারে। পুলিশে জিম্মা হবার আগে সে একটা বক্তৃতা দিতে পারে ছাত্রসমাজকে লক্ষ্য করে। তাতে কেউ বিচলিত

হয়ে তার ডিসের দামটা দিয়েও দিতে পারে হয়ত। একেবারে কোনোই বক্তৃতা না দিয়ে সে ধরা দেবে এ হতেই পারে না। উপবাস করে মরতে রাজি না হওয়ার বিষয়টাই তো যথেষ্ট তেজস্কর। বলতে আরম্ভ করলে আর থামবে নাকি রণধীর ?

সিঁড়িতে পা রেখেছে, কে একটি ছেলে মুখ মুছতে-মুছতে বেরিয়ে আসছে বাইরে। এক মুহূর্ত তাদের চোখাচোখি হল। ছেলেটিই প্রথমে উল্লসিত হয়ে উঠল, 'এ কি, রন্টুদা ?'

'আরে, তুমি, শচীন ?' রণধীর তাকে একেবারে রাস্তায় টেনে আনল।

'আপনি খেতে ঢুকছিলেন।' কুণ্ঠিতের মত শচীন বললে, 'চলুন, আমার যদিও হয়ে গেছে, আমি বসছি আপনার সঙ্গে। আরেক কাপ চা চলবে হয়তো কোনোরকমে।'

স্পষ্ট বোঝা গেল শচীনের কাছে আর বাড়তি পয়সা নেই। রণধীর তার কাঁধে হাত রেখে বললে, 'তোমাকেই খুঁজছিলুম শহরময়।'

ষোলো

শচীন বণধীরের গাঁয়েব ছেলে, বছর চার-পাঁচেক ছোট। সে তখন মোটে সেকেণ্ড ক্লাস থেকে ফার্স্ট ক্লাসে উঠেছে, তাকে দলে ভেড়াবার জন্যে চেষ্টা কবেছিল বণধীব। উজ্জ্বল চোখ, নিষ্পাপনির্মল মুখ, খাঁটি যজ্ঞাহুতিব মত মনে হযেছিল সবাইকাব। শচীন নিজেও খু ঝুঁকেছিল পথচিহ্নহীন তিমিবনিবিড অবণ্যেব আমন্ত্রণে। শুধু তার মা-ই তাঁর আঁচলেব গিঁটটা শিথিল হতে দেননি। শাসনে না পেরেছেন, পেরেছেন অশ্রুজলে। আব সেই কারণেই নিজেব জীবনটাকে তখন শচীনের অত্যন্ত ছোট, অত্যন্ত লজ্জাব বলে মনে হত। আব সবাই দুর্বারণ দুঃসাহসেব মাঝে ঝাপিযে পডল, আব সে বইল মাব আঁচলের আশ্রযে—এ কাপুরুষতা তাকে দগ্ধ কবতে লাগল তিলে-তিলে। আর সবাই দুঃখ ও দুর্যোগকে সঙ্গী কবল, আর সে একটি ভদ্র শান্ত সুরক্ষিত জীবনেব জন্যে সঞ্চযী পাখির মত খডকুটো সংগ্রহ কবছে—এই দৈন্য, এই গ্লানি তাকে নিজের কাছেই অপরিচ্ছন্ন কবে রেখেছে। মাকে দোষ দিযে লাভ নেই, তাঁকে না ভালোবেসে সে থাকতে পাববে না, তাব অযোগ্যতা তার অক্ষমতা তাব লজ্জার মধ্যেই লুকিয়ে ছিল। হোক সে অযোগ্য, হোক সে অক্ষম, কিন্তু যিনি উজ্জ্বল যিনি সার্থক যিনি ভযংকব তাঁকে সে অভিনন্দন কবতে পেছপা হবেনা। সে যুদ্ধ করছেনা বটে, কিন্তু সেবা তো করছে। যাব ডাক পডে না, যে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে, সেও তো সেবক।

তাই শচীন যখন শুনল, সন্থ জেল থেকে বেরিয়েছে রণধীর, জেল থেকে বেরিয়ে তার আহার নেই আশ্রয় নেই, তখন সে একেবারে বুক দিয়ে পড়ল। রণধীরকে নিয়ে গেল তার মেসে, খেতে দিল, শুতে দিল তার বিছানায়। নিজে চলে গেল ছাদে।

'বেশি দিন নয়।' রণধীর পরিতৃপ্ত মুখে বললে, 'কদিন একটু ঘুরলেই চাকরি মিলে যাবে আশা করি। যা হোক একটা চাকরি। তখন তোমাকে হালকা করে সরে পড়তে পারব।'

রন্টুদা চাকরি করবেন! কেনই বা করবেন না শুনি? তাঁকে খেয়ে-পরে বাঁচতে হবে তো, শরীরে রাখতে হবে তো শক্তি, প্রতি দিনের পীড়ন থেকে প্রসন্ন একটু অবকাশ তো নিতে হবে আহরণ করে। সে যে এম-এ পড়ছে, স্বচ্ছন্দ-সবুজ জীবিকার প্রলোভনেই তো। রন্টুদাই বা কেন তবে একটি পরিতৃপ্তিময় জীবনের কথা ভাববেন না?

বিনীত ভঙ্গি করতে করতে মেরুদণ্ড আগে থাকতেই বেঁকে যাচ্ছে, কিন্তু চাকরি কোথায়? সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত স্থানে-অস্থানে সম্ভব-অসম্ভব সমস্ত জায়গায় রণধীর যাচ্ছে, মিনতি করছে, প্রচ্ছন্ন ভয় দেখাচ্ছে পর্যন্ত, কিন্তু কিছুই ফল হচ্ছে না।

'আপনাদের এখানে লোক চান শুনেছি—'

'হ্যাঁ, চাই। বসুন।'

'কাজটা কী?'

'মফস্বলে গিয়ে খাজনা আদায় করা, মাল চালান দেয়া, চাষ-আবাদ দেখাশোনা করা। পারবেন?'

'খুব পারব।'

'মাইনে পঁয়ত্রিশ টাকা।'

মাইনের কথা কে ভাবছে! একটা শুধু আরম্ভের উদ্যোগ। তুলিকার মুখে প্রথম একটি রঙের পরীক্ষা।

'দাখিলা পিছু নজরানার রেট আছে একটা। ভালো আদায়-কবতে পারলে কমিশন দেবার ব্যবস্থা হবে।'

বণধীরেব বক্ত নেচে উঠল।

অনড ভঙ্গিতে ভদ্রলোক বললেন, 'কিন্তু আমানত চাই, পাঁচশো টাকাব আমানত।'

'আমানত দেব কোত্থেকে ?'

'তা হলে পথ দেখুন।'

'দেখুন, আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন।' হাত থেকে কাছি সরে যাচ্ছে এমনি দুর্বল মুখে রণধীব বললে, 'আমি দেশের জন্যে জেল খেটে এসেছি।'

'সেই আনন্দেই থাকুন। কিন্তু আমাদের পক্ষে সেইটেই ভাবনা।'

'না, না, ভাবনা নেই। আমি আর ও-পথ মাড়াবনা।'

'সে ভাবনা নয়। ভাবনা, একবার যখন জেলে গেছেন তখন আরো একবার যেতে হয়ত আটকাবে না আপনার। আমাদের ধান-চাল খাজনা-পাতি যদি মেরে দেন, তখন কি বলতে পারবেন যে ফেব দেশের জন্যেই জেল খাটতে যাচ্ছি ?'

দেশী ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির বিক্রয়-প্রতিনিধি চাই।

'পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে কিছু ?'

বণধীবের ফাঁপর করে উঠল। বললে, 'না। অভিজ্ঞতাটাই সব নয়। যে অভিজ্ঞতা নিয়ে আপনাদের এখানে আসবে সে নিশ্চয়ই আগেব কাজ ছেড়ে দিয়ে আসবে। আগের কাজ যখন সে ছেড়ে দিল বুঝতে হবে তার যোগ্যতাটা কিছুই নয়। অভিজ্ঞতার চেয়েও বড়

জিনিস আছে, তা হচ্ছে সাধুতা, শ্রমনিষ্ঠা, সফল হবার প্রতিজ্ঞা। দেখুন, আমি দেশের জন্যে জেল খেটে এসেছি, আপনারা যদি না আমাকে চান্স দেন—'

'দেশের জন্যে ?' ভদ্রলোক স্বচ্ছ হেসে উঠলেন : 'আমাদের বেশির ভাগ ওষুধই বিদেশী।'

'ল্যাবেলটা তো দিশি ছাপাখানায় ছেপেছেন ? তেমনি আমার এই জেল-খাটার ল্যাবেলটা যদি ব্যবহার করা যায়—'

'বেশি বাজে কথায় কাজ নেই। সেল্‌স্ গ্যারান্টি দিতে হবে। দস্তরমত কণ্ট্র্যাক্ট করে। ইনডেমনিটি ক্লজ থাকবে। রাজি আছেন ?'

নিরীহ আপিসের কর্মচারী। কে চেনে আপনাকে ? মুরুব্বি কে ? জামিন ধরবার লোক কই আপনার ?

জমিদারী সেরেস্তার নকলনবিশ। হাতের লেখার নমুনা দিয়ে নিজের হাতে দরখাস্ত করুন। বেশ, আপনার সার্টিফিকেট কই ? আপনাকে প্রশংসা করতে পারে এমন কেউ নেই সংসারে ?

নির্বিরোধ ইস্কুল-মাস্টার। সরকারী সাহায্য আছে মশাই। আপনার ক্যারেক্টার-রোল যে খারাপ। আইনভঙ্গ করে জেলে গেছেন।

শেষ পর্যন্ত ঝিনুকের আর শিং-এর বোতামের ক্যানভাসার। সঙ্গে রঙ্গিলা সাবান আর দিদিমণি আলতা।

'কি টার্মস আপনাদের ?'

'আমরা মশাই মেয়ে-ক্যানভাসার চাই।'

হাঁটছে, শুধু হাঁটছে। কতদিন এমনি হাঁটবে কে বলে দেবে ?

শচীনের ঘরে পুলিশের আসা-যাওয়া সুরু হয়েছে। যে দাগী তার আর ভাবনা কি, কিন্তু ছোঁয়া লেগে যাতে পচ ধরবার সম্ভাবনা ভাবনা

তারই। দিন পনেরো প্রায় চলে গেল, শচীন রণবীরকে আর রঙিন কাঁচের মধ্য দিয়ে দেখতে পারছে না। কেবলই ভয় হচ্ছে তার শান্ত-স্নিগ্ধ জীবনের স্রোতে যেন জঞ্জাল ভেসে এসেছে। এক আদর্শহীন অলস অকর্মণ্য। এক বিবেচনাহীন নির্লজ্জ স্বার্থপর। পরের কষ্টকে যে ভক্তি বলে কেড়ে নিচ্ছে জোর করে। অকৃতজ্ঞ কোথাকার।

শচীনের ঘৃণার ভাপ স্পর্শ করে রণবীরকে। সে এবার হেস্তনেস্ত করবে। দেখা করতে যাবে নেতাদের সঙ্গে। দেখবে সত্যিই তার মুরুব্বি আছে কিনা।

প্রথমেই প্রমথেশ।

প্রমথেশের মেজাজ অত্যন্ত তিরিক্ষি হয়ে আছে। তাঁদের দল কোয়ালিশন মন্ত্রীত্বে রাজি হলনা বলে। তিনি যত জাল বুনছিলেন সব ফেঁসে গেল, জোড় খুলে গেল সমস্ত গ্রন্থির। জীবনের এত হাঙ্গামা-হুজ্জতের পর যদি মন্ত্রীত্বের মাকালটাও না জোটে তবে নিশান উড়িয়ে কী এমন কেরামতি হল? শেষকালে সেই ন মন তেলও পুড়বে, রাধাও নাচবে, তবু আজ তাঁর বেলায় বোঁটা ছেঁড়া পাকা ফলটা তলায় থেকেও কুড়োতে দেয়া হবেনা। এ জুলুম নয় তো কি।

'দেশের জন্যে আমরা যারা কষ্ট করলাম আমাদের যদি না একটু দাঁড়াবার জায়গা করে দেন—' রণবীর কুণ্ঠিতের মত বললে। এক কথা বারে-বারে বলতে তার ঘেন্না ধরে যাচ্ছে। দেশ যেন একটা লেনদেনের জিনিস।

'আর বোলো না তোমার দেশের কথা।' প্রমথেশ ভিতরের রাগে ঝাঁজিয়ে উঠলেন 'এত যে করলুম তার জন্যে, বিনিময়ে কী দিলে সে জিগগেস করি? যখন তার ছিলনা, চাইনি কিছু। আজ রানি হতে পারে তবুও ভিখারিনী হয়ে থাকবে। মন্ত্রিত্ব পেয়েও নেবে না। সোনা

ফেলে আঁচলে গেরো দিয়ে ভাবছে খুব কেল্লা মারলুম। নিজের পায়ে নিজে শুধু কুড়ুল মারল। হায় হায় হায়। কে পাড়ে আর কে খায়।'

'অত সব ছাই পলিটিক্স আমি বুঝি না। আমি ছোটখাট অতি সাধারণ একটা চাকরি চাই। যদি কোথাও একটু বলে দেন—'

'চাকরি অমনি রাস্তায় পড়ে আছে কিনা! দেশ মন্ত্রীত্ব দিত, তবে তোমাদের চাকরিরও ভাবনা থাকত না। শুধু কি তোমাদেরই চাকরি?' ভিতরের অস্থিরতায় প্রমথেশ উস্‌খুস করে উঠলেন।

পাশের লপ্ত জমি নিয়ে বাড়িয়ে ফেলতেন বাড়ির চৌহদ্দি। ব্যাঙ্ক-শেয়ারে নগদে-কাগজে জমজমাট হয়ে উঠতেন। পাঁচটি বছরে পাঁচ পুরুষের পরমার্থিক সদ্গতি হত।

'কি করবে বল। মূর্খ দেশকে সেবা করলে অদৃষ্টে জুটবেই এমন লাঞ্ছনা।'

'অধিপদা কোথায়?'

জ্বলে উঠলেন প্রমথেশ। 'সে-স্কাউণ্ড্রেলটার কথা আর বোলো না। তাকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি, ত্যাজ্যপুত্তুর করেছি। ঘরশত্তুর বিভীষণ ও।'

কিন্তু, তলিয়ে দেখতে গেলে, অধিপ কি তাঁর কোনো শত্রুতা করেছে? না, কোনো শত্রুতাই সে করেনি, বরং, তলিয়ে দেখতে গেলে, প্রকাণ্ড উপকারই সে করেছে। নতুন আলোতে নতুন ব্যাখ্যা আবিষ্কার করে প্রমথেশ উল্লসিত হয়ে উঠলেন। এমনিতে তাঁর মনের কথা, মনের দুর্বলতা মুখ ফুটে জ্ঞানাঞ্জন বকসীকে জানানো যেত না। ঐ চোরাই চিঠির মারফৎ তাঁর মনের দর্পণ তিনি পরোক্ষে জ্ঞানাঞ্জনের চোখের কাছে তুলে ধরেছেন। জ্ঞানাঞ্জন তো অবধারিত হিন্দু মন্ত্রী। ঠাট বজায় রাখবার জন্যে আর দু-একজনকে না কোন

কোল দিতে হবে। জ্ঞানাঞ্জন যদি হাতছানি দেন তবে তিনি একবার চোখ টিপে নিয়েই অনায়াসে মেঝেটা অতিক্রম করবেন। তাঁর দলের গোঁয়ারতুমিতে তাঁর আস্থা নেই। শাসনও চালাব আবার দুঃশাসনও হব এর কোনো মানে হয়না। নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গটা নিছক ছেলেমানসি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, জ্ঞানাঞ্জন তাঁকে ডাকবেন, না, নিজেই যাবেন ছাতা আড়াল দিয়ে। জ্ঞানাঞ্জন ডেকে পাঠালেই তাঁর দিক থেকে ভাল হয় দেখতে। নইলে, যাই হোক, সত্যিকারের দেশের যাতে মঙ্গল, তার জন্যে একটু ধুলো গায়ে মাখতে তাঁর আপত্তি নেই। নিজেই না হয় যাবেন তিনি যেচে।

'তার ঠিকানাটা আমাকে দিতে পারেন ?'

হঠাৎ সুর বদলিয়ে ফেললেন প্রমথেশ। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার কাছে ছিল তো তার ঠিকানাটা। সত্যি, কে যেন বলেছিল আর কোথায় যেন টুকে রেখেছিলুম। দাঁড়াও, খুঁজে দিচ্ছি। এক দিন এরি মধ্যে আমারই হয়ত যেতে হতে পারে।'

যেতে হতে পারে। সাধ্যসাধনা করে তাকে পাঠাতে হতে পারে জ্ঞানাঞ্জনের কাছে। যাতে তিনি ডাকেন। যাতে তাদের একটা মোলাকাৎ হয়।

ঠিকানা পেয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করে রণধীর বার করল অধিপকে। একটা রঙ-চটা চলটা-ওঠা ভাঙা বাড়ির দোতলায় দুখানা ঘর নিয়ে সে আছে। নিচেটায় এক পাশে একটা সাইকেল-স্টোভের মেরামতি দোকান, অন্য পাশে একটা বিড়ি পাকাবার আস্তানা। খাড়া সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল রণধীর। নিরানন্দ সন্ধ্যার ছায়া জমেছে ঘরের মধ্যে। রণধীর উঁকি মারল। দেখল অধিপ একা-একা বসে মদ খাচ্ছে। এত ভেঙে গেছে, এত নেমে পড়েছে যে চেনা যায় না।

'কে ?' অরিপ প্রশ্ন করল।

'আমি। আমি রণধীর। বন্ধু।'

নামটা কোনো দিন শুনেছিল বোধ হয়। বহুদিন ধরে অনেক ছেলেই তার কাছে তাদের নাম বলে গেছে, নিজের মুখে না হোক অন্যের মুখে। তাদেরই কেউ একজন। নইলে এমন নিভৃতে এমন অন্তরঙ্গের মত নিজের নাম বলে কেন ?

'এস।' অরিপ আত্মীয়ের মত আমন্ত্রণ করল।

অরিপ একটা জীর্ণ চটের হেলা-চেয়ারে বসে আছে, রণধীর বসল পাশের ন্যাড়া তক্তপোষে। বলল 'আমাকে আপনি চিনতে পাচ্ছেন না ?'

'খুব পাচ্ছি। আমার কাছে যখন এসেছ তখন নিশ্চয়ই একজন ভগ্ন সৈনিক।'

'ক দিন হল ছাড়া পেয়েছি জেল থেকে।'

'ছাড়া পেয়েছ ? আমি কিন্তু এখনো ছাড়া পেলুম না। ছাড়া পেলুম না নিজের ভার থেকে। একেকবার দরজা খুলে দি, হাওয়ার ঝাপটায় আবার তখুনি বন্ধ হয়ে যায়। নিজের সীমার মধ্যে শূন্য হয়ে বসে থাকি। এই শূন্যতাটাই ভার।'

রাস্তার ধুলো উড়িয়ে এলোমেলো হাওয়া উঠেছে। তার দিকে চেয়ে থেকে রণধীর বললে, 'আপনি এখন কী করছেন ?'

'কিছুই যে করছি না, করতে পারছি না, তারই যন্ত্রণা ভোগ করছি। আর সে-যন্ত্রণা ভোলবার জন্যেই—'অরিপ সিগারেট ধরাবার জন্যে দেশলাই জ্বালাল। নিবে গেল কাঠিটা। আরেকটা ধরাল। নিবে গেল আবার। বললে, 'যতবার আলো জ্বালাতে চাই নিবে যায় বারে-বারে। আর তুমি ? তুমি কী করছ ?'

অত হেঁয়ালি করে কথা বলতে জানে না রণধীর। স্পষ্টাস্পষ্টি বলল, 'একটা চাকরি খুঁজছি। যা-তা, যেমন-তেমন, যে কোনো একটা চাকরি।'

'চাকরি? শুধু চাকরি একটা?' অধিপ তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল: 'তার জন্যে ভাবনা কী?'

'ভাবনার শেষ নেই। দিনের পর দিন সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত ঘুরেও একটা জোগাড় করতে পারছি না। তাই এসেছি আপনার কাছে। যদি কিছু—'

'একটা চাকরির জন্যে এত হা-হুতাশ? আমি ভাবছিলুম বুঝি নীল পাখি খুঁজছ।'

'না, সামান্য একটা চাকরি। নিশ্চিন্ত ঘুমের পর পরিচ্ছন্ন একটি প্রভাত।'

'যাক, তুমি সুখী।' অধিপ গ্লাশে মদ ঢালল: 'সামান্য একটা চাকরি হলেই তোমার মিটে যায়। তা, একদিন না একদিন পেয়েই তো যাবে একটা চাকরি। শেষ পর্যন্ত কে আর না পায়! তবে আর তোমার ভাবনা কি।'

'সত্যিই পাচ্ছিনা, অধিপদা।' রণধীরের স্বরে কাতরতা ফুটে উঠল: 'আপনি কোথাও কিছু চেষ্টা করতে পারেন না আমার জন্যে?'

'আমি কোত্থেকে করব?' অধিপের মুখে কঠিন ঔদাসীন্য।

'আপনারা বড়লোক। আপনাদের কত চেনা, কত সম্পর্ক। ইচ্ছে করলে একজন সহায়হীন নিঃসম্বলের জন্যে—'

'তুমি কি মেয়ে যে তোমার জন্যে হাঁটু গেড়ে নিচু হয়ে ঘাড় নোয়াব? তুমি পুরুষ, তোমার ভয় কি। নিজের চেষ্টায় নিজেই জোগাড় করে নেবে। আজ না হয় কাল, কাল না হয় পর্শু। যদি না জোটে জোর করে কেড়ে নেবে ছিনিয়ে।'

'তবু একজন মুরুব্বি চায় ওরা। বলে, রেফারেন্স কি? টেস্টিমোনিয়্যাল কোথায়?'

'ভালো লোককেই মুরুব্বি ঠাওরেছ। আমি নিজেই এখন ব্রোক—সর্বনষ্ট।'

আপনার এই দুঃখটা তো শুধু ছল, দুঃখের বিলাসিতা। আমার জীবিকাহীনতার মত স্থূল নয়, সত্য নয়। আপনি জানেন আপনার বাবা আছেন পিছনে, তাঁর জমিদারি নিয়ে, প্রভুত্ব-প্রতিপত্তি নিয়ে। আপনাকে পার্কে, কাঠের বেঞ্চিতে শুয়ে না-খেয়ে মরতে হবে না—'

'মানুষকে চেন, চিনতে শেখ। মানুষের দুঃখকে শ্রদ্ধা করতে শেখ।'

'শ্রদ্ধা করতে শেখাতে হয় না জোর করে।' রণধীর উঠে দাঁড়াল: 'আপনার কাছ থেকে কোনো সাহায্যই তা হলে আশা করতে পারি না?'

'আশা কোথায়! শুধু—আছে মহা-নভ-অঙ্গন!' অধিপ হেসে উঠল। 'এখুনি চললে কোথায়? খিদে পেয়ে থাকে আধ গ্লাশ জল দিয়ে সাহায্য করতে পারি। কাঠের বেঞ্চিতে শুয়ে মরবার আগে আধ-গ্লাশ জল খেয়ে নিয়ে ঘুমুলে পারতে।'

রণধীর নেমে এল রাস্তায়। আবার হাঁটতে লাগল। এক অস্ত থেকে আরেক উদয় পর্যন্ত। উদয় থেকে আরেক অবসান।

দেখল গ্যাসপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে বিজয় বিড়ি টানছে। তাদের দলের বিজয়। জেল খেটে বেরিয়েছে অনেকদিন। চেহারায় যে চিহ্নটা পরিস্ফুট সেটা কলঙ্কিত দারিদ্র্য। নিপীড়িত নিঃস্বতা।

কিন্তু অতক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে ও করছে কি?

এগুলো রণধীর।

'কে, বিজয়?'

যার চমকে দেবার কথা সেই চমকে উঠল।

'কি করছিস এখানে?'

কালো হবার কিছু নেই, তবু লজ্জায় কালো হয়ে উঠল বিস্ময়। চার দিক তাকিয়ে ফিসফিস করে রণধীরকে বললে, 'একটা ছেলেকে ওয়াচ করছি ভাই। ঐ হলদে বাড়িটাতে ঢুকেছে, এখনো বেরুবার নাম নেই। পা ধরে গেল দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে।'

সেই রাত্রে মেসে ফিরে রণধীর শচীনকে বললে, 'চাকরি জুটে গেছে, শচীন।'

শচীন স্ফূর্তিতে লাফিয়ে উঠল: 'কি চাকরি?'

'সে দেখতেই পাবে এক দিন। কাল সকালেই আমি চলে যাব মেস ছেড়ে।'

কি চাকরি শচীন আর জানতে চাইল না। কাল সকালেই যে রণধীর চলে যাবে তাতেই সে খুশি, তাতেই সে হালকা।

'তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। যত অমানুষই হই এ কৃতজ্ঞতা আমি ভুলবনা।'

'না, না, ও কথা বলবেন না। তবু যে আপনার চাকরি হল এটাই বেশি।' শচীনের চোখ চকচক করে উঠল।

নিঃসম্পর্ক হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল রণধীর।

মাতাল। স্পাই। চোর। রণধীর হাসল মনে-মনে। সব এক নৌকোর যাত্রী।

মধ্যবিত্ত এক উকিলের বাড়ি। বেবার্নিশ কাঠের কটা কুশ্রী চেয়ার টেবিল আর খোলা র‍্যাকে মোটা বাঁধানো কতগুলি আইনের বই।

কড়া নাড়তে লাগল রণধীর। বেলা প্রায় তিনটে।

বারো-তেরো বছরের হাফ-প্যাণ্ট-পরা একটি ছেলে এসে দরজা খুলে দিলে। কাকে চাই?

উকিলবাবু কোথায়? তিনি তো কোর্টে। তাঁকেই আমার দরকার, একটা জরুরি মোকদ্দমা আছে। আমি আসছি বারুইপুর থেকে। যত ফি লাগে মামলাটা কালকেই রুজু করতে হবে। তা আপনি বসুন, বাবা পাঁচটার মধ্যেই ফিরে আসবেন। হ্যাঁ, বসছি, আমাকে এক গ্লাশ জল খাওয়াতে পার? বা, পারি না? উকিলের বাড়ি মক্কেল এসেছে, শুধু খাবার কি, পা ধোবারও জল দেওয়া যায়। এটুকু বুঝতে আর ছেলেটির বাকি নেই। রণধীর শেষ ফোঁটাটি পর্যন্ত জল খেল। তুমি কী করছ? আজ ছুটি, হোম-টাস্ক করছি। যাও হোম-টাস্ক কর গে। আমি অপেক্ষা করছি তোমার বাবার জন্যে।

ছেলেটি চলে গেল উপরে। ঘুমন্ত মাকে জাগিয়ে দিয়ে বললে, নিচে মক্কেল এসেছে। প্রায় বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ এসেছে। হ্যাঁ, তোমাকে বলতে হবে না, বসিয়েছি ঠিকমত। জল খেতে দিয়েছি। হাত-পাখা দিয়ে এসেছি একখানা। জরুরি মোকদ্দমা। মোটা ফি।

রণধীর তাকাল চার পাশে। র‍্যাক থেকে এক পলকে মোটা-মোটা তিনখানা বই তুলে নিল।

সটান চলে গেল পুরোনো বইর দোকানে। বারো টাকা রোজগার করলে।

সতেরো

দেওকিরাম ভকত মারা গেছে।

কিন্তু মরেনি চুণীলাল আহির, বটকৃষ্ণ পান্তি, ফজ্‌লে করিম দলদার।

'মরবেনা, মরবেনা ওরা। মরতে দেব না ওদের।' উত্তেজিত কণ্ঠে বললে সমরেশ। অসহায় পরাভবের মধ্যে এমন একটা অনর্থক মৃত্যু তার রক্তে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু শান্ত তামসীর কণ্ঠস্বর। পেয়ালার চা ঢালতে-ঢালতে আনত, স্নিগ্ধমুখে বললে, 'আপনি মরতে না দেবার কে।'

'কে মানে!' সমরেশ প্রায় চমকে উঠল।

'আপনি কি ওদের অভিভাবক? ওরা কি আপনার শাসন-সংরক্ষণে বসবাস করছে?' তামসীর স্বরে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ।

'বা তা কেন! আমরা ওদের দলের লোক, পক্ষের লোক। পথ দেখিয়ে ওদের নৌকো নিয়ে চলেছি পারের দিকে।'

'বড় অহংকার আমাদের। দরকার নেই। ওদের নৌকোর হাল ওদের হাতেই ছেড়ে দিন। কোথায় ওদের পথ ওরা নিজেরাই দেখতে পাবে। যাই বলুন, সবাই আমরা বাইরের লোক। বাইরের লোকেরাই যদি ভিড় বাড়াই, ভয় হয় নৌকো না শেষে ডুবে যায় মাঝনদীতে।' চায়ের পেয়ালাটা হাতে নিয়ে তামসী বিশ্রান্ত ভঙ্গিতে বসল একটা নিচু চেয়ারে।

'হলুম বাইরের লোক, তাই বলে আমাদের কিছু করবার নেই?'

করবার নেই? এই অসাড় ভীরুতা, এই পঙ্কিল দারিদ্র্য, এই স্তূপীভূত অশিক্ষা—করবার কি শেষ আছে?

'কিন্তু আর যাই করুন, ওদেরকে বাঁচাবার চেষ্টা করবেন না।' সন্তর্পণে তামসী ছোট্ট একটু চুমুক দিল পেয়ালায়।

'বাঁচাবার চেষ্টা করবনা?' সমরেশের হাতের মধ্যে কেঁপে উঠল পেয়ালাটা: 'মরতে দেব এদের?'

'কিন্তু শুধু আরাম দেব, বিরাম দেব, অশন-আসন দেব, এই কি ওদের বাঁচানো? এ তো শুধু ওদেরকে খর্ব করে রাখা। ছোট জিনিসে লোভী করে তুলবেন না ওদের। ওরা নিঃস্ব আছে জানি, কিন্তু ওদেরকে নিঃস্বার্থ হতে দিন।'

যে দুটি কালো চোখ খানিক আগে কৌতুকে চঞ্চল ছিল এখন যেন সংকল্পে স্থির হয়ে আছে। তীক্ষ্ণমুখ অস্ত্রের মত অকম্প।

তেমনি গাঢ়, মন্থর স্বরে তামসী বললে, 'আপনি কি মনে করেন মৃত্যুর একটা ঝড় না বয়ে গেলে নবজন্মের চিহ্ন পড়বে মাটিতে? অন্ধকারের আর্তনাদে আকাশ যদি না বিদীর্ণ হয় তবে সূর্যের সূচীপত্র লেখা হবে কী দিয়ে? তেমন করে মরতেই যদি না পারি তবে তেমন করে জন্মাতে পারব কেন?'

আশ্চর্য, এত যে দুর্দমনীয় সমরেশ, তার মুখে কথা নেই। তাকে যেন বা একটু দ্বিধান্বিত দেখাচ্ছে। যেন কথাগুলি সে শুনছেনা, চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে শরীরী!

'যখনই বলেন ওদেরকে বাঁচাবেন, তখন মনে হয় আপনি ওদের থেকে বড়, ওদের থেকে আলাদা। ওদের প্রতি আপনার করুণার অন্ত নেই। আর তার বিনিময়ে ওদের থেকে চান কিছু কৃতজ্ঞতা। চান

ভোট। চান ওদের নেতৃত্ব। দল নিয়ে দলাদলি করার মোড়লি। কি, খাবারের প্লেটে হাত দিচ্ছেন না কেন?' তামসী একমুহূর্ত সহজ হবার চেষ্টা করল।

কিন্তু এক মুহূর্তই। বললে, 'কিন্তু যদি বলেন এদেরকে নিয়ে চলেছি চরম সংঘর্ষের মধ্যে, তখন সহজেই আশা করতে পারি আপনিও এদের পাশে থাকবেন। বাঁচাবার নাম করে চাঁদার খাতাটা ওদের হাতে দিয়ে চাঁদার থলেটা নিয়ে সরে পড়বেন না।'

বলতে-না-বলতেই চমকে উঠল তামসী। সিঁড়িতে কি কারু জুতোর শব্দ হচ্ছে?

না, কেউ নয়।

'কী চান আপনি? মুক্তি না মীমাংসা? জয় না নিষ্পত্তি? শুধু কটা দিনের ছুটি, কটা দিনের মাইনে, কটা দিনের নিরীহ নির্ভাবনা? শুধু কটা সোনালি সুবিধে? একটু শস্তা সৌখিন সুখ? বুঝিনা বাপু আপনাদের কথা।'

'আপনি তবে কী বোঝেন?'

'আমি বুঝি সংগ্রাম। সংগ্রামের সরলতা।'

কথাটা কানে একটু মিথ্যা শোনালনা। তামসীর চোখে এই সরলতার দীপ্তি দেখতে পেয়েছে সমবেশ। যে ঠিক তাকাতে পারবে সে কখনো ভুল করবে না। ভস্মে ঢাকা থাকলেও দেখতে পাবে সে আগুনের স্ফুলিঙ্গ। তাই তামসীর নাম সে লিখে নিয়েছে মনে-মনে, একই বাঁশির সুরে উচ্চকিত সাপিনী। অসীম আকাশের আনাগোনায় এক মেঘ আরেক মেঘের সঙ্গে যুক্ত হয়, ভাঙা-ভাঙা একা-একা মেঘ,— তেমনি দুজনে এসে পড়ল কাছাকাছি, এক অনুভবের আকাশে। এক অন্ধকারের বিস্তারে। এক আলোকের অভিমুখে।

প্রথমে আপিস, আপিসের সিঁড়ি। পরে রাস্তা, ট্র্যাম, রেস্টোর‍্যান্ট। শেষে, এখন, তামসীর নিজের বাড়ি, বাইরে বসবার ঘর। আত্মীয়তা-ময় নির্জনতা।

ভাবতে অদ্ভুত লাগছে সমরেশের। সে একজন ভদ্রলোক কেরানি, সভ্য ও শোভন, আর তামসী একটি বিলাসিনী তরুণী, ড্রয়িংরুমের মেয়ে। আর তাদের ঘিরে নরম ও নিরীহ পরিবেশ। পেয়ালায় চা, প্লেটে খাবার। কবিত্বময় কথা। দেয়ালে ম্লায়মান দিনেব ধূসরিমা।

'আমরা কেউ নই যতক্ষণ না আমরা সংগ্রাম কবি। ততক্ষণ আমরা জয়ী নই যতক্ষণ না আমরা ত্যাগ করি সর্বস্ব।' তামসীর দৃষ্টি গাঢ়তর হল: 'কাউকে যে ভালবাসি তা বুঝব কি করে যদি তার জন্যে দুঃখ পেতে ভয় পাই?'

কিন্তু তামসী আজ অমন উসখুস করছে কেন? সত্যি, সিঁড়িব গোড়ায় কি কেউ কথা কইছে না ফিসফিসিয়ে?

'তা হলে আমাদের ফণ্ডে চাঁদা দেবেন না আপনি?'

'চাঁদা? খুব তুচ্ছ শোনাচ্ছে? কিন্তু, বা, দেব বৈ কি। সুতো না ধরলে কাছি হবে কি করে?' তামসী ঝলমল করে উঠে পড়ল: 'আপনাদের চাঁদার হার কত?'

'ধরা-বাঁধা কিছু নেই। যা আপনি দেন।'

সিঁড়িতে স্পষ্ট করে জুতোর আওয়াজ। আস্তে-আস্তে যেন হিসেব করে-করে উঠে আসছে ভারী পায়ে।

আর কার! যা ভাবছিল তামসী, স্বয়ং জ্ঞানাঞ্জন।

সমরেশকে এখানে দেখতে পাবেন ভাবতেও পারতেন না। আর এমন একখানা ভাব করে বসেছে যেন কত দিনের অন্তরঙ্গতা। সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল মুহূর্তে।

'তুমি এখানে কী মনে করে? সঙ্গে কী ওটা? কবিতার পাণ্ডুলিপি?'

'চাঁদার খাতা।'

'কিসের চাঁদা?' জ্ঞানাঞ্জন ভ্রূ কুঞ্চন করলেন। 'একটা ক্লাব-ট্লাব খুলছ নাকি এ-পাড়ায়? কি ক্লাব? ককটেইল ক্লাব? মিক্স্‌ড্‌?'

শান্ত মুখে তামসী বললে, 'আমাদের মিলের শ্রমিকদের জন্যে প্রভিডেণ্ট ফণ্ড খোলা হচ্ছে।'

ছোট করে নিশ্বাস চাপলেন জ্ঞানাঞ্জন। বললেন, 'তা এখানে কেন?'

'ওঁর কাছ থেকে চাঁদা নিতে এসেছি।' বললে সমরেশ।

'তা আপিসে আমার কাছেই চাইলে পারতে। দিয়ে দিতুম। কষ্ট করে এ পাড়ায় এসেছ কেন?' জ্ঞানাঞ্জনের ভাবার্থটা এই, তিনি আর তামসী এক মানুষ। পকেট থেকে থলে বের করে বললেন, 'কত রেট তোমাদের?'

'আপনার কাছ থেকে নেব না।' বললে সমরেশ।

'কেন?'

'মানেটা বোধহয় এই,' তামসী বললে নিঃসংকোচে: 'শ্রমিকের টাকা শ্রমিকের থেকেই আসছে। তা হলে থাকবে তাতে প্রীতি, থাকবে পবিত্রতা। তাই না?'

সমরেশ হাসল। জ্ঞানাঞ্জনের মনে হল সমরেশ আর তামসীই আজ এক মানুষ।

'আমি হলে কিন্তু নিতুম। বেশ ভারী হাতে নিতুম।' হাসিমুখে বললে তামসী: 'যারা শোষক তাদের থেকেই শুষে নেয়া। যারা শত্রু তাদেরকে বোঝানো আমাদের যুদ্ধের বৈধতা।'

জ্ঞানাঞ্জন গম্ভীর হয়ে গেলেন। টুপিটা আজ নিজেই রাখলেন ব্র্যাকেটে। কোটটা খুলে ঘরের ভিতরে গিয়ে একটা কাঠের চেয়ারের পিঠে ঝুলিয়ে রাখলেন। বাইরে এসে বললেন, 'যা হয় কিছু দিয়ে ওকে বিদায় করে দিন না।'

কথাটা লাগল যেন ঘাডধাক্কার মত। সমরেশ কুণ্ঠিত হয়ে বললে, 'আজ তবে যাই। আরেকদিন না হয়—'

'না, না, বসুন।' তামসী চলে গেল ঘরের-ভিতরে। ব্যগ্র হাতে বাক্স খোলবার চাবি খুঁজতে লাগল। কখন কোথায় রেখেছে ঠিক মনে করতে পারছে না। বিছানার তলায, এটাচি কেসে, না, আঁচল-বাঁধা ফেলে এসেছে বাথরুমে? না, কেউ ঘরে ঢুকে সরিয়ে নিয়েছে চোরেব মত?

জ্ঞানাঞ্জন বসলেন না। ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগলেন ঘর-দোর। নিঁচে দারোয়ানের সঙ্গে এক প্রস্ত কথা সেরে এসেছেন, এখন কথা বলতে লাগলেন ঝি-চাকরের সঙ্গে। বাজার-দর, শরীর-গতিক, সুবিধে-অসুবিধে। মাসে ক পাউণ্ড চা লাগে, কত চিনি, কত বন্ধু এসে জমাযেৎ হয় সকাল-বিকেল। রাতে আলো জ্বলে কতক্ষণ, মিটারের কাঁটা কোন ঘরে এ মাসে। যেন তিনিই এ বাড়ির প্রভু, আপিস থেকে ফিরে চাকরের উপর কর্তালি করছেন, শাসন করছেন সমস্ত অপচয়ের।

চাবি খুঁজে পেয়েছে তামসী। কাগজ-চাপা হয়ে লুকিযে ছিল বইর মধ্যে। তাড়াতাড়ি বাক্স খুলে টাকা বার করে আনল।

'কত দিচ্ছেন?' প্রশ্ন করলেন জ্ঞানাঞ্জন।

তামসী উত্তর দিলনা। নোট কখানা মেলে ধরল সমরেশের খাতার উপর।

পঞ্চাশ টাকা! জ্ঞানাঞ্জন ঝলসে উঠলেন: 'টাকা আপনার বেশি হয়েছে দেখছি।'

'টাকা কখনো কারো বেশি হয় না। যা বেশি হয় তা হচ্ছে অনাবশ্যক শাসনের থেকে মুক্তি পাবার আগ্রহ।'

জ্ঞানাঞ্জন তামসীর ধার দিয়ে গেলেন না। কেননা তিনি জানেন আগামী মাসে এই পঞ্চাশটা টাকাই পাইয়ে দিতে হবে তামসীকে। তিনি ঝামটে উঠলেন সমরেশের উপর: 'যাও, সমস্ত জীবনের চাঁদা পেয়ে গেছ একসঙ্গে, লাইফ-মেম্বর করে নাও গে। ইহজন্মে আর তোমাকে আসতে হবেনা এদিকে। নাও, আর কেন। ওঠো—'

সমরেশটা কী মূর্খ। সত্যি-সত্যি উঠে পড়ল। বলতে পারলনা, আপনি আমাকে তাড়িয়ে দেবার কে? এটা কি আপনার বাড়ি? বলতে পারলনা।

তামসীই বা বলতে পারলনা কেন?

নিজের তাগিদেই চাকর চা করে এনেছে জ্ঞানাঞ্জনের জন্যে। তামসী সমরেশকে লক্ষ্য করে বললে, 'আরেক পেয়ালা চা খেয়ে যান।' এমনি করে ঘুরিয়ে বললে। স্পষ্ট দৃঢ় কণ্ঠে বলতে পারল না, না, যাবেন না, এটা আমার বাড়ি, আমি আপনাকে বলছি, বসে থাকুন। তামসীর ইচ্ছে হল নিজেও এই সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। তার হৃৎপিণ্ডের একটা স্পন্দন বন্ধ হল এক মুহূর্ত। মন ফিরে এল দোর-গোড়া থেকে। রাত্রে তার খিদে পাবে, ঘুম পাবে, সকালে উঠে মন চাইবে আবার আরম্ভের স্বাচ্ছন্দ্য। এখনো অনেক কথা ভাববার আছে। এখনো মায়া হয় বঝি এই মনোহর অভ্যাসের জন্যে। এখনো বুঝি সমুদ্রে কোটাল ডাকেনি। খুঁটি-খাম এখনো ঠিক আছে।

সমরেশ চলে গেলে জ্ঞানাঞ্জন বসলেন গ্যাঁট হয়ে। টাকা সম্বন্ধে একটা কঠিন কটূক্তি করেছেন, মনের মধ্যে লেগে আছে তার ঝালটা। সেটাকে মিঠে করে দেয়া দরকার। বললেন, 'টাকা আপনি যাকে

যত খুশি দিন, তাতে কারু কিছু বলবার থাকতে পারে না। কিন্তু এই সব বাজে লোককে কি বাড়িতে ঢুকতে দেয়া ভাল?'

তামসী তার সেই বিমোহন হাসি হাসল। বললে, 'সংসারে কোনো লোকই বাজে নয়।'

'বাজে নয়? এই সব স্কাম, ডার্টি লোকগুলো এখানে এসে প্রশ্রয় পাবে তাই বলে? শেষে একদিন দেখব ফ্যাক্টরির হেডমিস্ত্রি এসে বসেছে। হেডমিস্ত্রি ছেড়ে ফিটার মিস্ত্রি?' জ্ঞানাঞ্জন গজগজ করতে লাগলেন।

'আশ্চর্য কী।' তামসী তেমনি সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখে বললে, 'এই সব বাড়ি-ঘর, এত সব সুখ-ঐশ্বর্য্য একদিন এ সব বাজে লোকেরাই বাজেয়াপ্ত করবে। দরজা আর সিঁড়ি চিনে রাখুক আগে থেকে।'

'এ কিন্তু আপনি বেশি বলছেন।' রাগ করে এক চুমুকে অনেকটা চা খেয়ে ফেললেন জ্ঞানাঞ্জন। বললেন, 'আমি ক দিন এ বাড়িতে এসে থাকতে পারি তবে ঠিক হয়। ওসব চুনোপুঁটি কেরানির আস্পর্ধাটা বের করে দিতে পারি। আপনাকে গোবেচারা ভালমানুষ পেয়ে ওদের হাতে পুতুল-নাচ করাচ্ছে। দেখেছে বাড়িতে কেউ পুরুষ নেই, অমনি ভেবে নিয়েছে কেউ অভিভাবকও নেই আশে-পাশে। না, এখানে এসে থাকতে হয় আমার কিছু দিন। নইলে ওরা বুঝবে না আপনি কে, আপনি কোথায়!'

তামসী তার মুখের হাসিটি অস্ত যেতে দিলনা। ভাবতে চেষ্টা করল, সত্যি, বাজে লোকের আস্পর্ধা কত দূর!

হঠাৎ খাটো গলায় জিগগেস করলেন জ্ঞানাঞ্জন: 'অধিপ আসে? সেই বিশ্ববখাটে বেকার?'

'কই আর এলেন!' তামসীর গলা থেকে মধুময় মমতা ঝরে পড়ল।

'না, আসবে বৈ কি। সে কি আর দিন থাকতে আসবে? সে আসবে রাত ঘন হলে। আর নিজেও একটু ঘন হলে। আচ্ছা, আমি ঠিক তাকে ধরে ফেলব এক দিন। আমি পশু´ পাটনা যাচ্ছি, সেখান থেকে ঘুরে আসি চট করে। মাঝরাতে আমরাও বেরুতে পারি। মাঝরাত হলেই ঘুমে আমাদের চোখ ঢুলে পড়েনা।' কী আছে এব মধ্যে রসিকতার, জ্ঞানাঞ্জন নিজের আনন্দে হেসে উঠলেন।

তামসীকে তবুও চাকরি করতে হবে। করতে হবে বৈ কি। নইলে কোথায় পাবে সে এমন বাড়ি-ঘর, এই সাজসজ্জা, এত সুখশান্তি! বা, তাই বলে তার বাডিতে কে আসবে না-আসবে সে সম্বন্ধে তার স্বাধীনতা থাকবে না? থাকলে ভাল ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু জ্ঞানাঞ্জন এসেছে বলেও তো গাযে তার ফোস্কা পড়ছেনা। সমরেশ যে চলে গেল তা তার নিজের ভীরুতা। তা ছাড়া বাড়িটা তার নয অথচ ভাড়াটা মাগনা। তা না হয় মানছি, কিন্তু তাই বলে অমন হীন কটাক্ষ করে কথা কইবে কেন? শুধু কথায় কী হয়? কথায তো আর পাহাড় টলে না। আজ কথা, কিন্তু কাল যদি আর ফাঁকা আওয়াজ না থাকে? যদি সত্যিই মাঝরাতে এসে দরজায় টোকা মারে! বা, সেই পরীক্ষার সামনে মুখোমুখি সে দাঁড়াতে পারবে না তো মানুষ হয়েছে কি। এক ভাবে না এক ভাবে সংঘাত তো এক দিন আসবেই। তার জন্যে আগে থেকেই প্রস্থান করবে সভযে? ছেড়ে দেবে চাকরি? এমন কাপুরুষও কেউ আছে?

'চলুন, বেড়িয়ে আসি একটু।' জ্ঞানাঞ্জন অন্তরঙ্গতায় আর্দ্র হয়ে উঠলেন: 'বড় গাড়িটা নিয়ে এসেছি।'

'না।' এতটা রূঢ় হবার কোনো মানে হয় না। না-টাই মোলায়েম করে বলা যায়, নানা রকম ভাবের আবরণ দিয়ে। পরক্ষণেই

তামসী শুকনো ঠোঁটে হাসির অস্পষ্ট তুলি টানল, চোখে আনল কুণ্ঠার কুহেলি, বললে, 'শরীরটা ভাল নেই।'

চাকরি ছাড়াটাই সব নয়, চাকরি যাওয়াটাও আছে সংসারে। তামসীর চাকরি কে ছোঁয়, কিন্তু চাকরি গেল সমরেশের। এক খোঁট কালিতে, কলমের একটিমাত্র আঁচড়ে। চব্বিশ ঘণ্টা না পেরোতেই।

অতর্কিতে চড় খাবার মত, এমনি মনে হল তামসীর। বাইরের চোখে কি কারণ তার চাকরি যাবার কে জানে, কিন্তু আসল কারণ যে সে নিজে, এ কথা কে না বুঝবে? আরেকটা অপমানের শৃঙ্খল জড়ানো হল তার পায়ে, তার চলার পথে আরেক প্রতিবন্ধ। কিন্তু তার জন্যে করবে কী তামসী? সেও তার চাকরি ছেড়ে দেবে এই সঙ্গে? তাতে কী এমন সুরাহা হবে সমরেশের? সেও বা কী পাবে এই বৈরাগ্যের বিনিময়ে? সমরেশ যাবে এক রাস্তায়, সে আরেক। এক রাস্তায় হলেও দূর-দূর দিয়ে। কে জানে, হয়তো কারু সঙ্গে কারুর দেখাই হবে না। দেখা না হলেও যে দেখা হয় মনে-মনে তেমন দেখাও নয়।

ভেবেছিল তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে সমরেশ, অর্ডার পাবার সঙ্গে-সঙ্গেই। কিন্তু দু দিন হয়ে গেল তার দেখা নেই। কোথাও একটি পাতা নড়ল না কলের তেলের কমতি হলনা এতটুকু, উলটে যেতে লাগল জ্ঞানাঞ্জনের লাভের খাতার পৃষ্ঠা। হাতের কলম ফেলে রেখে শুধু সমরেশই এল বাইরে বেরিয়ে। ভেবেছিল বোধহয় কিছু একটা কাণ্ড ঘটবে, অন্তত তামসী এ মুখ বুজে সহ্য করবে না। কিন্তু, না, কোথাও এতটুকু চিড় ধরল না, তামসী তেমনি খোঁপা ফাঁপিয়ে শাড়ি আঁট করে আপিস করছে। তার প্রসাধনে এতটুকু ত্রুটি নেই।

এক দিন তামসীর বন্ধ দরজায় ঘা পড়ল সমরেশের।

'আসুন।' ঈষৎহসিত মুখে সাদর সংবর্ধনা।

জ্বালা করে উঠল সমরেশের। একটা চেয়ারে বসে পড়ে বললে, 'এর কোনো প্রতিবিধান নেই?'

'আপনার হাতে যদি কলম না থেকে হাতিয়ার থাকত তবে অনেক সহজ হত।' তামসী যেন সেই সহজের প্রতিচ্ছায়া: 'কবির কলম আর কেরানির কলমে অনেক তফাৎ। কেরানির কলম কালিমা ছাড়া আর কিছু লেখে না। তাই তার কলম হাত থেকে মাটিতে খসে পড়লেও কলমই থাকে, হাতিয়ার হয়ে ওঠেনা। তাই আপনি চলে যাবার পর আপনার পাশেব টেবিলের রমণীবাবু, আপনাদের গিল্ড্-এর যিনি সেক্রেটারি, আপনার জায়গায় তাঁর ভাইকে ঢোকাবার জন্যে তদবির করছেন।'

পরাভূতের মত তাকিয়ে রইল সমরেশ। বললে, 'কিন্তু আপনি তো কিছু করতে পারতেন।'

'বা, আমার কী। আমি কী করব!'

'কেন, আপনাকেও তো অপমান করেছে।'

'কে বললে? আমার বরং আরো দাম বেড়েছে সেদিন থেকে। আপনাকে সেদিন যে পঞ্চাশ টাকা দিয়েছিলুম তা ফিরে এসেছে দ্বিগুণ হয়ে!' নিশ্চিন্ত সুখে হাসল তামসী।

'সেটাও তো অপমান।'

'আপনি ভাবতে পারেন, আমি ভাবি না। আমি মনে করি, সেটা উন্নতি। যেমন রমণীবাবু তাঁব সংসারের আয়ের উন্নতি খুঁজছেন ভাইয়ের চাকরি দিয়ে। তারপর বক্‌সি যখন শুনবে, আপনি আমার কাছে এসেছিলেন আর আমি আপনাকে ফিরিয়ে দিয়েছি তখন আমার আরো উন্নতি হবে দেখবেন।'

'একজন সহকর্মীর উপর এই যে অন্যায় হল তার জন্যে আপনার কি কিছুই করবার নেই? এতটুকু একটা প্রতিবাদ পর্যন্ত নয়?'

'আমার জন্যেই তো আপনার চাকরি যায়নি। চাকরি গেছে মজুরদের মধ্যে আপনি অসন্তোষ সৃষ্টি করছেন বলে।'

'কিন্তু ওরাই বা কী করল আমার জন্যে?'

'কেনই বা করবে? আপনি ওদের কে? ওদের পক্ষে হতে পারেন কিন্তু ওদের মর্মে তো আপনি নন। আপনি তো নন ওদের জ্ঞাতিগুষ্টির একজন। আপনি চলে গেলে ওদের খুব জোর চোখের জল পড়তে পারে, কিন্তু রক্ত ঝরবে কেন?'

'তবে এখন আমি কী করব?'

'যখন জিগগেস করেছেন, বলি, শ্রেণীবদল করুন। ওদের একজন হয়ে যান! একেবারে স্থরু করুন নিচে থেকে। যাতে ওরা বুঝতে পারে, আপনি ওদের আপনার লোক, যাতে বুঝতে পারে আপনাকে। এদের মাঝে নিয়ে আস্থন আপনার দৃষ্টি, আপনার কর্মশক্তি, আপনার আন্তরিকতা। পারবেন? সব কিছুর আগে নিজের জীবনে পারবেন এই বিপ্লব ঘটাতে?'

'থাক, আপনার উপদেশটা আপনি নিজের জন্যে রাখুন।' সমরেশ রাগ করে উঠে পড়ল: 'আমি জানতাম আপনার কাছ থেকে কোনো আশা নেই। আপনি শুধু কথার ফুলঝুরি। আসলে আপনার লক্ষ্য শুধু রমণীয় জীবন, ভোগবিলাস—'

'কার নয়?' তামসীর সেই ঈষৎহসিত মুখে সেই শান্ত ঔদাসীন্য: 'তারই জন্যে না এত সংগ্রাম, এত ব্যর্থতা।'

সমরেশ রাগ করে চলে গেল। কিন্তু তার মা রাগ করতে পারলেন

না। ক'দিন পরে একটা চিঠিতে তামসীকে ডেকে পাঠালেন মিনতি করে। আকুল মিনতি করে।

আপিস-ফেরৎ তামসী সমরেশদের বাড়ি গেল। জ্ঞানাঞ্জন বক্‌সির পাড়াতেই তাদের বাড়ি, কিন্তু প্রতিবেশিতার সামান্যতম মাহাত্ম্যও তা দাবি করতে পারেনা। যেমন এঁদো তেমনি ঘিঞ্জি, অবিশ্বাস্যরকম জীর্ণ। ছেলেপিলে আছে কটি। কুলক্রমাগত দারিদ্র্যের তিলক সবাইর ললাটে।

ভদ্রমহিলার এককালে রূপ ছিল, ছিল সে রূপের তেজস্বিতা। বি-এ পাশ করেছিলেন, ছিল শিক্ষার চাকচিক্য। তবু এক দরিদ্র কেবানিকে বিয়ে করেছিলেন ইচ্ছে করে, সবাইর বাধা ঠেলে। আব সেই পবমনির্বাচিতের মৃত্যুশোক কী ভাবে গ্রহণ করেছেন জীবনে তাঁকে না দেখলে তামসী বিশ্বাস করতে পারত না।

'তুমি যদি সত্যি চেষ্টা কব, সমবেশের চাকবিটা আবার হয়।' ভদ্রমহিলা তামসীব হাত চেপে ধরলেন।

'আমার কী করবার আছে!' তামসী চেয়ে বইল অবাক হয়ে।

'কে না জানে, বক্‌সিব উপর তোমার প্রচণ্ড প্রভাব। তুমি যদি একটু অনুরোধ কবো—'

তামসী চুপ করে রইল।

'আমি গিয়েছিলুম নিজে বক্‌সির সঙ্গে দেখা করতে। তিনি কিছুতেই নড়লেন না একচুল। তাঁর নিষ্ঠুবতা নবম করতে পারি এমন আমার সাধ্যি নেই।'

'আমার আছে?' পাংশুমুখে হাসল তামসী।

তারপরে ভদ্রমহিলা যা বললেন তাতে তামসী সত্যি-সত্যি ভয় পেল। জ্ঞানাঞ্জন এমন আভাস দিয়েছেন যে তামসীকে তিনি বিয়ে

করছেন। কল-কারখানার কলুষস্পর্শ থেকে রক্ষা করবেন তাকে। নিয়ে আসবেন তাকে দুষ্প্রবেশ অন্তঃপুরের নিভৃতিতে। তাঁর রুগ্ন স্ত্রী নাকি সম্মতি দিয়েছেন। আর কোনো আত্মীয়স্বজনকে ভয় করবেননা জ্ঞানাঞ্জন।

এতক্ষণে ভয়ের শীতস্পর্শ লাগল এসে তামসীর রক্তে। যা অন্যায় যা অত্যাচার তা যদি নগ্ন মূর্তিতে আসে তবে তার মুখোমুখি দাঁড়ানো যায়, কিন্তু যদি তা আসে আইনের বা সমাজধর্মের মুখোস পরে তবে তাকে পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় কি! এমনি ব্যভিচারটা গর্হিত, কিন্তু তাকে একটা বিয়ের আচ্ছাদন দিতে পারলে কেউ আর টুঁ শব্দটিও করেনা।

তার মানে জ্ঞানাঞ্জনই ভয় পেয়েছেন।

'আচ্ছা, আমি চেষ্টা করে দেখব।' তামসী উঠে পড়ল।

পরদিন আপিসে সুইং-ডোর ঠেলে তামসী ঢুকল জ্ঞানাঞ্জনের খাস-কামরায়। বিনা কাজে, বিনা ঘোষণায়।

'আপনি আর আমার ওখানে যান না কেন? কী হয়েছে আপনার?'

জ্ঞানাঞ্জন উছলে উঠলেন। গায়ে পড়ে তামসী নিজে তাকে নিমন্ত্রণ করছে, কী হল আজ সংসারের? বললেন, 'যাব, যাব বৈ কি। একদম সময় নেই। কখন যাব বলুন তো?'

'বা, আপনার বাড়ি, যখন আপনার খুশি।'

সন্ধ্যের ঠিক পরেই জ্ঞানাঞ্জন এলেন। আজ তাঁর বড় দরাজ হাসি, দিলদরিয়া ভাব। আরো তিনি বেশি খুশি, তামসী সুন্দর করে সেজেছে, তাঁর জন্যে খাবার করেছে নিজের হাতে।

কথার পর কথা বলতে-বলতে আসল কথায় চলে এল তামসী।

বললে, 'সমরেশের চাকরিটা ফের পাইয়ে দিলে হত। ওদের বড় দুরবস্থা।'

'তুমি যদি বল দিয়ে দেব।' জ্ঞানাঞ্জন উদার ভঙ্গিতে বললেন।

'আমি ওকে বলেছিলুম কুলি হতে, কিন্তু ওর সেই কেরানি হওয়ারই সখ।'

উঁচু গলায় হেসে উঠলেন জ্ঞানাঞ্জন। 'চেয়ারে বসে চাকরি যে। নরম মেরুদণ্ড। ওর মা এসেছিল আমার কাছে ভিক্ষে করতে। আমি বলেছিলুম আমার কাছে কেন, মিস ডাট-এর কাছে যান। যার কাছ থেকে আপনার ছেলে ভাঁওতা দিয়ে টাকা এক্সটর্ট করে নিয়েছে, তাদের সমিতিতে যোগ দেবেনা বলে যাকে সে রীতিমত 'বুলি' করেছে গুণ্ডার মত। হা-হা-হা। এসেছিল নাকি মিসেস পালিত ?'

'এসেছিলেন।'

'বেশ হয়েছে, খাসা হয়েছে। তবে বুঝে নিয়েছে ওরা, হু ইজ হু, কার কী ক্ষমতা!' জ্ঞানাঞ্জন পকেট থেকে পাইপ বের করলেন। এটা তিনি তখনই ব্যবহার করেন যখন একটা বিরাট সাফল্যের শৃঙ্গারোহণ করেন। এখন তাঁর তেমনই মনে হল। পাইপটা ধরিয়ে নিয়ে বললেন, 'এ বাড়িতে ফোন থাকা উচিত ছিল। খাওয়া-দাওয়া তো হয়েই গেছে আজকের মত, বাড়িতে রিং করে দিতুম, ফিরব না আজ।'

ভড়কাল না তামসী। হাসিমুখে বললে, 'তারপর আপনি ঘুমিয়ে পড়লে চুপিচুপি রিং করে দিতুম থানায়, কত বড় একজন পুঁজিপতি কি-এক অখ্যাত জায়গায় খুন হয়ে পড়ে আছে।'

নির্বোধের মত জ্ঞানাঞ্জন হেসে উঠলেন।

তামসী টুপিটা বাড়িয়ে ধরল। জ্ঞানাঞ্জন সেটা তুলে নিয়ে হাসতে-হাসতে বললেন, 'আচ্ছা, আমি দিনকয়েকের জন্যে বাইরে যাচ্ছি,

ঘুরে আসছি শিগগির।' একটা সঙ্কেতসূচক কটাক্ষ করলেন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে বললেন, 'ছোট মোটরটা তোমার জন্যে রেখে যাব?'

তামসী শুনেও শুনল না।

সমরেশ হাতিয়ার না নিয়ে ফের কলম কুড়িয়ে নিয়েছে। কিন্তু তামসী করে কী? সে পালাবে। কোথায় পালাবে? পালাবার জায়গা নেই বলেই পালাবে। যদি জায়গা থাকত তবে শেষ পর্যন্ত দেখে নিত জ্ঞানাঞ্জনকে।

দু'সপ্তাহের পুরোনো খবরের কাগজ ঘাঁটতে বসল তামসী। সম্ভব-অসম্ভব যত বিজ্ঞাপন দেখল পাগলের মত দরখাস্ত পাঠাতে লাগল। কোন এক সংঘ বেকার পুরুষ-মেয়েদেব চাকরি দেবে, যার যেমন যোগ্যতা সেই অনুসারে, দরখাস্তের সঙ্গে দশ টাকা চাঁদা, সেখানে পর্যন্ত সে আবেদন করল। টাকা পাঠিয়ে দিল মনি অর্ডার কবে।

আঠারো

জ্ঞানাঞ্জন গিয়েছিলেন কে জানে কোথায়। আপিসের তাঁর সহকারী সেক্রেটারি কালিকিংকর এসে তামসীকে খবর দিল, আজ সাহেব রাতে ফিরবেন কলকাতা, উনার স্নেরে এবাড়ি আসবেন দশটা নাগাদ। এই মর্মে ও-বাড়িতে খবর দিতে লিখেছেন।

এ যেন গল্পের মত। এক রাজার দুই রাণী। বড় আর ছোট। রাজা কখনো বড়র কুটিরে, কখনো বা ছোটর। কালিকিংকরের এতটুকু আটকালনা। এ গল্প যেন তার বহুদিনের জানা।

তামসী খানিকক্ষণ বিমূঢ়ের মত বসে রইল। ভাবল, চলে যায় জ্ঞানাঞ্জনের বাড়িতে, তাঁর রুগ্ন স্ত্রীর সান্নিধ্যে গিয়ে আশ্রয় নেয়। নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না সে উদ্যতাস্ত্র হয়ে? পদদলিত করতে পারবে না সে এই লোলুপতা? কার কী সাধ্য তার একাকীত্বকে ব্যাহত করে? দরজায় সে খিল এঁটে থাকবে। ধাক্কা দিলে খুলে দেবে না। তাই বা কেন? আসুক না সে খোলা দরজা দিয়ে। কিসের কী ভয়? তাকে তার শানিত কথায় ও নিষ্ঠুর নিঃশব্দতায় পরাস্ত করতে পারবে না? তবে সে কিসের বিপ্লবিনী?

নিজের উপর বিশ্বাস ফিরে এল তামসীর। শরীরটা যেন হালকা হল নিমেষে। যে যাই বলুক, এমন চমৎকার চাকরি সে খোয়াতে

পারেনা। এত আরাম, এত প্রাচুর্য যেখানে। লক্ষ্মী না হয়ে কালী হতে তার আপত্তি নেই, কিন্তু এমন অলক্ষ্মী যেন সে না হয়। তাই নির্ভেজাল গোঁয়ারতুমি করার কোনো মানে হবে না। বন্ধ দরজায় জ্ঞানাঞ্জন ধাক্কা মারবে আর অন্ধকার ঘরে সে চুপচাপ দম আটকে বসে থাকবে, তার ফল হবে এই, কাল সকালে চাকরি থেকে সে বরখাস্ত হয়ে যাবে। কাল না হলেও পরশু। এভাবে নিজের মনের শৈত্য নিঃসন্দেহে জানিয়ে দিলে জ্ঞানাঞ্জন কিসের ভরসায় হৃদয়ে তাপ সঞ্চয় করবেন? না, আঘাত দেয়া যাবে না প্রত্যাহারের রূঢ়তায়। দুর্গ অভেদ্য থাকলেও অর্গল থাকবে অবারিত। আসুন তিনি ভিতরে। যে রণরঙ্গিণী, সে সহজেই রূপরঙ্গিণী হতে পারবে। মিষ্টি কথা বলে তোয়াজ-তোসামোদ করে ফিরিয়ে দেবে সে অনায়াসে। সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। যে করে হোক, বজায় রাখা চাই তার চাকরি। মেজাজ রাখা চাই মনিবের।

তামসী স্নান করে নিল। প্রসাধন করলে পরিপাটি করে। খুব দামী ঝলমলে শাড়ি পরলে। গয়না পরলে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। আয়নায় নিজের দিকে চেয়ে হাসল তামসী। কে না বলবে সে সেজেছে আজ জ্ঞানাঞ্জনের জন্যে?

'দিদিমণির আজ বিয়ে।' প্রশ্রয়পালিতা প্রগলভা ঝি বললে।

বলুক। সব বাক্যের বুদ্বুদ।

একটা ঢালু চেয়ারে গা এলিয়ে বসে আছে তামসী। একটা ঢাউস পত্রিকা নিয়ে। ভাবটা, অনেকক্ষণ ধরে প্রতীক্ষা করে আছে। দশটার সময় যখন আসবে বলেছে, দু'ঘণ্টা আগে কোন না আসবে। খেয়ে আসবে বলেছে, হঠাৎ কোন না মত বদলে বলবে, যা হয়েছে তাই এখানেই খাব। সেটাই তো বেশি সম্ভব। একটা পটভূমিকা তো দরকার।

যা ভেবেছে, সিঁড়িতে জুতোর আওয়াজ হচ্ছে। বুকের ভিতর দুরদুর করে উঠল। দেয়ালঘড়িতে তাকিয়ে দেখল মোটে সাড়ে আটটা। সকাল-সকাল আসাই বরং ভাল। সকাল-সকালই তাহলে বিদেয় করা চলে।

দরজা খোলা। প্যাসেজের আলোটা জ্বলছে। তামসী উঠে পড়ল।

দোরগোড়ায় রণধীর দাঁড়িয়ে।

'এ কি! তুমি? তুমি?' নবীনাগত কিশলয়ের মত কাঁপতে লাগল তামসী।

'আর তুমি! তুমি! অসি!' রণধীর ডেকে উঠল বিহ্বলের মত।

অসি! এই নামে আর কেউ কখনো তাকে ডাকেনি। তার বাবা তার নাম রেখেছিলেন তাকে মসী বলে ডাকবেন বলে। তার আত্মীয়-স্বজন ছাত্রীবন্ধু সবাই তাকে মসী বলে ডাকত। মসীর মাঝে যে অসি ছিল লুকিয়ে এ শুধু রণধীরই দেখতে পেয়েছিল। অন্ধকারের মধ্যে দুঃসহ দামিনী। তামসী হঠাৎ আজ অনুভব করল সে সত্যিই অসি, শুভ্রধার তলোয়ার।

'কবে ছাড়া পেলে?'

'অনেক দিন। কিন্তু ছাড়া পেয়েছি এমন কিছুতেই ভাবতে পারছিনা। নেকড়ে বাঘেরা একটা পথের কুকুরকে তাড়া করে ফিরছে।' বড় ক্লান্ত শোনাল রণধীরকে। পরিপূর্ণ চোখে একবার তাকাল তামসী। অত্যন্ত বিধ্বস্ত, হতশ্রী চেহারা। জামাকাপড় ময়লা, জুতো ছেঁড়া, ক্লান্তি ও হতাশার প্রতিমূর্তি। দারিদ্র্যের মালিন্য যেন তার হাড় পর্যন্ত কালি করে দিয়েছে। দুই চোখে ভয়, পরাজয়ের যন্ত্রণা।

কিন্তু আর ভয় কিসের! আমি আছি। তোমার সমস্ত ব্যর্থতা

আমি প্রক্ষালন করে দেব। তুমি পূর্ণ করবে আমার সকল প্রতীক্ষা। আমি আছি। তুমি আছ।

'আমার ঠিকানা পেলে কি·করে?' উৎফুল্ল চোখে বললে তামসী।

'ওঃ, কত দিন ধরে তোমাকে খুঁজছি। খুঁজছি আর খুঁজছি। ভগবান তো মানিনি কোনোদিন, তবু তিনি না মানিয়ে ছাড়বেন না। ট্র্যামে আজ হঠাৎ দেখতে পেলুম তোমাকে। পিছু নিলুম। ডাকতে সাহস হল না রাস্তার উপর। কে জানে চিনতে পারবে কিনা। দেখলুম, কোথায় যাও। পেয়ে গেলুম ঠিকানা। তবু তখুনি সাহস হলনা সিঁড়ি ধরে উঠে যাই তোমার সঙ্গে। কে জানে, কার ঘরের ঘরণী, কার অন্তঃপুরে অশান্তি সৃষ্টি করব। আশেপাশে খবর নিলুম। বললে, এটা একটা ফ্ল্যাট বাড়ি, তুমি একা আছ তোমার আলাদা ফ্ল্যাটে। সত্যিই তুমি একা, অসি?'

'একেবারে একা। একেবারে কোষমুক্ত।'

'একেবারে একা?'

'তুমি এস আমার ঘরের ভিতরে, আমি নিঃসঙ্গ, নিরাত্মীয়। এখন যখন তুমি আমার ঘরে এসেছ, আর আমি একা নই। আমি এখন কোষবদ্ধ তলোয়ার। আবৃত, সুরক্ষিত।'

ঘরের চারদিক বিস্মিত চোখে দেখতে লাগল রণধীর। বিহ্বল কৌতূহলে দেখল আরেকবার তামসীকে। বললে, 'এ সব ঘরদোর, আসবাবপত্র, সাজসজ্জা, সব তোমার? তুমি খুব বড়লোক হয়ে গিয়েছ দেখছি। কি করে হলে?'

'বলছি, সব বলছি তোমাকে। তুমি আগে বোস এই বিছানায়।' খাটের উপর পাতা বিছানায় তামসী রণধীরকে হাত ধরিয়ে বসিয়ে দিলে।

'বিয়ে করোনি, অথচ অবস্থা এমন ফেরালে কি করে ?'

'বা, আমি চাকরি করছি যে।'

'চাকরি করছ ?' রণধীর চমকে উঠল।

'হ্যাঁ, বেশ মোটা মাইনের চাকরি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল রণধীর। বললে, 'তোমার তাহলে আর কোনো দুঃখ নেই।'

'দুঃখ নেই ? দুঃখের শেষ নেই বলো। এই চাকরি আমি ছেড়ে দেব।'

'ছেড়ে দেবে ?' রণধীর আবার একটা ধাক্কা খেল।

'হ্যাঁ, ছেড়ে দেব, সব ছেড়ে দেব। তুমি একটু বোস, আমি আসছি দু' মিনিট।' বলে সরে গিয়ে তামসী ক্ষিপ্র হাতে একেক করে গয়নাগুলো খুলে ফেললে। তুলে রাখলে বাক্সয়। পশের ঘরে গিয়ে রেশমী ছেড়ে আটপৌরে মিলের শাড়ি পরলে। হ্যাঁ, সব, সব সে ছেড়ে দিতে পারে এই মুহূর্তে। এই গয়নাগাটি, শাড়িজামা, জিনিসপত্র, বাড়িঘর—যত সব আড়ম্বরের আবর্জনা। ছেড়ে দিতে পারে তার এই সাধের চাকরি। পায়ের তলায় ফেলে গুঁড়ো করে দিতে পারে। নতুন সূর্যের আলোকের অভিযানে বেরিয়ে পড়তে পারে রাস্তায়। বেরিয়ে পড়তে পারে রণধীরের হাত ধরে।

তামসীকে দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। দুঃস্বপ্নের পর আধ-জাগরণের স্নিগ্ধ নিশ্চিন্ততা। বললে রণধীর, 'এমন চাকরি ছাড়বে কেন ?'

'বলব, বলব, সব তোমাকে বলব। কিছুই লুকোবনা। কিছুই লুকোবনা তোমার কাছে। কিন্তু কেবল নিজের কথাই বলব—তোমার কথা শুনবনা ?'

আমার কথা আর কী শুনবে। একটা চাকরির জন্যে হন্যের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি। ঘুরে বেড়াচ্ছি এক দরজা থেকে আরেক দরজায়। ভাগ্যহতের মত। কেউ আশ্রয় দিচ্ছে না, সম্মান দিচ্ছে না, বিশ্বাস করছে না একবিন্দু। কারু ধারণা নেই মহৎ কাজ করেছি, দেখেছি কোনো মহৎ স্বপ্ন। কারু কৃতজ্ঞতা নেই, সহানুভূতি নেই। শুধু ঘৃণা, অনুকম্পা। আমার কথা আর কী শুনবে? তোমার কথা শুনি! তোমাকে দেখি! তুমি কী সুন্দর! তুমি কেমন সুখে আছ!

সুখে আছি? তুমি তো জান জীবন কী ভয়ংকর যখন সমস্তক্ষণ শুধু অপেক্ষা করতে হয় মৃত্যুর জন্যে। জেলে বসে মুক্তির দিন গোনার মত। কোনো বাড়িতে যখন মৃত্যুর আসার সময় আসে, তখন লোকে ঘর-দোর ঠিকঠাক করে, সাজায়-গুছায়, একটা সৌন্দর্যের পরিবেশ আনে। বিসর্জন দেবে বলেই প্রতিমাকে ডাকের গয়না পরায়। তেমনি আমি আমার ঘর-দোর সাজিয়ে দেহটাকে পর্যন্ত অলংকৃত করে বসে আছি। কতক্ষণে তুমি আসবে। তুমি এলে, যেন আমার কারাকক্ষের দরজা খুলে গেল। যে জীবনকে খানিক আগেও লোভনীয় মনে হয়েছিল, যে চাকরিকে ভাগ্যের মহামূল্য উপহার, এখন একেবারে ধুলো মনে হচ্ছে। সমস্ত সোনা মনে হচ্ছে রাংতা। সমস্ত সাজসজ্জা মনে হচ্ছে ভস্মলেপ।

'এখন তবে করবে কী?'

'তুমি আর আমি—এখন কি আর কাজের শেষ থাকবে, না, কাজ আর শেষ থাকবে?' গম্ভীর সংযত-কঠিন তামসী যেন অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। পার্বত্য অরণ্য যেন হঠাৎ চকিতপুষ্প হয়ে উঠেছে। 'ছোট ঘর ছেড়ে দুজনে চলে আসব পথে, জীবনকে অত্যন্ত বিস্তীর্ণ করে দেখব। চাকরি নয়, কাজ করব, দেশের কাজ।'

'তোমার এখনো ও সব বাতিক আছে দেখছি।' বড় নিস্পৃহ গলায় বললে রণধীর।

'ওই তো একমাত্র জীবনসাধন। শ্রেণীবদল করব আমরা। একেবারে নিচে থেকে স্থরু করব। যাতে ওরা বোঝে আমরা ওদের জ্ঞাতিগোত্র। স্থখে-দুঃখে সংগ্রামে-বিশ্রামে ছুঁতে পারে আমাদের সবল আন্তরিকতা। হাত বাড়িয়ে টেনে তুলব না, হাত ধরাধরি করে সবাই মিলে উঠে আসব উপরে।'

রণধীর হাসল মনে-মনে। তামসী এখনো স্বপ্নে ডুবে আছে। বুঝতে পারেনি এখনো মধ্যবিত্ততার ট্র্যাজেডি।

কিন্তু সমস্তক্ষণই কি তামসী গল্প করবে নাকি? রণধীরকে কিছু খেতে দেবেনা? তার জন্যে কিছু রান্না করবে না নিজের হাতে? তুমি এখন চা খাবে, না, একেবারে ভাত খাবে? না, লুচি? ভাত খাব। তুমি নিজের হাতে সামান্য কিছু রান্না করো। কত দিন ভাল কিছু খাইনি। তুমি এখন হাত-মুখ ধোবে, স্নান করবে? কোনো দরকার নেই। আমি এখন একটু শোব তোমার বিছানায়। হাঁটতে-হাঁটতে পা দুটো ক্ষয়ে গেছে। পাব তো শুতে?

রণধীর শুয়ে পড়ল, আর তামসী এ-ঘর থেকে ও-ঘরে ছুটোছুটি করতে লাগল। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়তে লাগল নানান ছোট-বড় কাজে। চাকরকে বাজারে পাঠালে নতুন করে, ঝিকে বললে, হাতা-খুন্তি এখন আমার হাতে দাও। কতক্ষণ রান্না করছে, আবার ভিজে হাত শাড়িতে মুছতে-মুছতে চলে আসছে এ-ঘরে। দেখছে, সত্যিই রণধীরই শুয়ে আছে কিনা। না, সমস্ত স্বপ্ন হয়ে হারিয়ে গেল এক্ষুনি!

চোখ বুজে পড়ে আছে রণধীর। পর্যুদস্তের মত। কিসের লজ্জা, কিসের পরাভব, যদি সংগ্রামে থাকে সরলতা? যে সত্যিই অকপট,

সে কখনো অকৃতকার্য নয়। যতক্ষণ তুমি লিপ্ত আছ তোমার কাজে, ততক্ষণ তুমি অর্থযুক্ত। কাজ বড় কর, তাহলেই আর তফাৎ থাকবেনা এ হার না জিত!

দশটা বেজে গেছে, তবু জ্ঞানাঞ্জনের দেখা নেই। রাতটা গভীর হতে দিচ্ছেন নিজে অবারণীয় হবেন বলে। গায়ে ঠেলা মেরে রণধীরকে জাগাল তামসী। বললে, 'রান্না তৈরি, খাবে চল।'

'খাবো খন। খাওয়ার পরেই তো চলে যেতে হবে।'

'কোথায়?'

'ফুটপাতে।'

'তবে সেখানে আমাকেও নিয়ে যেও। যেখানে তুমি সেখানে আমি। তেমনি যেখানে আমি সেখানেও তুমি। যতক্ষণ এ বাড়িঘর আমার, ততক্ষণ তুমিও এর অধিকারী। যদি আমি পাই শুতে, তোমারো জন্যে জায়গা থাকবে। আমার সব কিছুতে তোমার সমান মালিকানা।'

'সত্যি বলছ? রাতে থাকতে পারব এখানে?'

'রাতের পর দিন। দিনের পর দিন। যত দিন না ঠিক সুযোগ-সুবিধে করে উঠতে পারি দুজনে। একজনে পারলেই দুজনে।'

খাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে দু জনে আবার গল্পে মেতে উঠল। বলতে-বলতে রণধীর বললে অধিপের কথা। কেমন অন্তঃসারশূন্য হয়ে গিয়েছে। আর সে নিঃস্বতার মধ্যেও তার কী শূন্যগর্ভ অহংকাম। মদ খায় আর কবিতা আওড়ায়, অলস কল্পনাকৌতুক করে। সংসারে আর কোনো আশা নেই রণধীরের। বলতে-বলতে তামসী বললে দেবিকার কথা। এখন এক জেলার কলেক্টরের পত্নী। একজিবিশন ওপ্‌ন্ করে, প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউশন করে সভায়-সভায়। স্বামীর সঙ্গে মফস্বলে গিয়ে সেও ইনটারভিয়ু দেয়।

রণধীর শুয়ে, আর তামসী তার শিয়রে বসা। সিঁড়িতে ভারী পায়ের জুতোর শব্দ হল। বলতে-বলতে আসছেন জ্ঞানাঞ্জন, 'আনাচে-কানাচে সমস্তগুলো বাতি জ্বলছে কেন? কী কাজ বাড়িতে?' কণ্ঠস্বরে প্রচ্ছন্ন আনন্দ, তিনি জানেন আজ বাড়ীতে কী।

তামসী রণধীরের আরো কাছে সরে এল, ভয়ের গল্প শুনে শিশু যেমন মার বুকের কাছে সরে আসে। ঘরের মধ্যে ঢুকে জ্ঞানাঞ্জন একেবারে পাথর হয়ে গেলেন। এ কে?

'এ কে?' প্রশ্নটা জ্ঞানাঞ্জনের গলায় আর্তধ্বনির মত ফেটে পড়ল।

তামসী কথা বললনা। তেমনি ঘেঁসে বসে রইল শিয়রে।

প্রশ্নটার প্রতিধ্বনি ফুটে উঠল রণধীরের মূঢ় দৃষ্টিতে। এ কেন আসে রাত করে, তামসীর একা ঘরে? বুকেব ভিতরটা তার কালো হয়ে উঠল জিজ্ঞাসায়।

'অন্য লোকও নিয়ে আসছ দেখি আজকাল। কিন্তু আমার চেয়ে কি বেশি দেবে?' জ্ঞানাঞ্জন অনাবৃত বর্বরতায় প্রকাশ করলেন নিজেকে।

মূঢ় চোখে তেমনি তাকিয়ে আছে রণধীর। যেন এ প্রশ্নটা সে নিজে কবছে।

মুখ নিচু করে বসে আছে তামসী। তার দুই চোখ ভয়ে ও ব্যথায় আচ্ছন্ন।

'পাপ কখনো লুকিয়ে রাখা যায় না। আজ ঠিক ধরে ফেলেছি।'

এ কথাটাও যেন রণধীরই বলছে। তামসীর দুই চোখে জল এসে দাঁড়াল।

'আচ্ছা, আমি দেখে নেব এর কী করতে পারি—'

ক্রুদ্ধ পা ফেলে জ্ঞানাঞ্জন চলে গেলেন। তামসী দুই হাতে আঁকড়ে ধরল রণধীরকে। না, তুমি যেওনা। তুমি কি অন্য লোক?

অন্নের থেকে স্বাদ চলে গেল রণধীরের। ক্ষুধার থেকে চলে গেল ধার।

'তুমি কিছু খাচ্ছ না।' বললে তামসী।

'কে বলে খাচ্ছি না? আমার শুধু ঘুম পাচ্ছে।'

হঠাৎ তাদের দুইয়ের মাঝখানে নেমে এসেছে প্রতিকূল স্তব্ধতা। হয়তো মনে-মনে রণধীর আঁচ করে নিচ্ছে, কি করে তামসীর এত প্রাচুর্য, এত উদ্বৃত্তি! সেই অনুমানের জ্বালাটা দগ্ধ করতে লাগল তামসীকে। এর পর আপাতচোখে লোক আর কী ভাবতে পারে? সমস্ত আপিসের লোক, পরিচিত বন্ধুবান্ধব সবাই তো এই কথাই ভেবে এসেছে এত দিন। কিন্তু রণধীর তো তাকে ভুল বুঝতে পারে না। যদি সব কথা আদ্যোপান্ত সে খুলে বলে। যদি সমস্ত অবস্থাটা বিশদ করে বুঝতে দেয় তাকে। যদি ঠিকমত তাকাতে পারে সে তার অন্তরের গহনে। যদি হৃদয় এনে রাখতে পারে তার হৃদয়ের উপর।

'তোমাকে সব কথা আমি বলছি ব্যাখ্যা করে, তুমি শোন—' খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানার এক পাশে বসল এসে তামসী।

'আমার কাছে কোনো কিছুর ব্যাখ্যার দরকার নেই, অসি, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও। অনেক রাত হয়েছে।'

'না, তুমি শোনো।'

'আজ নয়, কাল শুনব। দিন তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।'

কিন্তু আজকের এই রাতটাই বা কম কি। তামসী কুণ্ঠিতের মত বললে, 'কিন্তু—

'আমার চোখ ঘুমে বুজে আসছে। অনেক হেঁটেছি। আমাকে এখন ঘুমুতে দাও লক্ষ্মী।'

তামসী আর কথা বলল না। তোলাপাট সব সারা হয়েছে দেখে দরজায় খিল দিলে।

রণধীর ঘুমিয়ে আছে খাটের বিছানায়। আর তামসী নিচে। শুয়ে আছে শীতল-পাটির উপর।

অন্ধকার।

অন্ধকারে কান পেতে ভারী, ঘুমন্ত নিশ্বাস শুনছে তামসী। আর তার বুক ভরে-ভরে উঠছে।

এই ঘুমের মধ্যে কত বিশ্বাস আর সমর্পণ, কত পরিতৃপ্তি। না, সব ঠিকমত বোঝাতে পারবে রণধীরকে। কাল ভোরে যখন সূর্য উঠবে তখন অপসৃত হয়ে যাবে সমস্ত কুজ্ঝটিকা।

একটু তন্দ্রা এসেছিল তামসীর। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। কই, সেই নিশ্বাস শুনছে না তো! আস্তে-আস্তে উঠে বসল সে। আস্তে-আস্তে অন্ধকারে, পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল সে খাটের দিকে। না, ঐ তো শুয়ে আছে রণধীর। অবোলা শিশুর মত ঘুমুচ্ছে।

পা টিপে-টিপে হেঁটে এসে আবার সে পাটির উপর শুল। ঘুমিয়ে পড়ল কি তক্ষনি?

আজ তামসী একেবারে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। স্বপ্ন দেখছে বুঝি সে। স্বপ্ন দেখছে, কোন অতল মরকতের সমুদ্রে সে ডুবে যাচ্ছে ধীরে-ধীরে। তার এ ঘুম যেন এ রাত পুইয়ে গেলেও ভাঙবেনা।

ধড়মড় করে উঠে বসল তামসী। না, এখনো ভাল করে ভোর হয়নি। চোখ কচলে তাকাল সে চারদিকে। রণধীর কোথায়? রণধীর কোথায়? রণধীর নেই। দরজাটা খোলা। তার গয়নার বাক্সটা অন্তর্হিত।

শুধু একটা চিঠি পড়ে আছে মেঝের উপর। তামসীরই নিজের

হাতে লেখা। তাড়াতাড়ি নিল সেটা কুড়িয়ে। যে প্রতিষ্ঠান যোগ্যতা অনুসারে কর্মহীন যুবকযুবতীর চাকরি জুটিয়ে দেবে বলে দশটাকা করে চাঁদা নিয়েছিল, তাদের কাছে লেখা তার সেই চিঠি তাড়াতাড়িতে হয়তো পকেট থেকে পড়ে গিয়েছে। আর সেই চিঠিই রণধীরকে দিয়েছে তার ঠিকানা।

উনিশ

নিজের হাতে লেখা চিঠিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তামসী। চিঠি তো নয়, দরখাস্ত। অনেক ইনিয়ে-বিনিয়ে লম্বা দরখাস্ত করেছিল সে। বলেছিল অনেক দুঃখ-দুর্দশার কথা, তার অসহায়তার ইতিহাস। যাতে ওদের দয়া হয়, ডাক পড়ে তার। কথার মাঝে রেখেছিল বা একটু ব্যক্তিগত স্বর। যাতে দরখাস্তটা চিঠি-চিঠি মনে হয়।

তাকে কারুর ডাকতে হয়নি। তারই ডাকে সে পথ চিনে এসে পড়েছে। বলে কিনা, ট্র্যাম থেকে নামলুম। পিছু নিলুম। দেখলুম সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেতে উপরে। মিথ্যেবাদী!

শুধুই কি মিথ্যেবাদী? চোর। তার গয়নার বাক্স চুরি করে পালিয়েছে।

রাগে, ঘৃণায়, লজ্জায় তামসী কাঠ হয়ে রইল। ভেবে পেলনা, সত্যিই এ কি সে বিশ্বাস করবে, না, সমস্তটাই একটা ভুতুড়ে ব্যাপার? সত্যিই কি এখন ভোর হয়েছে, না, এখনো সেই মরকতের সমুদ্রে শুয়ে স্বপ্ন দেখছে সে?

গয়নার এটাচি কেসটা ট্রাঙ্কের উপরে ছিল। গা থেকে গয়নাগুলো খুলে রেখে তাড়াতাড়িতে বাক্সটা আর আলমারির মধ্যে ঢোকানো হয়নি। তখন কি আর তার গয়নার দিকে মন আছে? কিন্তু তখনি হয়তো বাঁকা চোখে বাক্সটা ঠিক দেখে রেখেছিল রণধীর। যদি সেটা

আলমারির মধ্যে ঢুকিয়ে রাখত, তবে এক ফাঁকে আলমারির সে তালা ভাঙত নিশ্চয়ই। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল হয়তো তার যন্ত্রপাতি। যদি রাখত ট্রাঙ্কে ঢুকিয়ে, তবে হয়তো গোটা ট্রাঙ্কটাই তুলে নিত মাথায় করে। দলের লোক ছিল নিশ্চয়ই বাইরে।

কেন এমন হল? কেন এমন হল? শুষ্ক মূঢ় চোখে তাকিয়ে রইল তামসী।

যদি বলত, দিয়ে দাও তোমার গয়নার বাক্সটা, তবে তামসী কি তা দিয়ে দিতনা? কী মনে হয়? স্বচ্ছন্দে দিয়ে দিত। তার চেয়ে আরো অনেক বেশি সে দিতে পারত অনায়াসে। কিন্তু সে চেয়ে নিলনা কেন? কেন বা ছিনিয়ে নিল না জোর করে? কেন চুরি করতে গেল? কোন লজ্জায় কোন অপমানে?

দু চোখ কানায়-কানায় ভরে উঠল অশ্রুতে। মনে পড়ল রাজসাহির কথা। এক বার বাড়তি পাঁচটা টাকা এসেছিল বাড়ি থেকে, ছাতা কেনবার জন্যে। কলেজে যেতে আসতে অনেকটা পথ হাঁটতে হত তামসীর। রোদ খাঁ-খাঁ করছে, কখনো বা বৃষ্টি পড়ছে ঝমঝমিয়ে। সব সময়েই মাথার উপরে একটুকরো একটু আঁচল তোলা। কিন্তু নিজেই বুঝত সেটা যথেষ্ট নয়: জুতো না হলে চলে কিন্তু ছাতা না হলে চলে না। যেদিন টাকাটা আসে, সেদিনই রাস্তায় রণধীরের সঙ্গে দেখা, চলেছে হনহন করে। ভালই হল, তাকে সঙ্গে করে কিনে আনতে পারবে দোকান থেকে। তাকে দেখতে পেয়েই থেমে পড়ল রণধীর, বললে ব্যস্ত হয়ে—আমাকে কটা টাকা দিতে পার? প্রশ্নটার জন্যে প্রস্তুত ছিলনা তামসী, তবু ঘুণাক্ষরেও সে জানতে চায়নি টাকার দরকার কেন? রণধীর গায়ে পড়ে নিজের থেকেই বললে। বললে, মাথামুটে খাবারওয়ালার থেকে খাবার খেয়েছিলুম ধার করে। মেজদা

এখনো টাকা পাঠায়নি, কিন্তু ব্যাটাচ্ছেলে খাবারওয়ালা পিছু নিয়েছে 'ক দিন থেকে। ব্যাখ্যাটা ভাল লাগেনি তামসীর, তবু সক্ষম বন্ধুতার প্রতিশ্রুতিতে তক্ষুনি জিগগেস করলে,—কত?—এই গোটা পাঁচেক। রণধীর বললে অসহিষ্ণুর মত। রৌদ্র-বৃষ্টি ভুলে গিয়ে কষ্টপ্রাপ্ত সেই পাঁচটা টাকা অম্লানমুখে দিয়ে দিলে তামসী। তারপর তার আর ছাতা হয়নি। কিন্তু রুক্ষ রোদে মনে হয়েছে নিবিড় মেঘের ছায়া করে আছে চারদিকে, আর যখন বৃষ্টি নেমেছে অঝোরে, মনে হয়েছে গায়ে তার জড়ানো আছে বর্ষাতি।

সেই পাঁচটা টাকা রণধীর আর তাকে ফেরত দেয়নি। ছি ছি-ছি, এ কথা তার মনে হচ্ছে কেন? তার শুধু মনে হওয়া উচিত, এমনি ফিরিয়ে না দেবার অধিকার আছে রণধীরের। দাবি আছে দায় নেই। তার শুধু মনে হওয়া উচিত, যা রণধীর চায় আর যা দেবার মত জমা আছে তার তবিলে, সব সে বিনিঃশেষে দিয়ে দিতে পারে। দিয়ে দিতে পারে দেনা-পাওনার খতেন না করে, তুচ্ছ করে সব ফলাফলের ভাবনা। কিন্তু, না, কেবলই এখন মনে হচ্ছে সেই পাঁচটা টাকা শোধ দেয়নি রণধীর। কেবলই মনে হচ্ছে অতর্কিতে ঘরে ঢুকে চুপি-চুপি চুরি করে নিয়েছে তার গয়নার বাক্স।

না, এ কখনোই হতে পারেনা। মরে গেলেও না। নিশ্চয়ই এমনি কোথাও ঘুরতে গেছে ভোরবেলা। আর, তার মনে নেই, গয়নার বাক্সটা অজ্ঞানে অভ্যাসবশে রেখে দিয়েছে আলমারিতে, নয় তো, ট্রাঙ্কে। মেঝের উপর বসে ছিল, ধড়মড় করে উঠে পড়ল তামসী। আলমারিটা খুলে ফেলে দু হাতে তছনছ করতে লাগল শাড়ি-জামা, যত কিছু জিনিসপত্র। এ ট্রাঙ্ক থেকে ও ট্রাঙ্ক। আনাচ-কানাচ। কিন্তু কোথায় গয়নার বাক্স।

'কী খুঁজছ গো দিদিমণি ?' ঝি জিগগেস করলে।

সত্যিই তো। কী খুঁজছে সে ? গয়নার বাক্স ? শূন্য হাতড়াতে লাগল তামসী। না, খুঁজছে সে তার নাম, তার প্রেম, তার এতদিনের প্রতীক্ষা।

'শিগগির চা করে দাও স্টোভ জ্বেলে। আমি এখুনি বেরুব।'

'সেই তোমার রাতের বাবুটি কোথায় গেলেন দিদিমণি ?'

তামসীর গলা এতটুকু কাঁপল না। বললে, 'ভোররাতে উঠে বেড়াবার অভ্যেস। বাইরে গেছেন।'

বিছানায় এখনো তার স্পর্শছায়া শুয়ে আছে। সেই দিকে তাকিয়ে রুদ্ধশব্দ হয়ে তামসী বলে উঠল : মিথ্যেবাদী। চোর!

আর, তুমি মিথ্যেবাদী না? দরখাস্তে যে অত কাঁদুনি গেয়েছিলে, প্রেতে পাচ্ছনা, নিরীহ একটা আশ্রয়ের জন্যে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ, তোমার উপরে নিঃস্ব একটা পরিবার নির্ভর করে আছে—এ সমস্ত আগাগোড়া ছলনা নয়, শঠতা নয় ? আর, চোর যে বলছ, তুমি কী ? এ কিসের পণ্যবীথি খুলে বসেছ তুমি ? এত বিভ্রম, এত বিলাস, এত লাবণ্য ? এই কৌচ আর কার্পেট, এই গয়না আর পোশাক, এই ফেনধবল বিছানা! তারপর জিগগেস করি চাপা গলায়, গভীর মধ্যরাতে কে আসে ঐ নট-নাগর ?

কিন্তু তাই বলে চুরি ?

খুব ভোরেই আজ স্নান করল তামসী। যেন একটা ধূলিস্পর্শ থেকে সে মুক্তি চায় তাড়াতাড়ি। ঝি এসে চা দিয়ে গেল। হ্যাঁ, এখুনিই সে বেরুবে। সোজা চলে যাবে থানায়। স্পষ্ট এজাহার করবে। কাকে আপনি সন্দেহ করেন ? এ আর সন্দেহ কি! একেবারে সোজা সাফ কথা। তার এ মুহূর্তে বেঁচে থাকার মতই প্রত্যক্ষ।

রাস্তায় নেমে এল তামসী। কে জানে হয়তো কোনো বড় কাজের জন্যেই গয়নাগুলোর দরকার হয়েছে। বড় কাজ! রীতি যেখানে হীন, পরিণতি সেখানে বড হতে পারে? বারে-বারে হয়ে যায়নি তার পরীক্ষা? আর, যে-কাজে তাকে সে নিলনা, নিল শুধু তার গয়নাগুলো, সে-কাজকে সে বড় বললে কোন মন দিয়ে? আশ্চর্য, তার থেকে তার গয়নাগুলোকেই বেশি দামী মনে হল। তাকে কাছে পাওয়ার থেকে তাকে ঠেলে ফেলে দূরে চলে যাওয়াটাই লোভনীয় লাগল। আশ্চর্য, তার ঘুমন্ত, নির্জন দেহটার পর্যন্ত কোনো দাম দিল না। রাজনীল মরকতের চেয়ে দামী হল তার কাছে কাঁচের টুকবো, পাথরের হুড়ি।

থানাটা বেশি দূরে নয়। উত্তরমুখো একটা ট্র্যাম ধরল তামসী। সকালবেলা তত ভিড় নেই ট্র্যামে। একটা সিটে বসে শূন্য চোখে সে চেয়ে রইল বাইরের দিকে। যেন ত্বরা নেই, লক্ষ্য নেই, সামর্থ্য নেই। সত্যিই সে অপহৃত, নিঃস্বকৃত।

সত্যি, দেহে আর তার আছে কি, কাঠ বেরিযে পড়েছে। জামাটা গা থেকে খুলে ফেললে হয়তো পাজর গোনা যায় একেক করে। যেন পাহাড়ের চূড়ো থেকে পড়ে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে। খাবার নেই, পরবার নেই, মাথা গোঁজবার মত নেই এতটুকু নিরাপদ আশ্রয়। একটা মূঢ় ভয় তাকে তাড়া করে ফিরছে, লাঞ্ছনার বেদনা তাকে থামতে দিচ্ছে না এক জায়গায়। সে ব্যর্থ, বিধ্বস্ত, সমাজের সে অমনোনীত, তাই সে অন্ধকার কোণ খুঁজছে, দাঁড়াতে পারছে না সারল্যের সূর্যালোকে। পালিয়ে বেড়াচ্ছে এক নৈরাশ্যের থেকে আরেক নিষ্ফলতার মধ্যে। তার জন্যে সম্মান নেই, তাই নিজেও সে সম্মান করতে পারছে না, বিশ্বাস করতে পারছে না। জীবনের

ভাণ্ডার থেকে সমস্ত আশা-আদর্শ ব্যয় হয়ে গিয়েছে নিঃশেষে। ফসলের ক্ষেত ভরে গিয়েছে আগাছায়। যার হবার কথা ছিল স্বর্ণচূড়া, সে এখন ভাঙা মন্দিরের অবশেষ।

ট্র্যাম চৌরঙ্গিতে চলে এসেছে।

তামসীকে দেখে আনন্দে চমকে উঠেছিল রণধীর। ডেকে উঠেছিল অসি বলে। কিন্তু পরক্ষণেই দেখল মর্চে পড়েছে তলোয়ারে। চারিদিকে শুধু মিথ্যে আর কপটাচারের চাকচিক্য। সাধনার বদলে এখন শুধু প্রসাধনের বেসাতি। তামসীকে দেখে রণধীরের ঘেন্না ধরে গেল। তার মাঝে আর সেই তামসী রাত্রির পবিত্র দ্যুতি নেই, সে এখন সত্যি-সত্যি মসীময়ী। তার শরীরেও যেন কোনো শোভা নেই, আহ্বান নেই। সে এখন বাজে জিনিসের সামিল। ঘেন্নার থেকে ক্রমে-ক্রমে জ্বালা ধরে গেল রণধীরের রক্তে। সে সংগ্রামের মাঝে থেকে কত ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে, আর তামসী কেমন মসৃণ স্রোতে নৌকো ভাসিয়ে চলেছে মোলায়েম পাল তুলে দিয়ে। সেই মহাসমুদ্রের পথ কোন পঙ্কিল স্রোতমুখে কোথায় বন্ধ হয়ে গেছে। তবে আর কেন! তুমি তোমার পথ দেখেছ, আমিও আমার পথ দেখি।

ট্র্যাম এসপ্ল্যানেড ঘুরছে।

অনেক নিশ্চয়ই টাকার দরকার পড়েছে। বোধ হয় জমেছে অনেক ধার, অনেক তাগিদের তাড়না। এমন হয়তো বিপদের মুখে পড়েছে যার থেকে বাঁচতে হলে চাই অনেক টাকার খেসারৎ। বেশ করেছে, গয়নাগুলো যে নিয়ে গিয়েছে বাক্স ভরে। তবু এতদিনে সত্যিকারের কাজে লাগল ওগুলো। কিন্তু কখানা গয়নাই বা আদায় করতে পেরেছে জ্ঞানাঞ্জনের থেকে? ক'দিনই বা এ দিয়ে চালাতে পারবে? তার কাছে আরো তো কিছু নগদ টাকা ছিল। তা-ও বা কেন চাইল না?

বলল না কেন মুখ ফুটে? বলল না কেন, আমি সব চাই? যা তুমি দিতে পার শেষ বিন্দু পর্যন্ত!

ট্র্যাম ড্যালহৌসি স্কোয়ার ঘুরে চলল। কণ্ডাকটর এসে ফের ভাড়া চাইলে।

কেন পালিয়ে গেল দরজা খুলে? তামসীর কাছে তার কিসের লজ্জা, কিসের লুকোচুরি? এমন কী পাপ সে বহন করছে যা স্খালন হতনা ভালবাসায়? কেন একটু বসল না, বুঝল না মনে-মনে? ডাকাতি করতে এসে কেন চোর হয়ে চলে গেল? বাকি জীবনে আর দেখা হবে না এই বুঝি তার আশা, কিন্তু আশাহীন সমস্ত বাকি জীবনটাই তো সে নিয়ে যেতে পারত সঙ্গে করে! ঘৃণার মাঝেই সে মুক্তি খুঁজতে গেল, কিন্তু ঘৃণার প্রথম প্রতিবেশীই তো প্রেম।

ভাটির লাইনে ফিরে চলেছে ট্র্যাম।

ভাল করে খেতে পাবেনি। যেন খিদে লাগে না। ঘুমুতে পারেনি নিশ্চিন্ত হয়ে। যেন থেকে-থেকে উঠে দেখেছে, তামসী ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা। প্রায় রাতেই বোধহয় এমনি হয়। তার ঘুম আসে না। তার কী যেন কঠিন অসুখ হয়েছে অনেকদিন। নইলে কত অন্ধকার দুর্দিনের মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছে সে পথ করে। কোনো দিন এমন অস্থির হয়নি। বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে বিপদের সামনে। লজ্জা-নিন্দাকে পায়ের তলায় পিষে ফেলে মিশিয়ে দিয়েছে মাটির সঙ্গে। এমন কোনোদিন ছিল না রণবীর। এমন সে হতে পাবেনা কিছুতেই। না, নিশ্চয়ই তার কোনো অসুখ করেছে। রাত্রে নিশ্চয়ই তার খুব জ্বর এসেছিল। মেসে থাকতে তাকে মাঝে-মাঝে নিশি পেত, বেরিয়ে যেত ঘুমের মধ্যে। নিশ্চয়ই তাকে নিশি পেয়েছে।

এই থানা! ঝপ করে নেমে পড়ল তামসী।

নিশ্চয়ই ধারে-কাছে ঘুর-ঘুর করছে। দুষ্টুমি করে দেখছে সত্যিই তামসী থানায় এতলা দিতে আসে কিনা। তার পিছনে তামসীই পুলিশ ছেড়ে দেবে, যে তামসী একদিন তাকে এই পুলিশের থেকে বাঁচাবার জন্যেই দাঁড়িয়েছিল বুক বেঁধে। বলা যায় না, দিন-কাল বদলে যাচ্ছে দিনে-দিনে। গৃহস্থের টাকা-পয়সা বেশি হলেই পুলিশের জন্যে মায়া হয়। দেখা যাক তামসী কী করে। আমি আছি এই কাছাকাছি।

নিশ্চয়ই কাছে-পিঠে কোথাও আছে। যেই সে পা রাখবে থানার সিঁড়িতে, অমনি রণধীর স্মিতকণ্ঠে ডেকে উঠবে: তামসী! ধরে ফেলেছি তোমাকে। ছি, শেষকালে আমার নামে তুমি থানা-পুলিশ করলে! একে এমনি দু'দণ্ড শান্তি নেই বিশ্রাম নেই, তায় পুলিশ লাগালে পিছনে?

তামসী ফুটপাতে অপেক্ষা করতে লাগল। ব্যস্ত হয়ে তাকাতে লাগল চারপাশে। এর-ওর মুখের দিকে। ছল করে লুকিয়ে আছে, দেখা হয়ে যাবে এখুনি।

হাঁটতে লাগল দক্ষিণে। হাঁটতে-হাঁটতেই দেখা হয়ে যাবে তার সঙ্গে। বলবে, বাক্সটা নেই, কিন্তু আমি আছি। বাক্সর কথা কে জিগগেস করবে?

কে জানে, বাড়ি গিয়েই হয়তো দেখতে পাবে, বসে আছে চুপচাপ। যেন কিছু হয়নি এমনি সাদাসিধে সরল মুখ। তামসীও ভুল করে জিগগেস করবে না, কোথায় ছিলে এতক্ষণ? সে জানে, কোথায় রণধীর ছিল। আর-সব জায়গা দেখা হলেও খাটের তলাটা যে দেখা হয়নি এতক্ষণে মনে পড়ল তামসীর। রণধীর যে খাটের তলায় লুকোয় এ কথাটাই তার মনে নেই। এমন আশ্চর্য ভুলও হয়!

ঝি বললে, 'আজ কি আর আপিস যেতে হবে না ?'

শ্রান্তিতে ভেঙে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল তামসী, ঝির ডাকে ধড়মড় করে উঠে বসল। বা, আপিস যেতে হবে বৈ কি। এ যে দেখছি অনেক বেলা হয়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি দুটো খেয়ে নিয়ে আবার বাইরে বেরুল তামসী। কলকাতায় এত লোক সে আর দেখেনি, এত ধরনের জামা-কাপড়, এত রকমের গলার আওয়াজ। ট্র্যামের জানলা থেকে এত দৃশ্য যে দেখবার আছে, প্রত্যেকটি মানুষের মুখে এত বিচিত্র ইতিহাস, এ কে জানত। অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছে বুঝি তামসী। তার ট্র্যাম যে আপিস-পাড়া পার হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, সে জানে। যাচ্ছে সে স্ট্র্যাণ্ড রোডের দিকে। ঠিকানাটা আরেকবার সে দেখে নিল। দেখে নিল তারই লেখা সেই চিঠিটার থেকে।

অনেক অন্ধি-সন্ধি খুঁজে বের করলে সে নম্বরটা। দোতলার উপরে ভিতর দিকে ছোট্ট একটা ঘর। দেয়ালে সার্ভিস সিকিউরিং বুরো-লেখা ছোট্ট সাইনবোর্ড আঁটা। এক দরজার ঘর, কিন্তু তালা বন্ধ।

'এ দোকান কখন খোলে জানেন ?' কাছে-দাঁড়ানো জিজ্ঞাসু কয়েকজন ভদ্রলোককে জিগগেস করলে তামসী।

'আজ সাতদিন ধরে নানান বিচিত্র সময়ে আসছি, কখনো ঘর খোলা পাচ্ছিনা।'

'পাচ্ছেন না ?' তামসী পাংশু হয়ে গেল।

'আপনিও ঠকেছেন বুঝি দশ টাকা ?' উত্তরদাতা ভদ্রলোকের মুখে সমবেদনা ফুটে উঠল।

'না, ঠকব কেন ? আমাকে তো জুটিয়ে দিয়েছেন চাকরি।'

'জুটিয়ে দিয়েছেন ? বলেন কি ?'

'সে তো কবেই জুটিয়ে দিয়েছেন। আপিস যখন বউবাজারে ছিল। এ কি আজকের আপিস? বহু দিনের বনেদী ফার্ম।'

'আপনি কোথায় কাজ করেন জিগগেস করতে পারি কি?'

'জ্ঞানাঞ্জন কটন মিলসের পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্টে।'

'ও, হ্যাঁ।' ভদ্রলোক স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। 'তা হলে একেবারে ঠক নন বলতে চান?'

'কি বলেন! আমরাই বরং ঠকাচ্ছি ফার্মকে। দশ টাকা তো শুধু রেজিস্ট্রেশন-ফি। তারপর চাকরি পাকা হয়ে গেলে মাইনের অনুপাতে ফার্মকে একটা বোনাস দেবার কথা। কেউ বিশেষ দিচ্ছে না, কাজ ফুরিয়ে গেলেই সরে পড়ছে। আমি কিন্তু এসেছিলুম আমার বোনাসটা দিয়ে দিতে, অবিশ্যি গোটা কতক রিমাইণ্ডার পাবার পর।'

'বলেন কি! আমরা তো ভাবছিলুম পুলিশে খবর দেব।'

তামসী স্নেহময় উপেক্ষার হাসি হাসল। বললে, 'আমাদের সবতাতেই বাড়াবাড়ি। সবতাতেই অবিশ্বাস।'

কে একজন বললে, 'পুলিশে খবর দেয়া আর বাকি নেই। খুঁজছে পুলিশ। ঐ গিরীন হালদার লোকটা নাকি আরো অনেক খুচবো ক্রাইম করেছে।'

কে গিরীন হালদার! ঐ গিরীন হালদারকেই তো তামসী চিঠি লিখেছিল। আর সেই চিঠিই তো রণধীরের পকেটে।

'মাছির কি। ঘায়ের গন্ধ পেলেই উড়ে বেড়াবে। কিন্তু ভদ্রলোক হয়তো বাড়ি গেছেন কোনো জরুরি খবর পেয়ে আর অমনি তার পিছনে আমরা পুলিশ ক্ষেপিয়ে দিলুম।' তামসী অপরাধীর মত হাসল।

'আর যা শুধু দড়ি তাই পুলিশ মনে করে সাপ!' আর-সবাই সমর্থন করলে।

দু'দিন তামসী আপিস গেল না। তৃতীয় দিন সন্ধে বেলা তার দরজায় টোকা পড়ল। নিজেকে উত্তেজিত হতে দিল না তামসী। হ্যাঁ, যা সে ভেবেছে, অন্য লোক, কালিকিংকর। আপিসের কেরানি। সঙ্গে একটা চিঠি।

'এই চিঠিটা আপনার উপর সার্ভ করতে হচ্ছে।'

চিঠিটা নিযে বিতৃষ্ণের মত খুলে পড়ল তামসী। তেমন কিছু নয়। চাকবি থেকে জ্ঞানাঞ্জন তাকে সরাসবি বরখাস্ত করে দিয়েছেন।

'এই ? এরি জন্যে কাগজ-কালি খরচ করবার দরকার ছিল না।' খোলা চিঠিটা তামসী ফেলে দিল মেঝের উপর।

'আপনার চাকরিটা ঠিক চাকবি ছিল না, খোসখেয়ালের জিনিস ছিল, তাই নোটিশ পেতে পারেন না আপনি। আগাম কোনো মাইনে পাবারও আপনার অধিকার নেই।'

'কষ্ট করে মনে না করিয়ে দিলেও চলত।'

'হ্যাঁ, এই আরেকটা চিঠি আছে। কষ্ট করে এ বাড়ি-ঘর ছেড়ে যেতে হবে আপনাকে।'

দ্বিতীয চিঠিটা পড়ে রাগে জমাট হয়ে উঠল তামসীর গায়ের রক্ত।

তাকে বলা হয়েছে, এক্ষুনি, পত্রপাঠমাত্র বাড়ি থেকে উঠে যেতে হবে।

'হ্যাঁ, এ ক্ষেত্রেও আপনি নোটিশ পেতে পারেন না।' কালিকিংকর অনুভূতিহীন আইনের ভাষায় বললে, 'আপনি টেনাণ্ট নন, আপনি লাইসেন্সি। আপনার কোনো স্বত্ব নেই এ বাড়িতে বাস করবার। আপনাব দখল শুধু একজনের দয়ার উপরে। সে দয়া শুকিয়ে গেছে। তাই মুখের কথাতেই আপনাকে এখন বেরিয়ে যেতে হবে।'

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল তামসী। বললে, 'আমারও মুখের কথাটা

তবে শুনে রাখুন। আমি যেতে পারব না এ-বাড়ি ছেড়ে। মানে, যতক্ষণ না আমি আরেকটা আস্তানা পাই। পথেও যদি নামতে হয়, যতক্ষণ না পাই পথচলার সঙ্গী। কিছুকাল আমাকে এখানে অপেক্ষা করতে হবে।'

তার এই বিদ্রোহবাণী শুনে থমকে রইল কালিকিংকর। এতটুকু ভয় নেই উদ্বেগ নেই, নিঃসংশয় নিঃস্বতার দীপ্তিতে জ্বলছে। বললে, 'জোর-করে বাড়িতে থাকবেন আপনি?'

'জোর করে শুধু তাড়িয়েই দেয়া যায় না, জোর করে দখল করেও থাকা যায়।'

'তা হলে আমাদেরকে আইনের আশ্রয় নিতে বলেন?'

তামসী স্নিগ্ধ মুখে হাসল। বললে, 'হার-না-মানা লোককে আইনের ভয় দেখানোর কোনো মানে নেই।'

তামসী ভেবেছিল সমরেশ একদিন আসবে খোঁজ করতে। এসে একটা কিছু আশ্রয়ের সন্ধান দেবে। তার বিদ্রোহের পিছনে রাখবে বন্ধুতার সমর্থন। কিন্তু না, সমরেশের জীবনের মানচিত্র থেকে এ রাস্তাটা মুছে গিয়েছে। তার চাকরির চেয়ে বড় আর কিছু নেই।

সন্ধে বেলা বাড়ি ফিরে এসে দেখে, এ কী কাণ্ড। বাড়িতে অনেক মুটে-মজুরের আনাগোনা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটা লরি, সিঁড়ির মুখে আপিসের কটা দারোয়ান। ঘরের মধ্যে কালিকিংকর। ঘরময় জিনিসপত্র ছড়ানো-ছিটানো, বই-খাতা, শিশি-কৌটা, যত রকমের টুকিটাকি। কাঁচের গুঁড়োর জন্যে মেঝেতে পা রাখতে ভয় করে। আলনা থেকে শাড়ি-জামাগুলো পর্যন্ত ফেলে দেওয়া হয়েছে মেঝের উপর, খাট থেকে গদি আর বিছানা। সমস্ত ঘরময় একটা তাণ্ডবের চেহারা।

'এ ঘরের কোনো ফার্নিচারই আপনার পয়সায় নয়, তাই এগুলো সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।' বললে কালিকিংকর। 'আপনার নিজের জিনিসগুলো দেখে রাখুন। ওতে আমাদের হাত দেয়া বারণ। আর দয়া করে আলমারিটা খুলে দিন, সরিয়ে নিন ওর ভিতরের জিনিস।'

'কোনো জিনিসই আমার নিজের নয়।' তামসী দৃঢ় অথচ উদাসীন গলায় বললে, 'গোটা আলমারিটাই তাই নিয়ে যেতে পারেন।'

'তা হয় না। দয়া করে চাবিটা দিন।'

'চাবি নেই। ইচ্ছে করলে চাড় দিয়ে ভেঙে ফেলতে পারেন দরজা।'

কালিকিংকর বাক্যব্যয় করল না। যা পারল তা দিয়ে লরি বোঝাই করল, চেয়ার টেবিল সোফা কৌচ খাট আলনা কিছুই বাদ দিল না। শুধু শূন্য ঘরে শরীরী ভূতের-মত আলমারিটা রইল দাঁড়িয়ে। কাঁচের গুঁড়ো সরিয়ে মেঝের উপর শুয়ে রাত্রে যখন ঘুমুলো তামসী, স্বপ্ন দেখল আলমারিটা হাঁটছে ঘরের মধ্যে, মানুষের চেহারায়, দরজা খুলে বাইরে বেরুতে পাচ্ছেনা, হাতে তার গয়নার বাক্স।

পর দিন ঝি এল না। চাকর আগেই সরে গেছে।

তবু তামসীর ভঙ্গি নত হয় না, বলে, দেখি কে আমাকে এখান থেকে উৎখাত করে।

বাড়ির বাইরে সে বেশি থাকে না, আবার না থাকলেও দেখা যায় না খুঁজে-খুঁজে। কে জানে কখন চকিতে কার সঙ্গে কোথায় দেখা হয়ে যায়। থেকে-থেকে শুধু ঘর আর বার করে তামসী।

এক দিন দুপুরবেলা সে ফিরে আসছে, দেখলে দরজায় মোটা তালা আঁটা। তার সমস্ত স্পর্ধার উত্তরে নীরবনিষ্ঠুর অট্টহাস্য।

কুড়ি

ঘরের কোণের অন্ধকারটা যেন বেশি স্পষ্ট মনে হল, বেশি নিশ্চল। কেমন-যেন ভারী একটা স্তব্ধতা জমে উঠেছে শক্ত হয়ে।

একটু ভয় পেল অধিপ। বললে, 'কে ?'

কোনো উত্তর নেই।

হাত বাড়িয়ে আলো জ্বালল। তামসী! একটা ন্যাড়া কেঠো চেয়ারে নিস্পন্দ হয়ে বসে আছে। যেন ঝড়ের মধ্য দিয়ে পথভ্রান্ত একটা পাখি উড়ে এসেছে। ছিন্নপক্ষ। এ তার কি চেহারা, কি বেশবাস! অধিপ খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইল। সত্যিই চিনবে কিনা ঠিক করতে পারল না।

'এ কি, আপনি এখানে ?'

'দরজা খোলা পেলুম আর অমনি ঢুকে পড়লুম।' তামসী শুকনো মুখে হাসল : 'আজ যে দিকে তাকাই দেখতে পাই দরজায় তালা আঁটা।'

ভাগ্যিস ঘর তখন খোলা রেখে গিয়েছিলুম! তাই কি বলবে অধিপ উচ্ছ্বসিত হয়ে? আত্মহারা হয়ে? না, বলবে, আবার কেন এই প্রত্যাখ্যাতের আস্তানায়? গলার স্বরে ফোটাবে নাকি সেই অভিমানের উগ্রতা?

কি বলবে বুঝতে পারছেনা। শুধু বললে, 'আপনার কী হয়েছে ?'

'সব চুরি হয়ে গিয়েছে।'

এবারও হাসতে চেয়েছিল তামসী, কিন্তু আশ্চর্য, হাসি ফুটল না। কেমন যেন নাকে-কাঁদুনে শোনাল কথাটা। নিজের কানে শুনে নিজেরই লজ্জা করতে লাগল। এত সব ঘটে যাবার পরেও তার শুধু সেই চুরি যাবার কথাটাই মনে হচ্ছে। আহা, কী এমন তার চুরি হযেছে না-জানি। গিয়েছে তো ক'টা নোংরা গয়না, তার পাবলিসিটির পোস্টার! একজনের লেলিহচক্ষুর লোভোজ্জ্বল চাহনি। গিয়েছে তো বেঁচে গিয়েছে। পবিত্র হয়েছে, স্বাভাবিক হয়েছে। ফিরে পেয়েছে তার মৌল অখণ্ডতা। প্রেম যখন যায়, তখনও প্রেমের মতই একটা বড় জিনিস এসে বুকে বাজে। সেই বাজাটাকে সে বাজনা করে দেখবে না কেন? যা সত্যিই মুক্তি তাকে সে চুরি বলবে কোন দুঃখে?

'কী চুরি হযেছে?'

'না, চুরি নয়।' স্বচ্ছ মুখে হাসল এবার তামসী। বললে, 'চাকরিটা শুধু গেছে। আর, যে-বাড়িটায় ছিলুম সেখান থেকে ঘাড়-ধাক্কা খেয়ে বার হয়ে গেছি।'

'তার মানে?'

সংক্ষেপে সব বললে তামসী। শুধু রণধীরের কথাটা জোর করে চেপে গেল। উৎপীড়ক নিঃসহায়ের উপর প্রবল নির্যাতন করছে এ বর্ণনায় জৌলুস আছে, যে আসলে অক্ষম তারও তখন স্পর্ধার শেষ নেই। কিন্তু যাকে সমস্ত-কিছু দিয়ে দিতে পারি, সে সমস্ত-কিছু ফেলে তুচ্ছ ক'টা গয়নার টুকরো নিয়ে পালিয়ে গেল এ বর্ণনার মধ্যে লজ্জা ছাড়া আর কী আছে! একদিকে প্রপীড়ক অন্যদিকে প্রপীড়িত—এ কাহিনীর মধ্যে নাটকীয় ঔজ্জ্বল্য আছে; কিন্তু একদিকে এক চোর অন্যদিকে এক ভিক্ষুক—এ কলঙ্ক-কথা কাউকে বলতে যেয়ো না।

'তারপরে বেরিয়ে এসে দেখলুম যাবার কোথাও জায়গা নেই। ভাবলুম আপনি আছেন।'

ভাবলুম, আপনি আছেন! মুহূর্তে নিজেকে অধিপের অনেক বড় মনে হল, অনেক বলশালী। যেন অনেক ডাল-পালা-মেলে-দেওয়া বিশাল বনস্পতি। অনেক বেড়ে গেল তার দায়িত্ব, তার আশ্রিত-সৌজন্য। তার ছায়ামণ্ডল। হৃদয়ের মধ্যে সে এক নতুন শক্তি, নতুন স্তব্ধতা অনুভব করলে। নিষ্কামতার স্তব্ধতা। আপনি আছেন! নিজের থাকার এত বড় স্বীকৃতি আর কখনো খুঁজে পায়নি নিজের মধ্যে।

'কিন্তু না, এ কিছুতেই সহ্য করা যাবে না।' তক্তপোষে বসা ছিল অধিপ, ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়াল: 'এর শোধ নিতে হবে।'

'কী ভাবে?' ফিকে চোখে জিগগেস করলে তামসী।

'চাকরি নিয়েছে নিক, কিন্তু বাড়ি থেকে মুখের কথায় তাড়িয়ে দেয় কোন আক্কেলে? জানি, বাড়িতে থাকবার আপনার স্বত্ব ছিল না, তাই বলে নিজের হাতে আইনের লাগাম তুলে নিতে পারে না জ্ঞানাঞ্জন। ইচ্ছেমত মুখের উপর বন্ধ করে দিতে পারে না দরজা। না, আপনি উঠুন, চলুন আমার সঙ্গে।'

'কোথায়? অধিকার সাব্যস্ত করে ঢুকব গিয়ে আবার সেই ঘরে? সেই অসত্যের আশ্রয়ে?'

'না, থানায় যাব আমরা। জ্ঞানাঞ্জনের নামে পুলিশ-কেস করব।'

'বসুন। উত্তেজনাটা বিফল হতে দেবেন না।' উদাসীনের মত হাসল তামসী।

না, উত্তেজনটা উপেক্ষা করবার নয়। এত দিন কোনো-কিছু কাজ পায়নি অধিপ যার মধ্যে সে মন লাগাতে পারে। ঢেলে দিতে পারে সমস্ত প্রকৃতি। বড় বেশি নিরর্থের মত তার দিন কেটেছে। ছন্দহীনের

মত। আজ হঠাৎ যেন সে নিজেকে আবিষ্কার করল। খুঁজে পেল তার ভঙ্গির তেজস্বিতা। আপনি আছেন! রক্তের মধ্যে শুনতে পেল সেই জীবনের ঘোষণা।

অধিপ বসল না। যেন পারবে না সে আর স্থির হয়ে বসতে। তার সেই মদিরমন্থর আলস্যের মুহূর্তগুলি যেন উড়ে গিয়েছে ঋতুবদলের পাখির মত। সে এখন মেঘলেশলীন তপ্ততাম্র আকাশের মত খাঁ খাঁ করছে। দুঃসহ জ্বালা জ্বলছে তার রক্তের মধ্যে। অন্যরকম জ্বালা। একটা প্রবল প্রতিপক্ষতার সঙ্গে ক্ষমাহীন সংঘর্ষে নিজেকে ব্যক্ত, পরিব্যাপ্ত করার আর্তনাদ।

'অন্যায়ের যখন দেখা পেয়েছি মুখোমুখি, তখন তাকে আর ছেড়ে দেয়া হবে না। হাতের কাছে মার দেবার মত অন্যায়ের দেখা পাওয়াটাও একটা সৌভাগ্য। না, আপনি উঠুন।'

তামসী এতটুকু গা করল না। একটি শান্ত স্থৈর্যে নিজেকে সংবরণ করে রইল। বলল, 'নিজের ছোট স্বার্থের ওজুহাতে নিজের লাঞ্ছনার বিজ্ঞাপন দিতে রুচি নেই। জিনিসটাকে বড় করে দেখি। নিজের মাঝে দেখি এবার জনতাকে। আমার উচ্ছেদের মাঝে সমস্ত বিতাড়িতের অপমান।'

'তাই বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারেন না আপনি। অন্যায় যত তুচ্ছ হয়েই আসুক তা অন্যায়। অন্যায় যে করে, তার চেয়ে অন্যায় যে সহ্য করে, তার অন্যায়টাই বেশি।' অধিপ ঘরের মধ্যে অস্থিরের মত কয়েক পা পাইচারি করে নিল। বললে, 'জনতা করে আপনার জন্যে রাস্তায় এসে দাঁড়াবে তার অপেক্ষায় ঘরের মধ্যে বসে থাকলে চলবে না। নিজেকে আজ আপনার দাঁড়াতে হবে জনতার প্রতিভূ হয়ে। দৃষ্টান্ত দেখাতে হবে আপনাকে। মুখ বুজে যে সহ্য

কর্মী যায় না তার দৃষ্টান্ত। আপনি যে তাদেরই লোক, জনতা নইলে চিনবে কি করে ?'

তামসী প্রথম চন্দ্রলেখার মত একটু হাসল। বললে, 'আপনার চাকর কোথায় ?'

সমস্ত সুর যেন কেমন হালকা হয়ে গেল। অধিপ ঢোঁক গিলে বললে, 'বাইরে কোথাও গেছে হয়ত। কেন, কি দরকার ?'

'বা, একটু চা করে দেবে না ?' তামসী মোহমাখানো চোখে বললে। যেন বসবার ভঙ্গিটা আরো একটু শিথিল করলে। 'কতক্ষণ ধরে চুপচাপ বসে আছি বলুন তো !'

অলক্ষ্যে অধিপের ভয় করে উঠল। চকিত চোখে তাকাল তার মুখের দিকে। সম্পূর্ণ আলো পড়েনি মুখের উপর। মনে হল সে মুখে যেন গৃহকোণের প্রদীপের স্নিগ্ধতা, রৌদ্ররুক্ষ দিনের শুষ্কতা নেই। অধিপের ভয় করে উঠল। তার রেখা যেন নিস্তেজ, ভঙ্গি স্ফূর্তিহীন। অগ্নিকোণে যে একটুকরো মেঘ দেখেছিল আকাশে, কে জানে, হয়তো তাতে ঝড় নেই সংহৃত হয়ে, আছে বা শুধু ঘুমপাড়ানির বৃষ্টি। পাখা-ঝাপটানো যে-একটা শিকারী শ্যেন দেখেছিল, সে হয়তো আসলে একটি কলহংস।

না, না, তা হতে পারে না। তা কি করে হয় ?

'চা-টা পথেই কোথাও নেয়া যাবে। চলুন, দেরি করে কোনো লাভ নেই।'

'কত দিন দেরি করতে হয় তার ঠিক কি।' তামসী বললে প্রায় তন্ময়ের মত। 'এক পেয়ালা চায়েতেই তো শুধু চলবে না, রাত্রে ভাত খেতে হবে, ঘুমুতে হবে, নিশ্চিন্ত রাত্রির পর পেতে হবে নতুন দিনের আরম্ভ। এমন কত দিন তা কে বলতে পারে ?' আলোয় মুখ সরিয়ে

এনে চোখে ঝিলিক দিল তামসী : 'তার ব্যবস্থা করতে হবে না? আমাকে নিশ্চয়ই মেঝেতে শুতে দেবেন না, তাই আর একটা বিছানা দরকার। আর, দেখতেই তো পাচ্ছেন, দ্বিতীয় কাপড়-জামা নেই সঙ্গে, তাই—' অসহায়ের মত অনুচ্চারিত বেদনায় তামসী হাসল।

'এইখানে থাকবেন আপনি?' চারদিকে উত্তাল অন্ধকার দেখল অবিপ।

'নইলে আমাকে ফুটপাতে থাকতে বলেন? কেন, আমি কি ভিখিরি, না, চোর, না, গাঁটকাটা?'

'তা কেন। তাই বলে আমার এখানে? আমি একেবারে একা—'

'আপনার ভয় নেই। আমিও একেবারে মুক্ত।'

এত সাহস এত শক্তি কোত্থেকে পেল তামসী? পেয়েছে তার অপমানে, তার পরাভবে, তার সমস্ত-কিছু-হারিয়ে-ফেলার আকস্মিকতায়। তার আজ কিছুই যে নেই এটাই তার প্রকাণ্ড অহংকার, প্রচণ্ড ক্ষমতা। আর, যার এত সাহস এত স্বাধীনতা, তার জন্যে অধিপের ভয় কিসের?

না, ভয় তার ঐ বেদনাবিদ্ধ চোখকে, রমণীয় রিক্ততাকে ; কে জানে, হয়তো বা তার উদ্দীপ্ত ঔদ্ধত্যকেই। কে জানে, হয়তো ঐ চোখ নিয়ে আসবে অন্ধকারের মদিরা, রিক্ততা চাইবে প্রসন্ন পুষ্পভূষণ আর এই ঔদ্ধত্য নিয়ে আসবে হয়তো বা আবেগের আবিল্য। দুশ্চর তপস্যার কাঠিন্য যাবে কাদা হয়ে। প্রাণপণ শক্তিতে মনে যে মরুবিস্তার করেছিল হয়তো অলক্ষ্যে সেখানে শষ্পশয্যা রচনা হবে। অধিপ থমকে দাঁড়াল।

বললে, 'আমার ভয় কি। আমি পুরুষ। আমি নির্দায়িক।'

'আরো বলুন। আমি বাঘ, আমি ভালুক, আমি চোর, আমি

ডাকাত। যাই বলুন, বাঘ-ভালুকও মানুষকে ভয় পায়, আর, চোর-ডাকাতের কথা বলবেন না দয়া করে। চোর-ডাকাত ঢের দেখা আছে আমার। জানা গেছে তাদের মুরোদ কত।'

'কিন্তু থাকবেন যে, কী বলে সান্ত্বনা দেবেন নিজেকে? মৌখিক একটা চাকরির চুক্তিও আজ নেই আমাতে-আপনাতে।'

তামসী নির্মল মুখে হাসল। বললে, 'সেইটেই সান্ত্বনা। আজ আর কোনো ছদ্মবেশ নেই, গোঁজামিল নেই। আজ আমরা সমান-সমান। আমার-আপনার দুই পাশের দুই ঘরের মধ্যেকার দরজা আজ দুইদিক থেকে খোলা। এক দিকে বিশ্বাস আরেক দিকে বন্ধুত্ব।'

অধিপ তামসীর চেয়ারের কাছে এসে দাঁড়াল।

তামসীই বললে, 'আজ আমরা মুখোমুখি নয়, পাশাপাশি। আজ আর চাকরি নয়, কাজ, কাজ। আপনি মুনিব আমি চাকর, আপনি লুব্ধ আমি ক্ষুব্ধ—এ আমাদের পরিচয় নয়। আপনিও কর্মী আমিও কর্মী, এই আমাদের বন্ধনহীন সম্বন্ধ। এই সমকর্মিতা, সহকর্মিতা। কি, রাজি?'

রাজি, রাজি। উল্লসিত হয়ে উঠল অধিপ। কাজ, কাজ, কাজ। ছোট কাজ, বড় কাজ, অনেক কাজ। অনেক কাজেই দেশের কাজ। ভাঙবার কাজ, গড়বার কাজ। স্বপ্ন দেখার কাজ। স্বপ্নকে সত্য করার কাজ।

'তবে এখন থেকেই কাজ আরম্ভ করে দি।' অধিপ স্থিরপ্রতিজ্ঞের মত বললে।

'কি, চায়ের জন্যে জল গরম করছেন?'

'তা করছি। কিন্তু প্রথমেই থানায় চলুন। জ্ঞানাঞ্জনের নামে এজাহার করুন গে দারোগার কাছে। আমি আছি, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ান জোর করে।'

'আপনি থাকলেও যে উঠে দাঁড়াতে পারব এমন মনে হয় না।' তামসী হাসল। 'ডান পাটা আমার অসম্ভব কেটে গিয়েছে।' বলতে-বলতে বাঁ হাঁটুর উপর ডান পা সে তুলে দিল। ডান পায়ের গোড়ালি ঘিরে মস্ত ব্যাণ্ডেজ।

'কি করে কাটল?'

'আর বলবেন না! ঘরময় ভাঙা কাঁচের টুকরো। তাণ্ডবের অবশেষ। ঝাঁট দিয়ে মেঝেতে একটু শোবার জায়গা করতে পারি এমন ফাঁক নেই। কোন ফাঁকে পদাঘাত করে বসেছি খেয়াল করিনি। রাগটা বেশি ছিল বলে পদাঘাতটাও প্রবল হয়েছে।'

নিচু হয়ে ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে অধিপ জিগগেস করলে, 'কি, ভিতরে আছে নাকি কাঁচের টুকরো?'

'বোধহয় নেই। কিন্তু যন্ত্রণায় পা এখন ছিঁড়ে পড়ছে। সারাদিন এই কাটা পায়ে ঘুরে বেড়িয়েছি, আর এখানে, এতক্ষণ এই পা ঝুলিয়ে বসে থাকার দরুন একেবারেই নাড়তে পারছি না। ও কি, পায়ে হাত দিচ্ছেন কি বলে? মনে নেই, আপনার জ্বরের সময় আপনার কপালে আমি হাত দিইনি?'

'আপনি বসুন, আমি একজন ডাক্তার নিয়ে আসি।'

'আপনার কি বুদ্ধি। ডাক্তার এসেই প্রথমে গরম জলের খোঁজ করবে। তাই আগে উনুন ধরিয়ে জল চাপান। আর, জল যদি গরমই হয় তবে চা এক বাটি খেয়ে নিতে দোষ কি।'

সত্যিই তো। কিন্তু নিশি কোথায়? উনুন যে ধরানো হয়নি এখনো।

'কে, আপনার চাকর? আমাকে বসিয়ে রেখে চলে গেল বাইরে। বলে গেল, রাত্রে আজ আর রাঁধবনা, হোটেল থেকে বাবুর ভাত নিয়ে আসব।'

'কী সর্বনাশ! আপনার তবে খাওয়া হবে কি করে?'

'খাওয়ার চেয়ে পা টান করে শুয়ে পড়ারই আমি বেশি পক্ষপাতী। সত্যি, দিন না কোথাও একটা শোয়ার জায়গা করে। সমস্ত পাটা একেবারে খেয়ে যাচ্ছে।'

ঘরের চারদিকের আনমনা বিশৃংখলাগুলো তাকিয়ে রইল অসহায়ের মত। ব্যস্ত হাতে অধিপ তাদের সংস্কার করতে বসল, হয়তো বা একটু সুন্দর করতে বসল। বিছানাটা পেতে ফেললে। চাদর বদলাল। বালিশের অড় বদলাল একে-একে। তৃপ্ত চোখে তামসী দেখতে লাগল একটি সংগঠনের কাজ। একটা মৃত-মলিন ঘর কি ভাবে পুনর্জীবিত হয়ে উঠছে। ভুলে যাচ্ছে তার অপরিচ্ছন্ন অতীত, গুরুভার বিষণ্ণতা। চলে আসছে নব জীবনের উপকূলে। চাই সেবার স্পর্শ, স্নেহের স্পর্শ, স্বার্থহীন কর্মের স্পর্শমণি।

আজ মধ্যরাত্রে থেকে-থেকেই অধিপের ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। পাশের ঘরে মেঝের উপর শুকনো মাদুর পেতে শুয়েছে বলে নয়, বারে-বারে একটা কথা মনে করে নিজেকে চমকে দেবার জন্যে। কী যেন আশ্চর্য কী ঘটেছে সেটাকে লুকিয়ে-লুকিয়ে অনুভব করার জন্যে, কী যেন আশ্চর্যতর আরো ঘটবে তাকে অস্পষ্ট চেতনায় অন্বেষণ করবার জন্যে।

দুই ঘরের মাঝখানে দরজাটা খোলা রয়েছে। দরজাটা বন্ধ হয় তামসীর দিক থেকে। তবু তামসী এতটুকু ব্যস্ত হয়নি। বলেছে, এক দিকে বিশ্বাস, আরেক দিকে বন্ধুত্ব। ভাবতে অদ্ভুত লাগে অধিপের। এত তেজ এত দীপ্তি সে কোথা থেকে সংগ্রহ করে আনল, আত্মার কোন রত্নাকর থেকে? স্পর্শসংকোচপত্রিকা ছিল, আজ হয়ে উঠেছে নির্বারিত অসিপত্রিকার মত। রিক্ততার মধ্যে এত শক্তি এত সৌন্দর্য ছিল তা কে জানত? কিন্তু অধিপকে তার বিশ্বাস হল কিসে, কিসের

উৎসাহে? ব্যাণ্ডেজশুদ্ধ পা যখন সে তুলে ধরেছিল তখন তা ছোঁবার জন্যে সে ব্যস্ত হয়ে হাত বাড়িয়েছে, আর হাত রাখতে চেয়েছে পায়ের অনাবৃত অংশটুকুর উপরে। অবচেতন মনে হয়তো আজো সেই ইচ্ছাটিই আছে যে একটি অতর্কিত অথচ স্পন্দময় স্পর্শেই সে তার গভীর আকুতি প্রকাশ করতে পারবে। ডাক্তার যখন পা ধুয়ে বেঁধে দেবার পর প্রেসক্রুপশানে কী নাম লিখবে জিগগেস করেছিল, তখন অধিপ কেন তার নাম বলেনি, কেন বলেছিল যা হয় লিখে দিন একটা? তার গহন মনে তখন কি এই অজানিত ইচ্ছাই ছিল না ডাক্তার মিসেস মজুমদার লিখবে? নইলে শুতে যাবার আগে বারে-বারে তামসীকে সে এই একই কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল কেন, মাঝখানের দরজাটা তামসীর দিক থেকে বন্ধ হয়, কষ্টেসৃষ্টে হলেও যেন একবার উঠে খিল চাপিয়ে দিতে সে না ভোলে। না, বিশ্বাস নেই অধিপকে।

না, তেমন কিছু বিশ্বাস নিয়েও তামসী আসেনি। ধরা দেবার জন্যেই এসেছে। ঝড়ের তাড়া-খাওয়া দেয়ালের কোণ-ঘেঁসা পাখির ছানার মত। এসেছে স্পর্শের উত্তাপে স্বাস্থ্য ফিরে পেতে। তাই ডাক্তার যখন নাম লিখেছিল প্রেসক্রুপশানে, তামসী মুখ টিপে হেসেছিল, বলেছিল, যা-হোক, মর্যাদা দিয়েছেন আমাকে, চিরন্তনী কুমারী ভাবেন নি। কে জানে হয়তো বা এসেছে ফিরে-না-যাওয়া ঢেউয়ের মত, নিজের উত্তেজনায়। সীমাতিক্রান্ত হয়ে। তাই অধিপ যখন বলেছিল দরজাটা বন্ধ করে দিতে, তামসী বলেছিল উত্তরে, বন্ধ করতে হলে আপনাকেও চলে আসতে হয় এ-ঘরে। আমার এমন সাধ্য নেই বিছানা ছেড়ে নেমে দাঁড়াই।

'কী সাহসে আমার কাছে আপনি এলেন?' স্পষ্টাস্পষ্টিই জিগগেস করেছিল অধিপ।

'আমি সেদিন যখন চলে যাই আপনার বাড়ি থেকে, আপনার মনে আছে কিনা জানিনা, আপনি সিঁড়িতে আলো জ্বেলে ধরেছিলেন। অবাধে চলে যেতে পারি তার পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন। থেকে-থেকে সেই সিঁড়িটাকে আমার মনে পড়েছে। ডেকেছে আমাকে সিঁড়িটা। মনে হয়েছে, আবার অবাধে সিঁড়ি বেয়ে চলে যেতে পারি আপনার ঘরে। কি, পারি না?'

না, আর সিঁড়ি নয়, শুধু একটা দরজার ব্যবধান। তাও খোলা দরজা। অন্ধকারে চুপ করে বোবার মত দাঁড়িয়ে আছে। অথচ এই চৌকাঠটুকু পেরোবার তার শক্তি নেই। কে কবে তা ভাবতে পারত? মদের বাক্সটা নিশি রেখে গেছে সরিয়ে। ঘুম না আসে, কিছুটা খেয়ে নিতে পারে স্বচ্ছন্দে। তারপর সে যদি নির্ভুল পায়ে চলে যায় ও-ঘরে, নেমে যায় সেই ঘুমের সরোবরে, কে তাকে বাধা দেয়। কে যে তাকে বাধা দেয়, আশ্চর্য, কিছুতেই বুঝতে পারেনা অধিপ। নিরাশ্রয় নিঃসম্পর্ক মেয়ের জন্যে কেন এত জবাবদিহি? কেন একটা ক্ষীণ, দুর্বল মেয়ে তাকে তার ঘুমের পাহারায় বসিয়ে রাখে সারা রাত? কেন তাকে বৈরাগ্যের মন্ত্র শোনায়?

কে উত্তর দেবে?

উত্তর তামসীই দেবে একদিন। বলবে, ধৈর্য ধরো। ঘুম যাও। অঙ্কুর থেকে কিশলয়, কিশলয় থেকে কোরক, কোরক থেকে ফুল। দাও কিছু শিশির, দাও কিছু রৌদ্রের মাধুরী। দেখবে তোমার চোখের সামনে ফুটে উঠব দেখতে-দেখতে।

'কি করে আমার ঠিকানা জানলেন?' জিগগেস করেছিল অধিপ।

'কে যেন বলেছিল সেদিন।'

'কে?'

'কে বলেছিল সেটা তুচ্ছ, মনে করতে পারছি না। কিন্তু শুনে অবধি ঠিকানাটা যে মনে করে রেখেছি সেইটেই লক্ষণীয়। কত দিন ভাবতুম আপনি চলে আসবেন নিজে থেকে। বকসি কিন্তু ভাবত এসে চলে গিয়েছেন কোন ফাঁকে। কেন আসেননি বলুন তো? দরজা খোলা রাখলেও বুঝি আপনার নিষেধ মনে হয়?'

'আমি যদি এখানে না থেকে আজকে আমার বাড়িতে থাকতুম?'

'তা হলে তো আর কথাই থাকত না। হোটেল থেকে এনে ভাত খেতে হত না তা হলে। শুতে হত না পুরুষের হাতে-করা রুক্ষ বিছানায়। তখন সেটা স্থান হত না, ঘর হত।'

আজ ঘুম যাও। ধৈর্য ধরো ক'দিন। কুহেলিকা তরল হয়ে যাবে। দেখা দেবে সূর্যের সারল্য। উন্মাদ হাওয়া আসবে সমুদ্রের থেকে।

ভগবান, রক্ষা করো। অন্ধকারে নিঃশব্দে অধিপ আর্তনাদ করে উঠল। রক্ষা করো আমাকে। রক্ষা করো তামসীকে। রক্ষা করো নতুন দিনের যুযুধান যুবক-যুবতীকে। আমি বড়, বয়সে, অভিজ্ঞতায়, দুঃখসহনের প্রতিশ্রুতিতে। ত্যাগস্বীকারের তপঃক্লেশে। আমাকে বড়ই থাকতে দিও। নামিয়ে নিয়ে এসো না উচ্ছিষ্টের আঁস্তাকুড়ে। যেখানে নিরেট দেয়াল সেখানে নয়, যেখানে খোলা দরজা, সেইখানেই তোমার নিষেধ থাক নিষ্ঠুর হয়ে। একটা ক্ষীণকায় দুর্বল মেয়ের কাছে যে হেরে যাচ্ছি তার মাঝে আর কোনো বৃহত্তর জয়ের জন্মপত্র যেন লেখা থাকে। ক্লান্ত, বিতাড়িত, নির্যাতিত তামসী, তবু তাকে যেন রাখতে পারি জাগিয়ে। জাগরণের সেই জপমন্ত্র যেন ভুল করে না ফেলি। যে লাল মেঘে ঝড় আসবার কথা সে মেঘকে যেন সূর্যাস্তের স্বপ্নে সোনালি করে না দেখি। বিদ্যুতের বহ্নিতে না গৃহকোণের বাতি জ্বালাই। আমাকে তার দীক্ষাগুরু করো। রণগুরু।

ঠুন ঠুন-করে কাঁচের পেয়ালার শব্দ হল। কখন নিশ্চিন্ত বিস্মৃতিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল অধিপ, চমকে চেয়ে দেখল, এক গা রোদ উঠে গেছে। কী যেন কী একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে মনে-মনে ঠিক আয়ত্ত করে নেবার আগেই দেখতে পেল, তামসী। হাতে চায়ের পেয়ালা। হাসিমুখ। কোথায় আগুন, কোথায় জল, নিজের চেষ্টায় একটা কিছু যে তৈরি করে এনেছে তার প্রতিভাস।

'কেমন আছেন ?'

'যন্ত্রণা অনেক কমে গিয়েছে। হাঁটতে পারছি। খোঁড়ানোটা কমেছে অনেকটা, কিন্তু ভয় নেই,' তামসী হাসল, 'এখনো পালাবার মত হয়নি।'

গোড়ালি উঁচু করে-করে এ-ঘর ও-ঘর চলাচল করছে তামসী। নানান কাজের অছিলায়। কাল অধিপ যেটুকু করেছিল তার চেয়ে অনেক বড় পরিকল্পনা।

অধিপ শুধু দেখছে আর ভাবছে, কাজটা কি ভাঙবার না গড়বার ?

একুশ

কাজটা কি ভাঙবার না গড়বার ?

একটা লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার বিক্রির কাজ নিয়েছে অধিপ। আরো কটার সঙ্গে কথা বলছে। সকালবেলা চা খেয়ে বেরিয়ে যায়, ফেরে প্রায় দুপুরের ধার ঘেঁসে। স্নান করে চারটি মুখে গুঁজে আবার বেরিযে যায তক্ষুনি। এবার যায় ছোটখাট একটা আপিসে নগণ্য কেরানিগিরি করতে। নিশ্চিত কিছু একটা রোজগার দরকার। তার এখন সংসার হয়েছে। ঘর-দ্বার হয়েছে। ভাবতে হাসি পায়, ঘর-বসতে রুচি হয়েছে। তবু, সন্ধে কাবার করে সুস্থভাবে শ্রান্ত হয়ে বাড়ি ফেরে। প্রত্যাবৃত্ত পশুর মত ঘুমোয়।

একদিন বসে-বসে গল্প করার বড় সখ ছিল অধিপের। গা এলিয়ে, মন ভাসিয়ে দিয়ে। কথায়-কথায় কোথায় এসে পৌছুনো যায় তার অভাবন উদ্ভাবনের জন্যে বড় আগ্রহ ছিল তার। তার জন্যে চাকরি পর্যন্ত দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আজ সে গল্পের মানুষকে বাড়িতে ফেলে রেখে কাজের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাছে সে তাকে অলস মনে করে, অকর্মক মনে করে। মনে করে নতুন হবার অযোগ্য।

কিন্তু এই কি তার কাজের পরিচয় ? তার নতুন হবার নমুনা ? এই কেরানিগিরি, এই উঞ্ছজীবিকা ? ঠোঁটে করে খুঁটে-খুঁটে খড়কুটো কুড়িয়ে আনা ? সে কি শেষকালে গৃহস্থবাড়ির আঙিনায় ভদ্র একটি

গাছের কোটরে নীড় তৈরি করবে? তাই বা নয় কেন? অনেক উচ্ছৃঙ্খলতা করেছে সে জীবনে, এখন কি পাবে না সে একটি পরিমিততার শান্তি? উজানের পর আসবে না কি ভাটার স্নিগ্ধতা? আগ-জোয়ারে অনেক দূর ঠেলে চলে এসেছে অধিপ, এবার সর্বশেষ ভাটায় নেমে যাবে না কি সমুদ্রের দিকে?

স্বস্তি পায় না অধিপ। দিন-রাত ছটফট করে। মনকে বোঝাতে পারে না। মনে হয় তার কাজ গড়বার নয়, ভাঙবার, নির্মূল করে নির্মল করবার। তাই এতদিন আর কিছু না পেয়ে সে যখন তার জীবনটাকে ভাঙছিল, তখন তার মাঝেও পাচ্ছিল সে বিদ্রোহের আনন্দ। কিন্তু জীবনের কাছে এ বশ্যতাস্বীকারের ভদ্রতা দিনে-দিনে তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠছে। অসহ্য এই মৃদুজীবীতা। এই অল্পপ্রাণ দিনযাপন। অধিপের ইচ্ছে করে নিজের হাতে বাড়ি-ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। পাশের ঘরে গিয়ে তামসীকে জোর করে জাগিয়ে দেয় ঘুমের থেকে। এই মুখস্থ-করা মামুলি পৃষ্ঠার থেকে চলে আসে তারা আরেক জ্বলন্ত পরিচ্ছেদে।

কিন্তু কী আশ্চর্য-সুন্দর একটি ঘুম তৈরি করেছে তামসী! একটি নিটোল পদ্ম! বড় কষ্টের ঘুম তার। অনেক নির্ভর, অনেক নিবেদন মাখানো। মায়া করে অধিপের।

শেষকালে সে কি মায়ায় জড়িয়ে যাবে নাকি?

কাঁচের ফুলদনিটা অধিপ ইচ্ছে করে ছুঁড়ে ফেলল মেঝের উপর। প্রচণ্ড শব্দে চুরমার হয়ে গেল।

রান্না করছিল তামসী। কি হল? ছুটে এল ব্যস্ত পায়ে।

'কী সব ঠুনকো বাবু জিনিস রেখে দিয়েছ ফিটফাট করে। হাতের একটু ঠেলা লাগলেই ভূমিসাৎ।'

'ভালোই করেছেন ভেঙে ফেলে। ওটা বিলিতি।' তামসী হাসল।

'বিলিতির জন্যে নয়। অনাবশ্যক বলে। ফুল নেই তো ফুলদানি! তা ছাড়া আজকের দিনে ফুলদানিতে দরকার নেই আমাদের।'

'কিন্তু ফুলে আমাদের চিরদিনের দরকার।' তামসী ঝাঁটা নিয়ে এল। বললে, 'ওটার মধ্যে ফুল রাখলে ফুলের চেয়ে ফুলদানিটাই বড় হয়ে উঠত। যেমন আমাদের দেশের স্বদেশীওয়ালাদের মধ্যে দেশাত্মবোধের চেয়ে আত্মবুদ্ধিটাই বড় হয়ে ওঠে। এক গিঁঠ কাঁচা ভেলকো বাঁশের ফুলদানি এনে দিন আমাকে, দেখুন, ফুলে-পাতায় কেমন সুন্দর করে সাজিয়ে দেব। জিনিসটা তখন দিশিও হবে মজবুতও হবে। আধার দিশি হলে আধেয়কেও তখন মনে হবে সহজ, স্বাভাবিক, কতকালের বান্ধবের মত। চেয়ে-চেয়েও চোখ আর ফিরতে চাইবে না। নিন,' ঝাঁটাগাছটা তামসী এগিয়ে দিল অধিপের দিকে: 'ভাঙা কাঁচের টুকরোগুলো এবার সাফ করুন। আমার রান্না পুড়ে যাচ্ছে।'

ভেঙেও নিবৃত্তি নেই অধিপের। ঝাঁটা হাতে করে পরিচ্ছন্ন করতে হয় ধ্বংসস্তূপ। এক গিঁঠ কাঁচা ভেলকো বাঁশ জোগাড় করে আনতে হয়। আনতে হয় ফুল। চেয়ে-চেয়েও চোখ আর ফেরানো যায় না।

শুধু কি ফুল? তামসীর হাসি? তামসীর পবিত্রতা?

মাকু ছুঁড়ছে তাঁতি, সানার টানে সুতো সরে-সরে এসে নক্সা ফুটে উঠছে। তেমনি এই মামুলি রান্নাবান্না ও ঘরকন্নার কাজে নিরন্তর একটি অলক্ষ্য সৌন্দর্যের ছবি আঁকছে তামসী। দেখবেন কেমন সুন্দর করে সাজিয়ে দেব। যেখানে হাত রাখছে সেখানে প্রাণ আনছে। সামান্যও আর তুচ্ছ থাকছে না। হর-রঙের নক্সা ফুটিয়ে তুলছে। দিন রাত্রির টানা-পোড়েনে সে যেন কোন নতুন শিল্পী। জীবনের

নতুন তন্তুবায়। আমরা যারা দেশকে নতুন করব, সব আগে আমাদের নতুন হতে হবে। নতুন করতে হবে আমাদের দৃষ্টি। আমাদের বোধ। আমাদের সম্পর্ক।

চমৎকার নতুন হয়েছে অধিপ। ঠুঁটা-খোঁড়া হয়ে পড়ে আছে কাঠ হয়ে। মজে থাকছে। ডুবে যাচ্ছে তিলে-তিলে। মধুর ভাণ্ডে পড়ে মক্ষিকার আত্মহত্যা হচ্ছে। উড়ন্ত হাউইর বদলে সে এখন শিশুর হাতের খেলনা, নিরীহ ফুলঝুরি। আগে সে বয়ে যাচ্ছিল, এখন সে ক্ষয়ে-ক্ষয়ে যাচ্ছে। হয়ে উঠছে কোলকুঁজো কেরানি। না, এ সে মেনে নেবে না। সে ভাঙবে। বিদ্রোহ করবে।

কী ভাঙবে? এই বাসা—তাসের বাসা? না, তামসীকে বলবে, হাঁটতে পারছ, এবার পথ দেখ। না, নিজেই চলে যাবে পালিয়ে?

মায়া লাগে, মানি। কিন্তু তাই বলে তামসীর জন্যে কি সে কেরানি হবে? তার বাইরে কি আর তার কাজ নেই? হয়ে-ওঠা নেই?

হ্যাঁ, জানি। বলবে, এর আগে কী হয়ে উঠেছিলে তা আর জানতে বাকি নেই। কিন্তু তার আগে? ধুলো জমে-জমেও বারুদের স্তূপকে ক্ষয় করতে পারে নি। সেই বারুদের স্তূপে তামসী কি হবে না অন্তরঙ্গ অগ্নিকণা?

‘একটা দেশলাই দিন তো।’ তামসী এসে হাত প্যাতে।

‘এই না সেদিন দেশলাই নিলে!’

‘আমি নিলুম না আপনি! দিনে কটা সিগারেট খান তার হিসেব রাখেন?’

পকেটের দেশলাইটা অকাতরে দিয়ে দেয় অধিপ। বলে,‘আগুন খুব শস্তা? তাই না? ফস করে কাঠি ঘসলেই জ্বলে উঠল! কিন্তু এ ভাবে কাঠি পোড়াতে থাকলে দু’ দিনেই পুড়ে সাফ হয়ে যাব।’

'আমার জ্বলন্ত কাঠির আদ্ধেক দিয়ে ধরিয়ে দিতে পারব আপনার মুখের সিগারেট।' আধ-ভর্তি বাক্সটা দু' আঙুলে করে নাড়তে-নাড়তে তামসী হাসতে থাকে।

'কিন্তু কী করবে এখন দেশলাই দিয়ে? এত রাতে নতুন করে ফের উন্নন ধরাবে না কি?'

'না। আমার ঘরের আলোটা ফিউজ হয়ে গেছে। মোমবাতি জ্বালাব।'

তামসী মোমবাতি জ্বালায়। একটি থেকে আরেকটি। সেই ঠাণ্ডা নরম আলোতে বসে বই পড়ে।

উদ্বেগ নেই, উচ্চাশা নেই। চাকরির খোঁজে টই-টই করে আর টহল মারা নেই। চড়ারঙের বিজ্ঞাপন হয়ে নিজেকে প্রকট করা নেই। ঘন সবুজ পাতার আড়ালে চাঁপা কলিটির মত যেন লুকিয়ে আছে। যেন সমস্ত সন্ধানের সমাধান মিলে গিয়েছে তার। যেন এর বেশি আর কিছু তার চাইবার ছিল না। বৈরাগীর হাতের একতারার মত এই একফালি সংসার। এই গৃহরচনা। যেন সব কিছু সে পেয়ে গিয়েছে। এই যেন তার কীর্তি, তার কৃতার্থতা।

একেক সময় বিশ্বাস হয় না অধিপের। মনে হয় এক চমক ঘুমিয়ে নিচ্ছে নিরালায়। তন্দ্রার ঘোর কেটে যাবে এখুনি। দূর হতে একদিন ডাক শোনা যাবে মরণের। সেই ডাকের জন্যে কান খাড়া করে রয়েছে। তার সমস্ত শান্তির মাঝে জেগে আছে সেই উন্মনতা।

মাঝে মাঝে বাইরে বেরোয় তামসী। একা-একা। কোথায় গিয়েছিলে? একটা বাড়ির খোঁজ করছি। বাড়ি? কেন, এটার কী হল? অধিপ অলক্ষ্যে চমকে ওঠে। এ বাড়িটা অনেক বড়, অকারণে ভাড়া বেশি। দুটি প্রাণীর জন্যে তিনটে ঘরের প্রয়োজন

নেই। ছোট ফ্ল্যাট হলে ভাড়ার অনেক সাশ্রয় হয়। আজ এত দেরি হল ফিরতে? অনেক দূর গিয়ে পড়েছিলুম। কী ঝোঁক হল, ফিরলুম পায়ে হেঁটে। পয়সা বাঁচালুম।

এক দিন অঢেল পয়সা ছিল অধিপের। উড়িয়ে দিয়েছে, পুড়িয়ে দিয়েছে। কোনো কল্পনা ছিল না, সংকল্প ছিল না। যখন যেমন খুশি তখন তেমন ব্যয় করেছে। আর সেটাতে সত্যিই সে খুশি কিনা ব্যয়ের প্রাবল্যে তাও বিচার করে দেখবার সময় পায়নি। আজ যদি সে পয়সার কিছু অবশিষ্ট থাকত, তবে কী করত অধিপ? চাল-ডাল কিনত? হাঁড়ি-কুঁড়ি? বিছানা-বালিশ? আরো কিছু বেশি থাকলে সঞ্চয় করত হিসেবীর মত? স্বার্থপর ভবিষ্যতের কথা ভেবে বর্তমানকে রাখত কৃপণ করে? আগের মত আবো অনেক থাকলে নিরিবিলি দেখে জমি কিনত এক টুকরো? তারপর তামসীকে বলত, 'তোমার মনের মত করে নতুন বাড়ির নকসা আঁকো এইবার।'

'জমি কিনেছেন?' তামসী এসে জিগগেস করে থেকে থেকে। 'জমি কিনুন। পতিত হোক, অনাবাদি হোক, হাজাশুকা হোক, জমি কিনুন। একসঙ্গে অনেকখানি জমি, ঢালা জমি, মাঠ-ছাড়ানো মাঠ। তারপরে আসুন আমরা দলে-দলে লেগে যাই চাষ করতে, মাটি থেকে সোনা ফলাই। কি, পরের কোম্পানির শেয়ার বেচছেন? নিজে একটা কোম্পানি খুলুন। মাটি থেকে সোনা ফলাবার কোম্পানি। আর, শুধুই কি মাটি? মানুষ নেই তার সঙ্গে-সঙ্গে? আর সেই সব মানুষ কি এই মাটির মতই সব-কিছু-সহ্য-করা নির্বোধ জড়পিণ্ড নয়?'

শুধু মাঠের স্বপ্ন? ফসলের স্বপ্ন? জীবন্মৃতের জন্মান্তর!

অধিপ ঝাঁজিয়ে ওঠে: 'একলপ্তে গা-ঢালা জমি পেতে হলে অনেক ছাদ-দেয়াল ভেঙে ফেলতে হবে, উপড়ে তুলতে হবে অনেক গাছ-

গাছড়া। পুরোনো ইমারত না ভাঙতে পারলে কী করে নতুন ভিত্তির পত্তন হবে? না, আমি ভাঙবাব দলে, আমি—'

কিন্তু কী তুমি ভাঙছ জিগগেস কবি? আমি ভাঙবাব দলে, আমি নিজেকে ভাঙছি। ভাঙছি আমাব আভিজাত্য। আমাব শিক্ষাদীক্ষার অহংকার। আমাব দেশপ্রেমেব অহমিকা। ভাঙতে-ভাঙতে নামিয়ে আনছি নিজেকে।

একদিন দুপুবেলা খুব উত্তেজিত হয়ে বাড়ি ফিবল অনিপ। হাতে একটা চাবুক। শঙ্কব মাছেব লেজ হযতো।

'চলো। এক্ষুনি। ট্যাক্সি নেব একটা।'

তামসী সেলাই কবছিল। নিচেব ঠোটেব উপব ছুঁচটা দাঁত দিয়ে চেপে ধবে কাপড়টা খুলে-খুলে দেখছিল আব কোথায-কোথায ছিঁড়ছে। ছুঁচটা আলগোছে তুলে নিযে ঠোট ফাঁক কবে তাকিযে বইল তামসী।

'শযতানকে শাযেস্তা কবতে হবে। ছাল-চামড়া তুলে দিতে হবে পিঠেব। ওব প্রেস ভেঙে গুঁড়ো কবে দিযে আসতে হবে।'

'কাব?'

এই দেখ। একটা বাঙলা সাপ্তাহিক। কৃষ্ণগোবিন্দেব কাগজ। আমাদেব নিযে কী লিখেছে যা তা মাতালেব মত, ইতবেব মত। পাশ কাটিযে যাবাব বাইবে চলে গিযেছে এবাব। পাগলা শেয়াল যখন বেবিযে পড়েছে দিনেব আলোয তখন তাকে লাঠিতে ঘায়েল না কবে উপায নেই।

পড়তে-পড়তে তামসীব নাক-মুখ গবম হযে উঠল। হঠাৎ থেমে পড়ে জিগগেস কবলে, 'কিন্তু আমি যাব কোথায?'

'ওব আপিসে। এই চাবুক হাতে নিযে। আচ্ছা করে কযে দেবে দু ঘা।'

'আপনি শুধু সঙ্গে যাবেন ? একজন ফটোগ্রাফার থাকবে না ?'

'ফটোগ্রাফার দিয়ে কী হবে ?'

'বা, এমন একটা দৃশ্যের স্ন্যাপ নেবেনা ? দেখানো হবেনা সিনেমায় ?' তামসী হাসতে লাগল। নিচের ঠোঁটের উপর ছুঁচ কামড়ে ধরে কাপড়ের ছেঁড়া খুঁজতে লাগল।

'এততেও তুমি আগুন হয়ে উঠছনা ? এর মাঝে দেখতে পাচ্ছনা তুমি জ্ঞানাঞ্জনের কদর্য উল্লাস ?'

'না।' সেলাই করতে-করতে আনত চোখে তামসী বললে, 'আমি এর মাঝে কৃষ্ণগোবিন্দর কলমের শক্তির সম্ভাবনাকে দেখছি।'

সম্ভাবনা! এর মাঝেও তামসীর ফসলের স্বপ্ন!

'হ্যাঁ, দেখছি, একদিন এই কলম আমাদেরই কাজে লাগবে, আমরা যারা দেশের দীপবাহী হব। সেদিন আমাদের সঙ্গে সেও দেশের কুলকীর্তি গাইবে দেখবেন, কলমকে জ্বালাবে মশালের মত। কী হবে ঐ কলম ভেঙে দিয়ে ? এমন একটা অবস্থায় নিয়ে আসুন দেশকে যখন কৃষ্ণগোবিন্দ পর্যন্ত ব্যর্থ থাকবে না, যজ্ঞে সেও সমিধ এনে দেবে—তার এই কলম। ভেঙে ফেলে লাভ নেই, বদলিয়ে ফেলুন। ওর ভুলে-যাওয়া নাটকের পাঠটা ওকে ধরিয়ে দিন মৃত্যুস্বরে।'

মৃত্যুস্বরে। অসম্ভব। অধিপ বেরিয়ে গেল হতাশের মত। ছিন্ন বস্ত্রে জোড়াতালি দেবার তার সময় নেই।

কিন্তু কে-একটা লোক বাড়ির সামনে ঘুর-ঘুর করছে না ?

'কে ? কী চাই এখানে ?'

'দত্ত-দিদি এখানে আছেন ?'

সে আবার কে। তুমিই বা কে।

বাসুদেবকে তামসী এক নজরেই চিনতে পারল। জ্ঞানাঞ্জনের

আপিসে তাদের কামরার বাইরে টুল পেতে বসে থাকত। কলিং-বেল টিপলে ছিটকে চলে আসত ভিতরে, হুকুম বাজাত। কিন্তু, ব্যাপার কী। কোথায় কে আজ ঘণ্টা বাজিয়েছে ?

মন্ত্রীত্ব পাননি জ্ঞানাঞ্জন। সেই থেকে মেজাজ তেরিয়ান হয়ে আছে। বলছেন, মন্ত্রীত্ব ভেঙে দেবেন দু মাসে। কিন্তু তার আগে আমাদেরই মাথা ভাঙছেন। কলিং-বেলে এক আঙুলের বাড়িতে আমি ঘরে ঢুকিনি, শেষকালে হাতের তালুতে বাড়ি দিতে হয়েছে, সেই অপরাধে চাকরি গিয়েছে আমার। তারপর ? তারপর আপিসের আর-যত দারোয়ান সবাই ধর্মঘট করেছে। এ আপিসে মোটে তারা দশ জন। ধর্মঘট করার জন্য বাকি নয়জনকেও বরখাস্ত করা হয়েছে। আশ্চর্য, নতুন লোক পাওয়া যাচ্ছে তাদের খালি জায়গায়। মোটে দশজন কিনা। এখন তবে কী ভাবছ ? জ্ঞানাঞ্জনের আরো যে তিনটে আপিস আছে সেখানে সবশুদ্ধু আছে জন পঁচিশেক। তাদের মধ্যে এই অসন্তোষ সংক্রামিত করে দিতে হবে। কিন্তু বিশেষ সুফল হচ্ছে না। কেউ-কেউ বলছে তোদের আপিস তো আমাদের কি। তাদের উপর চলছে যখন সমান মনিবানা তখন তাদেরও কি সমান সরিকানা নয় ?' কিন্তু কে তাদের বুঝিয়ে বলে ?

'তা আমার কাছে এসেছ কেন ?' তামসী অপ্রতিভের মত তাকিয়ে রইল।

'আপনাকেও তো আমাদেরই মত অন্যায় ভাবে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাই আমাদেরই দলের লোক তো আপনি।'

তামসীর বুক আনন্দে উথলে উঠল। দলের লোক। এক মন্ত্রশিষ্য। এমনিতে কত নিম্নস্তরের লোক এই বাসুদেব, শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে কোথায় সে পড়ে রয়েছে ; সাধ্য কি সে দাঁড়ায় এসে তার সমতলে,

কিন্তু আজ, কেন কে জানে, হঠাৎ মনে হল তারা প্রতিবেশী, তারা একধর্মা। তারা অভিন্ন পরিবার। এক রথের একই রশিতে তারা টান দিয়েছে। এক যুদ্ধে এক জয় তাদের কাম্য। বুকের মধ্যে দৃঢ় সাহসের স্পর্শ পেল তামসী, এই অচেনা, অগণ্য বাসুদেবও তার সহায়, তার সুহৃদ, তার আপনার লোক। তার গুরুভাই। একদৃষ্টে অনেকক্ষণ সে তাকিয়ে রইল বাসুদেবের দিকে। তার ঐ শক্তি, ঐ স্বাস্থ্য, ঐ প্রতিজ্ঞা—এতে তামসীরও স্বত্ব আছে! আর, তার যা আন্তরিকতা তাতেও এই সর্ব্বস্বান্তদের অধিকার।

আমাকে কী করতে হবে?

'তৈরি করতে হবে আমাদের। যাতে আমরা না ভেঙে পড়ি, হেরে যাই। যাতে বাড়তে পারি আমরা, দলে বড় হতে পারি। আমি কী বলব।'

অধিপের দিকে তাকাল তামসী। বললে, 'যাবেন?'

'যাব।' অধিপ লাফিয়ে উঠল। দূর থেকে সে যেন জলকল্লোল শুনতে পাচ্ছে। জনকল্লোল।

শান-বাঁধানো সারি-সারি খাপরেল, কোনোটা মাটির, কোনোটা বা টিনের বেড়া। ঘুপচি গলি, ঘেঁসাঘেঁসি চলতে গেলে একজনকে পাশের নর্দমায় পড়তে হয় পা মচকে। ডাস্টবিনের জায়গা নেই বলে যেখানে-সেখানে আঁস্তাকুড় জমে আছে। এখন সন্ধে-বেলা, ধোঁয়া দিয়েছে ঘরে-ঘরে। ঘর? না এগুলো খুপরি? যেখানে কায়ক্লেশে দুজনে মাথা গুঁজতে পারে সেখানে গাদি মেরেছে প্রায় সাত-আটজন। তবু তো এটা সম্ভ্রান্ত বস্তি, থাকে ট্র্যাম-কণ্ডাক্টর, বাস-কণ্ডাক্টর, আপিসের দারোয়ান, ইলেকট্রিকের মিস্ত্রি। কেউ-কেউ বা একেকটা কুঠরিতে একেকটা পরিবার নিয়ে। দোকানের বেচনদার,

কর্পোরেশন-ইস্কুলের মাস্টার, খবরের কাগজের হরকরা। হর-রকমের মানুষের জনতা। তবু যেন এরা পদে আছে, জীবনে বহন করছে জীবিকার পদবী। মাস্টারের বাড়ির ছেলেরা পড়া পড়ছে, খবরের কাগজের ফিরিওলা রাজনীতি বলছে, আপিসের দারোয়ানরা স্থর ভাঁজছে রামায়ণের। সবাই নিজের মর্যাদায় পৃথক। তবু কেউ যেন ঠেলে উঠতে চাইছে না, ভদ্রতার যেটুকু অবলেপ এখনো লেগে আছে জীবনে তাই তারা রাখতে চাইছে বাঁচিয়ে। একেবারে কাঁচা মাটির বস্তিতে তো তারা বাসা নেয়নি, তারা তো বানভাসি নয়, নৌকোর তলা তো ফুটো হয়ে যায়নি তাদের, এই তাদের সান্ত্বনা। হয়তো বা একটু অহংকার।

চাই দু'জন দারোয়ান আছে এ বস্তিতে। নাগুলাল আর রামকরন। না, তারা কিছু গোলমাল করতে রাজি নয়। এ ব্যাপার তাদের এলেকার বাইরে। এক জাতের লোক হয়েছে বলে কী হয়েছে, সবাই মিলে জাত খোয়াবার মানে নেই। দেশে তাদের ভিটে আছে, সে ভিটেতে সর্ষের চাষ বসাতে চায়না তারা।

অধিপ বললে, 'এখানে হবে না। আরো নিচে চল।'

'সেখানেও কি কিছু হবে?' তামসী হাসল প্রায় পরাজয়ের লজ্জায়।

আরো নিচে নেমে এল তারা। খোলা, কাঁচা মাটি, কাদা আর চট। ইঁট-সুরকি বলটু-ইস্ক্রুপের লেশ নেই। সব জায়গায় মাটির মালিন্য। কুলি-মজুরের আস্তানা। যত নাজেহাল-নাস্তানাবুদ হায়রান-পারেশানের ভিড়। পদহীন, পদবীহীন পদাতিকের দল। একটা অদ্ভুত আবিষ্কার। পানওয়ালা, ফিরিওয়ালা, কসাই, ঝাঁকামুটে ছাতা-সারা, চাবি-সারা, ছুতোর, রাজ, গাড়োয়ান, চাকর, বেশ্যা, ভিক্ষুক। সমস্ত মিলে একটা অখণ্ড ভবিষ্যৎ। অধিপ উল্লসিত হয়ে উঠল: 'এইখানে।'

'এইখানে।' মুগ্ধের মত তামসী আবৃত্তি করলে। বললে, 'কিন্তু এইখানে কারা? ওরা না আমরা?'

এক মুহূর্ত তার মুখের দিকে স্থির হয়ে তাকিয়ে রইল অধিপ। যেন কী পড়ে নিলে। বললে, 'হ্যাঁ, ওরাই। আমরা আগে কিছুই বুঝতে পারিনি কি দিয়ে কী হবে, কী হতে পারে। অহংকারই ছিল, শক্তি ছিলনা, কেননা অসংখ্য ছিলুম না আমরা। আমাদের অসংখ্য হতে হবে। অসংখ্য হতে পারলেই আমরা সত্যিকারের অশঙ্ক হব।'

আর, অসংখ্য হতে হলে মিলতে হবে এক সমতলে। এক অভাববোধের বেদনার তীব্রতায়। অধিপকে কথায় পেয়েছে। নিঃস্বতার মধ্য থেকে গড়ে তুলতে হবে পরম-প্রাপ্তির পৃথিবী। অনেক কাটাকুটি করে একটি পরিষ্কার পৃষ্ঠায় এসে লিখতে হবে নতুন পরিচ্ছেদ।

'কিন্তু ওদের সঙ্গে মিলবেন কি করে? ওদের যা নেই তা কি আপনারো নেই?'

'একটা অসীম জিনিস আমাদের নেই। স্বাধীনতা। সেইটেই আসল জিনিস। সেইখানে আমরা সমান।'

এইখানেই বারে-বারে ঘোরাঘুরি করতে লাগল তারা। কিন্তু কিছুতেই কিছু যেন করে উঠতে পারছে না। কেবল তাল-তাল কাদা, প্রাণহীন। এত রোগ এত দুঃখ এত দারিদ্র্য, কিন্তু পচা ঘা, ব্যথায় যেন যন্ত্রণা নেই। মরে থাকবার মুখে থেকেও যেন মরিয়া হয়ে উঠতে পারে না। সার-সার পিঁপড়ে। গর্ত থেকে বেরিয়ে নিরাশ্রয়ের মত আবার গর্ত খুঁজে বেড়াচ্ছে।

'হোক কাদা, কিন্তু এই কাদা থেকেই মূর্তি গড়ব আমরা। পুরাকালে দেবতা গড়েছি, এবার গড়ব মানুষ। প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্র হবে প্রাণধারণের যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণায় ওদেরকে বাঁচিয়ে তুলব। হোলই

বা না পিঁপড়ে, কিন্তু ওরা যে অগণন এইখানেই আমাদের মুক্তি। পিঁপড়ের মধ্যেও শৃংখলা আছে, সংঘশক্তি আছে। পিঁপড়েও ছোট নয়।'

'আপনি এখনো কথাতেই বিশ্বাস করেন।'

হয়তো তাই। কিন্তু কথা না হলে কাজেই বা বিশ্বাস আসবে কোত্থেকে? কোত্থেকে আসবে উজ্জ্বলতা? বারে-বারে বলতে-বলতে কথাই একদিন কাজ হয়ে উঠবে।

'আপনার কি মনে হয়না আমাদের গায়ের জামার থেকে ওদের গায়ের চামড়াটা ওদের কাছে বেশি মূল্যবান? আমাদেরকে তাই ওরা বিশ্বাস করতে পারছেনা পুরোপুরি। আমাদের দুঃখে ওদের দুঃখ পারছেনা জীবন্ত হতে।'

কিন্তু ইচ্ছার যদি সাধুতা থাকে, তবে একদিন খুঁজে পাব প্রতিধ্বনি! সেইটেই আমাদের আশা, বলতে পারো নেশার মতো। দলিত দ্রাক্ষার থেকে একদিন বেরিয়ে আসবে মদিরা। আর, সেদিন সেই মদিরায় দলিত দ্রাক্ষার দুঃখের কথা হয়তো ভুলে যাব।

হাতিকলের কুলিদের ক'জনকে মেরেছে ঠিকেদার। পাণ্ডা-প্রধান দুজনকে বরখাস্ত করেছে। আর যায় কোথা! হাতিকলের কুলিরা ধর্মঘট করলে। শুধু হাতিকলে হলে চলবে কেন, নিয়ে যেতে হবে ঘড়িকলে, ভাঁজাই কলে, বোম্বাই কলে। গাঁটঘর, সেলাইঘর, ভাইসঘর, ঢালাইঘর। ইঞ্জিনঘর, বাতিঘর, বাইলটঘর পর্যন্ত। এ রাজি হয় তো ও রাজি হয় না, এ স্বার্থ ছাড়ে তো ও সুবিধে নিয়ে আসে।

মালিকের তরফ থেকে ধর্মঘট ভেঙে দেবার জন্যে তোলপাড় হচ্ছে, যাতে আর ছড়াতে না পারে তার তোড়জোড়। ভয়, প্রলোভন, যত রকমের কারসাজি। অনেক কর্মী এসে হাত মেলাচ্ছে অধিপের সঙ্গে। কিন্তু সমরেশ কই? কোথায় তার চাঁদার বাক্স?

সমরেশ কী করছে কেমন আছে, জিগগেস করতে ইচ্ছে করত বাসুদেবকে। করেনি, কেননা আশা করত তামসী, ঠিক সময়ে দেখতে পাবে ঠিক জায়গায়। একদিন দেখতেও পেলে তাই। বৃষ্টি-ঝাপসা রাত্রে, কুলি-বস্তিতে। ঘাসীরামের পাশের ঘরেই রাজীরাম। রাজীরাম ধর্মঘটী, ঘাসীরাম উল্‌টা-বুঝ। দুজনে ভাই, দুদিকের মাতব্বর। ঘাসীরাম মনিবের কাছ থেকে দেদার টাকা খাচ্ছে, আর আঁচড়ে-পিঁচড়ে কত কষ্টে ক'টা টাকা জোগাড় করে এনেছে তারা রাজীরামের জন্যে।

অধিপ গেছে আরেক হাবেলিতে, রাজীরামেব ঘরে বসে তামসী সবাইর খোঁজ-খবর নিচ্ছে, কে কবে ছিটকে পড়ছে বাইরে, দুষমনের খপ্পরে। বড় রাস্তায় মোটর দাঁড়াল কার। কে অসমান পায়ে কাদা বাঁচিয়ে-বাঁচিয়ে চলে এল ভিতরে। গা ঢাকা দিয়ে একেবারে ঘাসীরামের ঘরের মধ্যে।

'কে না জানে, এমনিই ওর হাল-চাল। বদমাস, মাতাল। বেটি-চুরির জন্যে দায়মুল হয়েছিল।'

কান খাড়া হল তামসীর।

'আর ও তো তোমার সাদি-করা পরিবার নয়। বাদশার যেমন বাঁদি, বোষ্টমের যেমন ঠাকরুন, তেমনি তোমার এই সুজ্জি বেওয়া। ওকে দিয়ে এক নম্বর নালিশ ঠুকে দিতে ক্ষেতি কি? তোমাদের ঘরে ঢুকে হল্লা করেছিল তো একদিন। এবার একদিন সুজ্জিকে হল্লা বাধাতে বলো। মনিবের হাতে ইনাম আছে ইলাহি।'

'মাপ করবেন বাবু। ধর্মঘট না মানি ধর্মকে মানব।'

'রাখ তোমাদের যত অনাসৃষ্টির কথা। আর কিছু নয়—টাকা, চাকরি, প্রমোশন। ধর্মঘটই বা কিসের জন্য? সেই টাকা, চাকরি, প্রমোশন।'

তামসী উঠে দাঁড়াল।

'না, বাবু, তা পারবে না সুজ্জি। দত্ত-দিদি তাকে বহিন বলে।'

'আর তোমার দত্ত-দিদিটিই বা কি! খোদ মনিবের বাঁধা ছিল একদিন। এখন উড়ুক্কু হয়েছেন।'

তামসী বেরিয়ে এসে দাঁড়াল দরজার কাছে।

'না বাবু, মারপিট করতে বলেন করতে পারি। টাকা খেয়েছি, মার খেতেও ভয় কবিনা। কিন্তু বেসবমের মত বেইমানি করতে পারব না।'

'এটি কে? নতুন এসেছে বুঝি? এটিকে ধরো না। সুজ্জি বিবি না পাবেন, চান্দু বিবি পারবেন। টাকা দেব একমুঠো।'

'কে, সমরেশবাবু না?'

বৃষ্টি-বুলানো অন্ধকারে ভালো কবে ঠাহর করতে পাবেনি সমরেশ। কিন্তু কণ্ঠস্ববটা চাবুকের প্রহারের মত।

'আপনি—' ছিটকে লাফিয়ে পড়ল সমরেশ।

'খুব চুটিযে চাকরি করছেন বুঝি! হু-হু করে বুঝি প্রমোশন হয়ে গেছে! যতক্ষণ নিজের কিছু ছিল না বা অল্প ছিল, ততক্ষণ বুঝি গরিবের জন্য বুকটা বিদীর্ণ হয়ে যেত! আর এখন কাজে বহাল হয়ে মই বেয়ে উপরে উঠে গরিবকে কলা দেখাচ্ছেন! পালিয়ে যাচ্ছেন কি! ঘাসীরামদের এখনো দলে আনতে পারিনি, পারলে, ওরা কেউ আপনাকে আজ এমন করে পালিয়ে যেতে দিত না।'

এবার আব কাদা বাঁচাবার মানে হয় না। পা কি মাটিতে পড়ছে না শূন্যে থাকছে তাই বা কে লক্ষ্য করে।

এর পরে সত্যি-সত্যি একটা মারপিট হয়ে গেল।

মারপিট আর কিছু নয়, অধিপ আর তামসী যখন ফিরছে কুলি-বস্তি

থেকে, অন্ধকার ডোবার ধার দিয়ে, তখন অধিপকে লক্ষ্য করে গায়ে-মাথায় কতগুলি লাঠি পড়ল আচমকা। সঙ্গে তামসী ছাড়া আর কেউ নেই, তামসীই ঝাঁপিয়ে পড়ল ঢেউয়ের মত। নিজের শরীর দিয়ে অধিপকে নিমেষে অবলুপ্ত করে দিলে। ঢেকে রাখল দুর্ভেদ্য বেষ্টনীতে। নিমেষে স্তব্ধ হল আক্রমণ।

তামসীর ঘরে, তক্তপোষে মুহ্যমান হয়ে শুয়ে আছে অধিপ। মাথায়, ঘাড়ে পুরু করে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। শিয়রে চিত্রাঙ্কিতের মত বসে আছে তামসী। আর অধিপের মুখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন প্রমথেশ।

তিনি যে কী পাননি তাই যেন আজ দেখছেন স্বচক্ষে। তা মন্ত্রীত্ব নয়, নয় আরো প্রভুত্ব-প্রতিপত্তি। ও-সব তুচ্ছ, ব্যঙ্গময়। কিম্বা কী পেলেন, তাই যেন দেখছেন অধিপের মুখে। তাঁর সমস্ত আরাম-আলস্য, সমস্ত অশুচিতা তাঁকে ধিক্কার দিয়ে উঠল। একদিন তাঁরই উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে অধিপ রক্ত চেয়েছিল, আজ নিজের মাথার রক্ত দিয়ে তাঁর সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে।

'ডাক্তার আবার আসবে বলেছে?'

'দরকার হবে না বলেছেন।' তামসী কুণ্ঠিত-কাতর চোখে তাকাল প্রমথেশের দিকে। বললে, 'রাত এখন অনেক হয়েছে, আপনি বাড়ি যান। কিছু ভাবনা নেই, আমি জেগে আছি সারা রাত। কাল সকালেই আপনাকে খবর পাঠাব।'

'ওর ঘুম ভাঙলে বোলো না যেন আমি এসেছিলুম।'

'বলব না?'

'না, এবার যখন আসব, ওর জাগার মধ্যে আসব। তখন আর আমার ভয় থাকবে না, ও আমাকে তখন ঠিক চিনতে পারবে।'

শেষ রাত্রের দিকে অধিপের ঘুম ভাঙল।

ঘুমের মধ্যে থেকেই বললে, 'এবার নিশ্চয় ওদের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছি আমি। তাই না? এবার নিশ্চয় ওরা আমাকে ঠিক চিনতে পারবে।'

শুধু কি ওদের কাছাকাছি? তোমার কাছাকাছি নয়? এ কার ঘর, কার বিছানা, কার প্রতিরাত্রির নির্জনতা? তাকে আবৃত করে কার এই দেয়াল? কার সেই তরঙ্গ-দুর্গ? সেই আবরণের শক্তি, আবরণের উষ্ণতা?

মৃদু একটা বেগুনি আলো জ্বলছে। অধিপ ডাকল: 'তামসী।'

'ভাল আছেন?'

'আছি। তোমারও তো লেগেছিল নিশ্চয়। কোথায়?'

'হাতে। ও কিছু নয়।'

'দেখি।'

দেখবার কথা নয়। তবু অধিপ তামসীর হাত ধরে রইল। যেখানে তার ব্যথা সেখানে রাখতে চায় তার স্পর্শের কোমলতা।

'তুমি ঘুমোবে না আজ?'

'ইচ্ছে তো আছে। কিন্তু আপনি জেগে থাকলে নিশ্চিন্ত হয়ে আপনার এক পাশে শুয়ে পড়ি কি করে? হাত ধরে টেনে রাখলে কেউ ঘুমুতে পারে টান হয়ে?'

অধিপ হাত ছেড়ে দিল। চোখ বুজে ধীরে-ধীরে গভীর নিশ্বাস টানতে লাগল।

ডাক্তার এসে ব্যাণ্ডেজ বদলে দিয়ে গেছে, ঘায়ের অবস্থা ভাল, তবে জ্বর যখন একটু আছে, ভাত দেয়া যায় না আজ—নিশি এসে খবর দিল, কে একজন ভদ্রলোক ডাকছে তামসীকে।

কে আবার! সিঁড়ির কয়েক ধাপ নেমে এসেই দেখতে পেল, কালিকিংকর।

আমাদের আপিসে আপনার নামে একটা চিঠি এসেছে। তা আপনাকে পৌঁছে দিতে এসেছি। বলতে পারেন এ চিঠির সূত্র ধরেই আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি একটু। বলতে পারেন বক্সি-সাহেবই আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলতে চান আপনার সঙ্গে তাঁর কোনোই ঝগড়া নেই। যা আপনি চান, যা তাঁর সাধ্য। শুধু অধিপকে ছেড়ে—

স্তম্ভিতের মত কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কালিকিংকরের মুখের উপর তামসী দরজা বন্ধ করে দিলে।

চিঠি? কার চিঠি? কে লিখেছে? ছদ্মবেশে জ্ঞানাঞ্জনেরই পুনঃপ্রবেশ নয় তো? ক্ষিপ্র আঙুলে খামটা ছিঁড়ে ফেলল তামসী। প্রথমেই দেখতে গেল ইতি। কে লিখেছে?

ইতি তোমার দেবিকা। সেই কত দিনের ভুলে-যাওয়া হস্তাক্ষর। দেবিকা চিঠি লিখেছে!

'তামসী।'

'বলুন।'

'তুমি—আপনি কে?' সন্ধের দিকে তন্দ্রা এসেছিল অধিপের, গলার স্বরে চমকে উঠল হঠাৎ।

'আমি নার্স।'

'তামসী কোথায়?'

'তিনি কি-এক জরুরি চিঠি পেয়ে চলে গেছেন বাইরে।'

'বাইরে—বাইরে কোথায়?'

'কলকাতায় বাইরে। নাম বলে যান নি।'

'আপনাকে ডেকেছে কে?'

'তিনিই।'

'তিনিই! টাকা দেবে কে আপনাকে?'

'আপনার বাবা। সব তিনি ঠিক করে দিয়ে গেছেন।'

অধিপ একবার উঠতে চেষ্টা করল। পারল না। শরীরে ব্যথার যেন আর শেষ নেই।

বাইশ

চিঠিটা আবার পড়ল তামসী। এই জায়গাটা :

'এই তোমার মূর্তিমান? একটা ঘৃণ্য চোর? তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত, তামসী। একেই কিনা তুমি একদিন—'

লজ্জিত হওয়া উচিত। ডান হাতে কপালটা চেপে ধরে হেঁট-মাথায় তামসী ঝিম মেরে বসে রইল।

হ্যাঁ, হাজতেই আছে। জামিন দেয়া হয়নি। কে দাঁড়াবে তার জন্যে? কে তাকে চেনে? কে আছে তার আপন জন?

তামসীর বুকের ভিতরটা কেঁপে-কেঁপে উঠল।

তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত, তামসী। কী করেছে সে শোনো। আমার সঙ্গে এসে দেখা করেছে তোমার নাম করে। বলেছে, ধর্মঘট নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার জন্যে তোমার চাকরি গেছে। বড় দুঃখে পড়েছ তুমি, কিছু তোমার সাহায্য দরকার। লিখে জানাতে সংকোচ হয় তাই পাঠিয়েছ তাকে। দুঃখে পড়ে টাকা চেয়ে পাঠাবার মত তুমি মেয়ে নও বলেই জানতুম, কিন্তু লোকটা এমন প্রতীতির সঙ্গে কথা কইল, অবিশ্বাস করতে পারলুম না। তবু জিগগেস করলুম, আপনি কে? বললে, ওদের সংঘের কর্মী বললে যদি না দেন তাই বলি আমি ওর বন্ধু। কথাটায় খুব রস দিয়ে বললে। মজে গেলুম। বসালুম এনে আমার ছোট্ট পড়ার ঘরটিতে। ভাবলুম, সামান্য কটা টাকা,

ঠকলে ঠকব, তবু তোমার নাম যখন উঠেছে তার অমর্যাদা করব না। শোবার ঘরে এসে আলমারি খুলে টাকা বার করলুম। টাকাটা হাতে পেয়েই একটা নমস্কার ঠুকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। তোমার সম্বন্ধে আরো যে একটু মন খুলে আলাপ করব তার সময় দিল না। লোকটা চলে যেতেই যেন মনে হল ঘরে কী নেই। কী নেই? টেবিলের উপরে আমার সোনার রিস্ট-ওয়াচ আর ফাউণ্টেন পেন। দরজার বাইরে, ভদ্রতার বাইরে গিয়ে ডাকাডাকি স্থরু করলুম, কিন্তু চোরকে কোথাও দেখা গেল না। উনি, কলেক্টর সাহেব, তাঁর পশ্চিম-ঘরে বসে জরুরি মিটিং করছিলেন, সে-মিটিং ভেঙে দিলুম তক্ষুনি। দিকে-দিকে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লে এখুনি ধরতে পারা যায় হয়তো।

শুনলুম, মিটিঙে কে একজন এসেছিলেন সাইকেল করে, সেই সাইকেল নিয়েই ভেগে গিয়েছে চোর। কিন্তু কোথায় যাবে, কার শাসনেব দড়ি ছিঁড়ে? কার কড়া হুকুমের তাঁবে রয়েছে এই শহর-জিলা? বিকেলের মধ্যেই বামালসহ ধরা পড়ল চোর। দেখলাম তোমাব সেই গুণধরকে। তোমার সেই রণধীর।

ছি ছি ছি। একেই কিনা তুমি—

মুহূর্তে মন ঠিক করে ফেলল তামসী। সে যাবে, যাবে রণধীরের কাছে। যাবে তার সাহায্যে। তার বিপদবারণে। গয়নার বাক্সটা এতদিনে হয়তো নিঃশেষ হয়ে গেছে। হয়তো এত দিনেও একটা সুস্থ, ভদ্র চাকরি জোগাড় করতে পারেনি। ঘর বাঁধবার মত পায়নি এখনো মানুষের সন্ধান। সে দেবিকার কাছে গিয়ে ভিক্ষা চাইবে রণধীরকে। বলবে, ছেড়ে দে আমার হাতে। আরেকটা সুযোগ দে তাকে নীরোগ হবার। আমার জামিনদারিতে। চোখের জলে মুচলেকা সই করে দিচ্ছি। বিশ্বাস কর, হাতে পেয়ে হাতে করে গড়ব তাকে। নির্মাণ করব।

তামসী চারদিকে চোখ ফেরাল। চারদিকে তার নির্মাণের স্বপ্ন লেখা। শরীরের মাঝে আত্মার আবিষ্কার। বাসনার থেকে বন্ধুতার উদ্ঘাটন। জড়তার থেকে প্রাণকর্ম। চিতানলের থেকে হোমানলের দীপ্তি। তার গৃহরচনা। তার দেশরচনা।

ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই তার গৃহ। অপচিত পথচ্যুত মনুষ্যত্বের মধ্যেই তার দেশ।

সমস্ত রাস্তা ট্রেনের ভিড়ে এক চমকও ঘুমুতে পারেনি তামসী। আবোলতাবোল ভেবেছে। একদিন একই কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিল তারা পাশাপাশি। আকাশের চন্দ্র-সূর্যের মত। দুইই কি আজ অস্ত গিয়েছে? আজ একজন চোর, আরেকজন—সমরেশের কথাটা কি মনে পড়ল?

না, পাথরে আগুন ফোটাবে তামসী। আরেকটা শুধু পাথর দরকার। যে করে হোক, ছাড়ান আনবে রণবীরের। তাকে কাছে বসিয়ে সব কথা তাকে বুঝিয়ে বলবে। বলবে, কী আশ্চর্য, আমার কাছে তোমার ভয় কি, লজ্জা কি, অনুতাপ কি। আমাদের আপোশের মামলা, আপোশে মিটমাট হয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, আবার আমরা পথের থেকেই আরম্ভ করব, একেবারে মাটির থেকে। এই মাটিই আমাদের ঘর। মাটিই আমাদের দেশ। আকাশের চন্দ্র-সূর্য জ্বলবে মাটিতে।

তুমি এসো। আমার হাত ধরো। আমি তোমাকে নির্মাণ করব না। আমি হব তোমার প্রণীতা।

সকালবেলা। স্টেশনে নেমে একটা গাড়ি নিল তামসী। গাড়োয়ানকে চমকে দিয়ে বললে, 'ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কুঠি।'

ফটকের কাছে গাড়ি আটকাল কে। ভিতরে ঘোড়ার গাড়ি

যাওয়া বারণ। একটা তকমা-আঁটা চাপরাশি এসেছিল প্রায় তেরিয়া হয়ে। স্ত্রীলোক দেখে একটু ভেবড়ে গেল। বললে, 'কাকে চাই ?'

বারান্দায় চটি জুতো পায়ে চলাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে দেবিকাকে। দরজা দিয়ে মুখ বাড়াল তামসী। দেবিকা এদিকে দেখেও দেখল না। এটা এখন চাপরাশির এলেকা।

'ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের স্ত্রীর কাছে এসেছি।'

'মেমসাহেবের কাছে ?' চাপরাশি সংশোধন করল: 'কিছু হন নাকি আপনি ?'

'হ্যাঁ, আমি তার ছোট বোন হই। আসছি কলকাতা থেকে।'

চমকে উঠল চাপরাশি। মনে-মনে সাত হাত জিভ কাটল। সাহেবের শালিকে গেটের বাইরে আটকে রেখেছে। সসম্মানে নিয়ে এল তাকে ভিতরে, অন্দরমহলের বেয়ারার কাছে চালান দিলে। বললে, মেমসাহেবের বোন।

দেবিকাকে দেখা গেলনা কাছে-পিঠে। কোথায় সরে গিয়েছে সুট করে। বোধ হয় অঘোষিত অবস্থায় বহির্গত হবার রেওয়াজ নেই। কিম্বা, কে জানে, সত্যিই হয়তো দেখতে পায়নি তামসীকে। কিম্বা, এও হতে পারে, চিনতে পেরেছে তাকে, বুঝে নিয়েছে কিসের জন্যে তার আসা। তাই অমন করে সরে গেল অবজ্ঞায়।

তাকে ড্রয়িংরুমে বসাল বেয়ারা। অন্দরমহল থেকে ঘুরে এল। বললে, মেমসাহেব বললেন কলকাতায় তাঁর কোনো বোন নেই। তাই এই কাগজটাতে নাম লিখে দিন আপনার।

এখানেও বুঝি কার্ড লাগে। তামসী বড়-বড় করে বাঙলায় তার নাম লিখল।

তবু তখুনি-তখুনি দেখা নেই দেবিকার। কার্পেট থেকে সিলিং

দেখে-দেখে তামসীর চোখ ক্ষয়ে গেল। দেবিকার কী হল কে জানে। বুঝতে পেরেছি। দাম বাড়াচ্ছে। একটু বা সাজগোজ করে নিচ্ছে। পাছে তাকে মিসেস-ম্যাজিস্ট্রেট বলে মনে না হয়।

যা ভেবেছে তামসী। পাটভাঙা ফর্সা শাড়ি পরেছে, চুলটা মুখটা ও ঠোঁটদুটো একটু ঠিক করে নিয়েছে। গলায় ঝুলিয়েছে একটা জড়োয়া নেকলেস।

'ওমা, তুই ? তামসী ? তুই কখন এলি ?'

তবু যেন খানিকটা আশান এল। ভাগ্যিস তুই বলে ডেকেছে। তুমি-আপনি বলেনি। তবু মনে হচ্ছে যেন মুখস্ত-করা পাঠ বলছে। ভুলে-যাওয়া কবিতার লাইনের মত। এখনকার স্মৃতিতে নেই আর সেই অনুভবের উত্তাপ।

'এই এলাম—' কুণ্ঠিতমুখে তামসী একটু হাসল।

কেন এলি, কিসের জন্যে, এ-কথার ধার দিয়েও গেলনা দেবিকা। যত আজে-বাজে কথা। যেন তামসীব আসাটা এক পাড়া থেকে আরেক পাড়ায় বেড়াতে আসা। যেন সমস্ত জরুবি কথা হয়ে যাবার পর এখন তারা কচুঘেঁচুর কথা কইছে। তুই সত্যি আগের চেয়ে অনেক রোগা হয়ে গেছিস, কিন্তু বেশ টান-টান দেখাচ্ছে। আমি আগের চেয়ে মোটা হয়ে গেছি, না রে ? জজসাহেবের গিন্নিরা মোটা হবে, আমরা কেন ? মফস্বলের জল-হাওয়ার দোষই এই, অল্প খাব বললেও বেশি খেতে হয়, এত ভেট-বেগাৱ এসে হাজির হয় না-চাইতে। তার উপর গত বছর একটা টুইন হয়েছে। অফুল ! ভেবেছিলুম মরে যাব। কিন্তু হাউ স্যুইট, ভারি মিষ্টি, এক ঢিলে দুই পাখি। রয়েছে ঐ ঘরে। একটা ছেলে, একটা মেয়ে। কী নাম রাখি বল তো ?

এমনি ধারা ধরা-ছোঁয়া-না-দেয়া কথা। ক্রোমিয়াম-প্লেটেড ফ্রেমে-

আঁটা এই কৌচগুলি ভারি সুন্দর, না? আঁকা-বাঁকা পায়ায় এগুলো পেগ-টেবল। এগুলো আখরোট কাঠের বাক্স, এটা তুলসী কাঠের, সিগারেট রাখবার জন্যে। যাই বল বাপু, বাঙালী মেয়ে, পানটুকু কিছুতেই ছাড়তে পারবনা। পানের রঙের যদি ভ্যারাইটি থাকত তা হলেই আর কথা ছিল না। হ্যাঁ, এই ডাবোর-পরাতগুলো জয়পুর থেকে আনা। এই নেকলেসটা কাল এসেছে। খুব মন্দ হয়নি, কী বল। ওমা, তোকে এক পেয়ালা চা দেব না? ব্যেরা! ব্যেরা!

বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাস হয় না। মন বলছে, চোখ, তুমি ভুল দেখছ; কান, তুমি ভুল শুনছ। চোখ-কান বলছে, মন, তুমি আনাড়ি।

গাড়োয়ান গাড়ি ভাড়ার জন্যে চেঁচামেচি করছে। চাপরাশি এসে নালিশ করল।

'চেঁচামেচি?' দেবিকা যেন ঘা খেল।

'ও, হ্যাঁ, ভাড়াটা দেওয়া হয়নি। এই নাও। আমার জিনিস দুটো নামিয়ে নিয়ে এস।'

'এইখানেই উঠলি নাকি?'

'কেন, আপত্তি আছে?' ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল তামসীর।

'না, আপত্তি কী, বেশ তো, থেকে যা না কদিন।' পারল না, মুখের উপর না বলতে পারল না দেবিকা।

ভিতরের ঘরে, মানে সংসারী ঘরে নিয়ে এল তামসীকে। একটি চায়ের প্লেটে করে দুখানি থিন এরোরুট বিস্কুট আর ছোট এক কাপ চা মস্ত একটা কাঠের ট্রেতে করে নিয়ে এল বেয়ারা। বারকোশটাই বড়, বস্তু অতি সামান্য। এদের সমস্ত জীবনেটাই হয়তো তাই।

প্রগলভ করে ঐ ড্রয়িংরুমটাই সাজানো হয়েছে, নইলে আর সব ঘরে

ছাপোষা গরিব কেরানির দুর্দশা। চোখে দেখেও অসম্ভব লাগে। নড়বড়ে তক্তপোষ, ছেঁড়া মশারি, তুলো-বের-করা তোষক। শিশু দুটো দুটো ঝুড়ির মধ্যে শুয়ে আছে। ভাঙা শিশি, ছেঁড়া জুতো, টাল-করা বিছানা-বালিশ। বলতে-কইতে ব্যেরা, কিন্তু আসলে চাকুর-ঠাকুর বলতে সেই একজন। যা প্রকাণ্ড লন তাতে তিনটে মালি লাগা উচিত, সেইখানে একটা মালি। ফুলের মধ্যে গজাচ্ছে কলাবতী আর গাছের মধ্যে কচু। মোটর একটা রাখতে হয়, আছে, কিন্তু স্বোফার নেই। নিজেই সাহেব ড্রাইভ করে। গাড়িও তেমনি বুঝদার, প্রায়ই ব্যারাম হয়ে হাঁসপাতালে গিয়ে পড়ে থাকে। লজঝর সাইকেল আছে একটা। চড়নদারের ভাবটা এমন যে লজঝর সাইকেলটাই একটা কীর্তি। আর, সাইকেলই বা কেন, আপিস বা আদালত বাড়িতে বসে করলেই বা ক্ষতি কি। এক মাঝে-মাঝে মফস্বল যাওয়া, তা পুলিশ-সাহেবের গাড়িই তো আছে।

এক নজরেই বুঝতে পেরেছে তামসী। বনেদী কৃপণ। শুধু একটা চলনসই ঠাট বজায় রাখবার জন্যে যেটুকু-না-করলে-নয় খরচ, বাকি সমস্তটা ব্যাঙ্কে, শেয়ারে-সার্টিফিকেটে, নানারকম লগনিতে। একটা কোট গায়ে দিয়ে পাচ স্টেশন কাটিয়ে দিচ্ছেন এই তাঁর খুব গর্ব। স্ত্রীর বেলায় একটু উদার হতে তাঁর নারাজি নেই, কেননা স্ত্রীই হচ্ছে তার বাইরেকার বিজ্ঞাপন, কিন্তু বাপু, ঘটে বুদ্ধি যদি থাকে, সোনাদানা করো, শাড়িটা একটু কমাও। কিন্তু, এমন আশ্চর্য, এক মেরুন রঙের জর্জেট সাত দিন পরলেও মেয়েরা বলবে, বা, ওটা আবার কবে কিনলেন?

টাইমপিস ঘড়িটাতে দশটা বেজেছে। দেবিকা বললে, 'এবার আসবেন উনি ভেতরে। বেবিদের আদর করতে।'

ঘণ্টায়-ঘণ্টায় বুঝি এমনি আসেন। এক ঘণ্টা পর-পর কাজের উৎসাহে ভাটা পড়ে।

'একে চিনতে পার ?'

স্ত্রীলোকের দিকে তাকাতে যেন কত অনিচ্ছা এমনি তাকাল নীলাচল। হামডি হয়ে পড়ে ঝুড়ির ছেলে-মেয়েকে আদর করছে। গায়ে আধা শার্ট, পরনে আধা প্যাণ্ট। তামসীর মনে হল শার্ট-প্যাণ্টের আয়ু পাঁচ স্টেশনের চেয়েও বেশি।

'আমাদের বিয়ের সময় দেখেছ।'

'তাই নাকি ?' যেন প্রায় বিস্ময়ের সীমান্তে এসে পৌছুল নীলাচল। মানে, তাঁর এত সৌভাগ্য, আমাদেব বিয়ের সময় তিনি ছিলেন ?

তামসী সাহসে বুক বাঁধল। 'কেন, তারো আগে একবাব আমরা দুজনে গিয়েছিলুম আপনার বাংলোতে। এক জনের সম্বন্ধে—'

'তোর ভুল হচ্ছে।' দেবিকা শুধরে দিল: 'সে আরেকজনের কাছে। এর কাছে নয়।'

'আমার কাছে হলেও আমার কিচ্ছু মনে থাকত না। মেমরিই যদি শার্প হত, তবে জীবনে আরো অনেক বেশি শাইন করতে পারতুম।'

তামসীর মনে হল রণধীরের কথাটা দেবিকা একেবারে মুছে দিতে চায় দেয়াল থেকে।

কিন্তু সে বলবে, জিজ্ঞাসা করবে, ভিক্ষা চেয়ে নেবে অনুনয় করে। কিন্তু কখন ? দুপুরবেলা, খাওয়াদাওয়ার পর। যখন তার আর দেবিকার মধ্যে নামবে সেই স্তব্ধতার ঘনিমা। আগে-আগে গ্রীষ্মের দুপুরে মেঝেতে পাটি বিছিয়ে শুয়েছে দুজনে, সমস্ত শব্দ যখন ঘুমে,

তখন তারা কথা বলেছে। কত কথা। দেশের কথা, ভবিষ্যৎ মনুষ্যত্বের কথা।

দুপুর ফিরে আসে, কিন্তু কথারা কি ফেরেনা?

দুপুরে দেবিকার অন্য কাজ। সমাজসেবা।

এখানে একটা মহিলা-সমিতি আছে, দেবিকা তার এক্স-অফিসও প্রেসিডেণ্ট। তার অর্থ, নিজের নামের জোরে নয়, স্বামীর চাকরির জোরে। যদি তাকে অর্চনা করে তার স্বামীর থেকে আদায় করতে পারে কখনো সবকারী চাঁদা। একটু বা নেকনজর।

আগের কলেক্টরের বউর নাম ছিল বাণী। তখন সমিতির নাম ছিল বাণী-সমিতি। এখন দেবিকার নামে দেবী-সমিতি হয়েছে। সবাইর ইচ্ছে এককালীন একটা মোটা চাঁদা দিয়ে এই নামটা দেবিকা পাকা করে গেঁথে দিয়ে যায় দেয়ালে। মেয়েদের দেবীত্বটা চিরস্থায়ী করে রাখে। তারপরে দানবী-মানবী কে কবে আসে-না-আসে তার ঠিক কি।

মাসে দুবার করে বসে, দু রবিবার। প্রায়ই দেবিকা যায় না, অথচ প্রতিবারই প্রত্যাশা করে তাকে সভাপতিত্ব করতে নিমন্ত্রণ করবে। সমিতির উপর তার বড় অবজ্ঞা। সেই কটা ভুল-কথা-ওলা গান, টুকে-লিখে-আনা প্রবন্ধ। সবশেষে সেই চেঁচামেচি, ঝগড়া-বচসা। বেশির ভাগই উকিলনী-মোক্তারনী, নীলাচলের ভাষায়, জটিলা-কুটিলা। রান্নাঘর, মেয়ের সম্বন্ধ, বেপাড়ার কেচ্ছা। চাৎকারে বাজখাঁই, আবার ফিসিরফিসিরে গভীরসঞ্চারী!

এবারও বিধিমত বলতে এসেছিল দেবিকাকে। নির্ধারমত বলেছিল দেবিকা, 'কি করে যাই বলুন, সময় কোথায়?' কিন্তু এখন, হঠাৎ, খাওয়া-দাওয়ার পর, দেবিকা ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে উঠল: 'আমাকে

এখন একবার আমাদের সমিতিতে যেতে হবে। আর বলিস কেন, আমি আবার তার প্রেসিডেণ্ট। না গেলেই নয়।'

সমিতি, মেয়েদের সমিতি। তামসীর মনটা ঝলমল করে উঠল। দেবিকা তা হলে সাধারণ মেয়েদের নীরস সংস্রব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়নি। সাধারণ সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার খোঁজ রাখার চেষ্টা করে এখনো। আর, অজানতে, মনে হয়তো বা অসাধারণ চিন্তার তাপ লাগে মাঝে-মাঝে।

'কী হয সমিতিতে ?'

মুখ-চোখ গম্ভীর কবল দেবিকা, মোটা গলায় বললে, 'সমাজসেবা।'

'যেমন ?'

'বন্ধনশিল্প, ফার্স্ট এড, প্রসূতিচর্যা। অল্পখরচে ঘরদোর ফিটফাট করতে শেখা, একটু বা গার্ডেনিং। এক কথায়, মেয়েরা যাতে সত্যিকারের সুগৃহিণী হতে পারে।' দেবিকা ঢোঁক গিলল, যেন বুঝতে পারল সুগৃহিণীত্বে বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই তামসীর। যেন তাই বললে সংকুচিত হযে, 'তুই একটু গড়া, আমি এক চক্কর ঘুরে আসি আর দিবানিদ্রা যদি অভ্যেস না থাকে, বই আছে, পড় বসে-বসে।'

এমন কিছু ভুরিভোজ হয়নি যে বিছানায় টান হতে হবে; আর পড়বার মত বই যা আছে তা নিতান্ত খেলো-মলাটের শস্তা ডিটেকটিভ উপন্যাস। ঝকঝকে মলাটের যে কটা মোটা বই ড্রয়িংরুমের ঘুরন্ত তাকে শোভা পাচ্ছে তা পড়বার জন্যে নয়, তা আসবাবের সামিল। এক উপায় আছে, নীলাচলের সঙ্গে গল্প করা। সম্ভব হলে, একটু বা তার সহানুভূতি জাগানো। কিন্তু ভদ্রলোক এখন খাটো পাজামা পরে পাশ-বালিশ জড়িয়ে পাশের ঘরে নাক ডাকাচ্ছেন।

আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল তামসী। মফস্বলের শহর দুপুরের

রোদে অসাড় হয়ে আছে। কোথাও এতটুকু শব্দ নেই, ধুলো নেই, ছায়া নেই। যেন একটা তৃষার্ত শূন্যতা তার বুক জুড়ে বসেছে। ভাবল, কোথাও বেরিয়ে পড়ে রাস্তা ধরে। কিন্তু, কে বলবে, জেলখানার দুয়ার কোন দিকে?

দেবিকার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। যাহোক, ফিরে এসেছে তাড়াতাড়ি। কিন্তু, একি, ফিরে এসেছে অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে। চোখে-মুখে আগুনের হলকা।

কী হল?

সভা ভেঙে গিয়েছে। ভেঙে দিয়েছি। এই সমিতিটাই ভেঙে দেব। ওরা ভেবেছে কী আমাকে।

কেন, ব্যাপার কী?

ব্যাপার যা হয়েছে তা সাংঘাতিক। আজকের সভায় দেবিকার যাবার কোন সম্ভাবনা ছিলনা দেখে মেয়ে-ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রীকে সভাপতি করা হয়েছিল। কিন্তু সভা আরম্ভ হবার পর আচম্বিতে দেবিকা এসে হাজির। সমিতির সেক্রেটারি তখন শিক্ষয়িত্রীর গা টিপলেন তার চেয়ারটা দেবিকাকে ছেড়ে দিতে। কিন্তু, শিক্ষয়িত্রী তেজী মেয়ে, রাজি হল না। দেবিকার জন্যে দূরের একটা খালি চেয়ার দেখিয়ে দিলে উদাসীন ভাবে। সেক্রেটারি তখন প্রকাশ্যে সভাপতিমনোনয়নের নতুন প্রস্তাব করলে। একবাক্যে সমর্থন করল সবাই। দেবিকার দাবি যে পশ্চাতে এলেও অগ্রগণ্য এ সন্দেহ করবারও কোথাও ফাঁক নেই। কিন্তু শিক্ষয়িত্রী কিছুতেই তার আসন ছাড়ল না। বলল, 'যথারীতি সভাপতি নির্বাচিত হবার পর এ সভার কর্তৃত্ব করব আমি, আর কেউই নয়, তিনি যে কেউই হোননা কেন। যতক্ষণ আমি এ সভা না ভেঙে দিচ্ছি ততক্ষণ আমার নির্বাচন নাকচ হবার নয়।'

প্রথমে গোলমাল, পরে গালাগালি, শেষে যখন প্রায় চুলোচুলির কাছে চলে এসেছে তখন শিক্ষয়িত্রী উচ্চকণ্ঠে সভাভঙ্গের ঘোষণা করলে। সেইটেই যেন দেবিকার বুকে হাতুড়ির ঘা বসাল। সবাই ছুটে-ছিটকে বেরিয়ে গেল একে-একে, বলে-কয়ে কিছুতেই আর তাদেরকে ফেরৎ আনা গেল না। শিক্ষয়ত্রীর পরিত্যক্ত চেয়ারে আর বসা হলনা দেবিকার।

শিক্ষয়িত্রীর উদ্দেশে দেবিকা বিষায়িত হয়ে উঠেছে: 'আমি জানি ঐ মেয়েটাকে। কেশো রুগী, যক্ষ্মা আছে। হাড়গিলের মত চেহারা। সমাজে-সংসারে তো ঠাঁই পাবে না, তাই রাজনীতি ধরেছে। হাল-বৈঠা কিছু নেই তাই হাওয়া বুঝে পাল তুলে দিয়েছেন। দাঁড়াও, পাল-ফোলানো বাব করে দিচ্ছি। ইস্কুল-কমিটিরও আমরাই প্রেসিডেন্ট, রাজনীতির ঝাঁজ আর আমাদেব কাছে ফলাতে হবে না।'

বিকেল পর্যন্ত মেজাজ এমনি তিরিক্ষি করে রইল দেবিকা। সাধ্য নেই তার সঙ্গে তামসী হৃদয়ের একটি নিভৃতি রচনা করে। তার মনের কথার পবিত্র পরিবেশ পায়।

কিন্তু সন্ধ্যা আছে। ছায়া আসছে দীর্ঘতর হয়ে। নদীর পারের নির্জনতায় নিশ্চয়ই তাকে বেড়াতে ডাকবে দেবিকা। ঘাসের উপর বসে তারা তারা-ফোটা দেখবে, দেখবে পাখিদের ফিরে আসা। তখন বলবে। পারবে না বলতে?

কিন্তু সন্ধ্যায় অন্য কাজ। পাঠচক্র। জজসাহেব প্রবন্ধ পড়বেন। বড় জ্ঞানী লোক, উপনিষদের কাষ্ঠকীট। যত না আইন বোঝেন তাব চেয়ে বেশি বোঝেন উপনিষদ। নাম্নে স্থখমস্তি। দেহটি বড় ক্ষীণ, অল্পাহারে স্থখ কই!

চক্র বসবে আজ দেবিকার বাড়িতে। নির্বাচিত মণ্ডলীর কাছে। প্রবন্ধের বিষয় রবীন্দ্রকাব্যে উপনিষদের প্রভাব।

প্রথমে আসছেন মেয়েরা। সব উঁচু-দাঁড়ের অফিসরের স্ত্রী। বসেছেন একটা আলাদা ঘরে। ঘন হয়ে। একটা ফুলদানির নিচে একটা কাগজের টুকরো চাপা দেয়া। কে না জানে মেয়েদের কৌতূহলের কথা। একজন কাগজের টুকরোটা তুলে নিলেন। কোনো গোপনীয় চিঠি নয়, একটা ক্যাশমেমো। মেমসাহেব কলকাতার এক নামকরা দোকান থেকে যে জমকালো দাম দিয়ে একটা নেকলেস কিনেছেন তারই রূঢ় বিজ্ঞাপন। শুধু চোখে দেখে না ঠিকমত মূল্য দিতে পারে তার জন্যে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো হচ্ছে। গয়নার গায়ে আর দাম লেখা থাকেনা, আব, কত দাম দিযে কিনলেন এ প্রশ্নটা কত মাইনে পান-এর মতই অশিষ্ট। কৃপণ মফস্বলে কারুই জহুরির চোখ নেই। তাই সভা করে সবাইকে জানাতে হলে কায়দা করে ক্যাশমেমো দেখানোটাই প্রশস্ত। নির্ভুল দলিলী প্রমাণ।

তামসীকে সঙ্গে করে দেবিকা ঘরে ঢুকল। ব্লাউজের গলা গভীরে নামানো, তাই একলক্ষ্যে সবাইর চোখ পড়ল নেকলেসের উপর। এমনিতে হয়তো চমকাত না কেউ, কিন্তু ক্যাশমেমোর অঙ্কপাত মনে করে সবাইর মোহাবেশ উপস্থিত হল। প্রশংসায় ঝংকৃত হয়ে উঠল সবাই। কী আশ্চর্য মানিয়েছে দেবিকাকে। কী ভীষণ দাম হয়েছে না-জানি। এ সব আর দেবিকার কানে মামুলি খোসামোদ শোনাচ্ছে না, শোনাচ্ছে আন্তরিক স্তুতির মত, খানিকটা বা ঈর্ষা-মেশানো। কেননা এদেরকে যে সত্যি-সত্যি ক্যাশমেমো দেখানো হয়েছে। অটুট দলিল।

কিন্তু সঙ্গের ওটি কে? আমার দূরসম্পর্কের আত্মীয়া, বিকারহীন মুখে বললে দেবিকা। পরিচিতি শুনে চমকাল তামসী। বন্ধু বলতে পারে না পাছে অহংকারে ঘা লাগে, বোন বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলতে পারে না পাছে পদমর্যাদার হানি হয়। দূরসম্পর্কের আত্মীয় বললেই

কেমন যেন তুঃস্থ ও নিরাশ্রয় শোনায়। শোনায় সাহায্যপ্রার্থীর মত। তামসীর বেশবাসের অকিঞ্চনতার সঙ্গতি আসে।

চক্র বসেছে বড় ড্রয়িংরুমে। সভা বসেছে কলেক্টরের কুঠিতে, প্রবন্ধ পড়ছেন জজসাহেব, তু'দলের কর্মচাবীরা ভিড় করেছে বারান্দা পর্যন্ত। সবাই পদস্থ, তাই সবারই পদবিশিষ্ট পোশাক পরনে। বাঙলা সংস্কৃতির সম্মান দেখাতে গিয়ে না কলেক্টর বাহাতুরের অসম্মান করে। শুধু জজসাহেবই একমাত্র উদ্দণ্ড ব্যতিক্রম। পরনে দেশী তাঁতের ধুতি, গায়ে গরদের পাঞ্জাবী, কাঁধে জরিদার মাদ্রাজী চাদর, পায়ে শ্রীনিকেতনের চটি। দেখাচ্ছে মঠবাসী আশ্রমগুরুর মত।

সুরু হল প্রবন্ধপাঠ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা—এই সূক্তের প্রতিপাদনেব সময় দেবিকার মহলে অস্পষ্ট গুঞ্জন উঠল। ত্যাগ করেই জজসাহেব ভোগ করছেন বটে। মাসের বাজার নায়েবনাজির করে দেয়, পিওনিচাকরি পেতে কে তুটো গরু কিনে দিয়েছে, কাঠ আর ঘি জোগাচ্ছে কোন কোথাকার কমন-ম্যানেজাব। কোন উকিল শীতের লেপ-তোষক কিনে দিয়েছে, কোন মুন্সেফ নেটের মশারি। আর এই যে পাঞ্জাবি-চাদর দেখছ এ দিয়েছেন কোন সবজজের বউ, জন্মদিনের উপহার।

'আব, কে জানে হয়তো এই প্রবন্ধটাও আব কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে।' এ-ডি-এমের বউ টিপ্পনি কাটল।

এখনও সেই পরনিন্দা, খলভাষ! তামসী হাঁপিয়ে উঠল। কিন্তু নিরুপায়, দেবিকাকে সে চটাতে পারে না। কুৎসা-কলঙ্ক শুনে তাকেও হাসতে হয় মৃতু-মৃতু। মাথা দোলাতে হয়।

হায়, কতক্ষণে দেবিকাকে পাওয়া যাবে নিরালায়? কতক্ষণে তার কাছে সে একটু কাঁদতে পারবে?

রাতের খাওয়ার পর তিন জন লনে পাইচারি করতে লাগল। নীলাচল পাইপ টানছে আর বিলেতের গল্প করছে। আর, শুনে-শুনে অর্ধভ্রমণ হয়ে যাওয়ার দরুন বর্ণনার অসম্পূর্ণতা সংশোধন করছে দেবিকা। তামসী উন্মনার মত শুনছে শুধু রাত্রির হৃৎস্পন্দন।

গুডনাইট জানিয়ে নীলাচল অন্তর্হিত হল। শেষ ফুলটাকে একটু নেড়ে আদর করে দেবিকাও চলে যাচ্ছিল, তামসী তার আঁচল চেপে ধরল। বলল, 'তোর সঙ্গে আমার অনেক কথা ছিল দেবিকা। একটু বোস আমার সঙ্গে। আমি কেন এলাম তোর কাছে, তা যে তুই একেবারেই জানতে চাইলিনা। এ আর আমি সহ্য করতে পারছিনা। আমাকে একটুখানি সময় দে।'

তেইশ

দুইজনে বসল একটা বেঞ্চিতে। পাতলা-পাতলা জ্যোৎস্না। রাতের শিশির পড়ছে নিঃশব্দে।

'আমি কেন এসেছি একবারো জিগগেস করবি নে?' দেবিকার ডান হাতটা তামসী চেপে ধরল।

'আমি জানি।' দেবিকার মুখে উপেক্ষাভরা কাঠিন্য।

'জানিস?'

'হ্যাঁ, ঐ গুণ্ডাটার জন্যে।'

নরম হৃৎপিণ্ডটা কে যেন চেপে ধরল নির্মমের মত। তামসী ঘন-ঘন দুটো নিশ্বাস নিল। বললে, 'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছিস, রণধীরের জন্যে। তোকে ধন্যবাদ।'

ঝাঁমটা মেরে উঠল দেবিকা : 'নাম বলে আর ব্যাখ্যানা করিসনে। ঢের হয়েছে। চোরকে বীরচূড়ামণি বলিসনে ঘটা করে।'

তামসী মুখ নামিয়ে রইল।

'ধন্যবাদ দি তোকে। বলিহারি! বলি, তোর লজ্জা করে না?' দেবিকার চোয়ালের হাড়টা শীর্ণতায় বড় তীক্ষ্ণ দেখাল।

'করে।'

'করে?'

'করে বলেই এত শক্ত করে ঢেকে রাখতে চাই বুকের মধ্যে।

লুকিয়ে রাখতে চাই। যেখানে ব্যথা সেইখানটাই বারে-বারে চেপে ধরে স্পর্শ করতে চাই ব্যথাটাকে।'

রাগে সারা শরীর রি-রি করে উঠল দেবিকার। বললে, 'ঐ ছোট-লোক চোরটাকে তুই ভালোবাসিস? ঐ স্কাউণ্ড্রেল লোফারটাকে? তুই একটা কী! এমনি অপদার্থ হয়ে গেছিস তুই?' তামসীর হাতটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ঝটকা মেরে।

'রাগ করিসনে। আমার জন্যে একটু দুঃখ কর মনে-মনে।' অশ্রুস্নানশান্ত তামসীর কণ্ঠস্বর: 'যাকে নিয়ে তোর সব চেয়ে বেশি লজ্জা তাকে নিয়ে তোর সব চেয়ে বেশি দুঃখ। যে প্রেম লজ্জিত তার মত বিষণ্ণ প্রেম আর কী আছে?'

এতটুকু স্পর্শ করল না দেবিকাকে। বললে, 'রাখ তোর বক্তৃতা। যে লোক পরের বাড়ি ঢুকে চুরি করে, পকেট মারে, বাক্স ভাঙে, তাকে তুই ভালোবাসবি? ভালোবাসতে তোর অপমান মনে হবে না? ঘেন্না ধরে যাবে না নিজের ওপর?'

'শুধু নিজের ওপর? বলতে চাস, তাকেই আমি ঘেন্না করি না?'

'ঘেন্না করিস?' চমকে উঠল দেবিকা। 'কাকে? তোর রণধীরকে?'

'বিষের মত ঘেন্না করি।'

কতক্ষণ অনড়ের মত তাকিয়ে রইল দেবিকা। বললে, 'যাকে ঘেন্না করিস তাকেই আবার ভালোবাসিস? এ হয় কখনো?'

'কী হয়?'

'যাকে ঘেন্না করা যায় তাকেই ফের ভালোবাসা যায়?'

'সত্যিকারের ভালোবাসা বুঝি সেইটেই। যাকে তুই ঘেন্না করিস তাকেই ফের ভালোবাসিস। যাকে ছুঁড়ে দিতে চাস তাকেই ফের

আঁকড়ে ধরিস। যাকে মারতে চাস তারই জন্যে কেঁদে বুক ভাসাস। নইলে, বল, সেইটেই কি প্রেম, যেখানে সব কিছু স্বচ্ছন্দ, সুন্দর, আশীর্বাদময়? সে তো খুব সোজা, সে কে না পারে? যে আহত, আনত, পদস্খলিত, তাকে ভালোবাসাটাই তো বড় কথা, তার অনাবিষ্কৃত মনুষ্যত্বকে মূল্য দেয়া। সেইটেই কঠিন, কিন্তু সেইটেই বোধ হয় খাঁটি। আর তুই নিজে যখন অপমানিত, প্রবঞ্চিত, তখনই তো তোর ভালোবাসা। যত তোর ঘৃণা তত তোর প্রেম।'

'বুঝিনে বাপু।' দেবিকা গলার স্বরটা মোটা করল। ভাবখানা এই : আমরাও তো একদিন প্রেম করেছি, কিন্তু, এমন কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান হারাইনি। 'তা বলে একটা চোর-ছ্যাচোড়কে ধরতে হবে?'

'অনেকবার নিজেকে জিগগেস করেছি, কিন্তু উত্তর পাইনা। একটা কুৎসিত মুখকে কেন যে সুন্দর লাগে কে বলবে। কারণ নেই, অর্থ নেই। এ টানের কোথায় যে উৎস কে দেবে তার ঠিকানা! তোকে বলতে বাধা নেই দেবিকা, ভীষণ অসহায় লাগে নিজেকে, জিজ্ঞাসা করবার ধৈর্যও সহ্য হয় না। কিন্তু তোকে বলি, এই অসহায়তাই আমার শক্তি, এইখানেই আমার বিশ্বাস।'

আগের কথারই খেই ধরছে দেবিকা। 'যদি তবু দেশের জন্যে ডাকাতি করে ধরা পড়ত—'

তার বদলে পেটের জন্যে চুরি করে ধরা পড়েছে। কিন্তু যে দেশ আমাদের আসছে সে দেশে আর কেউ ঘৃণ্য নেই, ব্যর্থ নেই, অপাঙক্তেয় নেই। সেই দেশই ওকে আরেকবার দেখাতে চাই, দেবিকা।'

এই বুঝি এসে পড়ল রাজনীতি। দেবিকা ছটফট করে উঠল। ঝাঁজালো বিরক্তির সুরে বললে, 'আমাকে তুই কী করতে বলিস শুনি?'

'ওকে ছেড়ে দে। আমার হাতে ছেড়ে দে।' তামসী আবার দেবিকার হাত চেপে ধরল: 'আমি ওকে মানুষ করি, নিষ্কলুষ করি। ও আমাকে কঠিন করুক, বিশুদ্ধ করুক। তারপরে দুজনে আমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে অভিবাদন করি আমাদের নতুন দেশকে, নতুন অভ্যুদয়কে। এ হয় না? হয় না এটুকু? পারিস না ছেড়ে দিতে?'

'যে লোক বন্ধু সেজে ঘরে ঢুকে চুরি করে পালায় তাকে ধরতে পেয়ে ছেড়ে দেব এ কোন দেশের রাজনীতি?'

'তোর যা ক্ষতি তা হয়তো সামান্যই, আমার যা ক্ষতি তাকেও না-হয় সামান্যই বলব, কিন্তু তার যা ক্ষতি হবে তার বোধহয় তুলনা নেই। উজ্জ্বল সম্ভাবনার আভা একদিন জ্বলেছিল তার চোখে, তার সে-চোখ ভয়ে লজ্জায় বিমর্ষতায় অন্ধকার করে দিসনে। সত্যি, ছেড়ে দেয়া যায় না? তুলে নেয়া যায় না মামলা?'

অসম্ভব।

ঘটনাটা কী, খুঁটিয়ে দেখতে হবে। স্বয়ং কলেক্টর সাহেবের বাড়িতে রাহাজানি। আর, বলি, জিনিস কার? তাঁর স্ত্রীর, মিসেস কলেক্টরের। সমস্ত জেলা-জোড়া যাঁর প্রতাপ, তা শুধু তাঁর স্ত্রীর বেলায় অপ্রকট থাকবে? স্ত্রীর কাছে তাঁর বলৈশ্বর্যের প্রমাণ হবে না? কত বড় যোগ্য স্বামীকে বিয়ে করেছে নিজ চোখে দেখে যাবে না তামসী?

কিন্তু দেবিকার ক্ষমতাও বা কম কোথায়! যদি স্বামীকে ধরে আসামীকে ছাড়িয়ে আনতে পারে সেইটেও তো তার কম বাহাদুরি নয়। কিন্তু তাতে শুধু তার স্ত্রীত্বের মহিমা, কলেক্টরের স্ত্রী হবার দরুণ বিশেষ কোনোই কেরামতি নেই।

'তুই শেষকালে একটা গুণ্ডার জন্যে আমার কাছে প্লিড করবি?'

চাবুকের বাড়ির মত লাগল তামসীর মুখের উপর।

'আর আমি ওঁর কাছে গিয়ে মুখ ফুটে বলব ঐ গুণ্ডাটা তোর লাভার?'

তামসী মুখ ঢাকল দু হাতে।

'এ তো তোর বড় আবদারের কথা। চোর ধরা পড়েছে তো তাকে সাজা দেয়া যাবে না। আগুনে হাত পুড়েছে তো পারবে না জ্বালা করতে। রাজ্যে আর তোর মানুষ ছিল না ভালোবাসবার?'

তামসী স্তব্ধ হয়ে রইল।

'টাকার দরকার মনে করিস দিতে পারি, আসামীর জন্যে মোক্তার দিতে পারিস ইচ্ছে করলে। যদিও ডিফেণ্ড করে কিছু লাভ হবে না। তার চেয়ে প্লিড গিলটিই ভালো। শাস্তি কিছু কম হতে পারে।'

'না, টাকার দরকার নেই। আমি কালই চলে যাব।' তামসী উঠে পড়ল।

পরদিন সকালে উঠে তামসী বেরুলো শহরের দিকে। মোক্তারের সন্ধানে। ঐ তো, ঐ আস্তাবলের পাশে বিরিঞ্চি মোক্তারের বাড়ি, সাইন-বোর্ড আছে। হ্যাঁ, বিরিঞ্চি মোক্তার পাকা মাঝি।

কলাইয়ের বাটিতে চা নিয়ে তাতে বিস্কুট ভিজিয়ে-ভিজিয়ে খাচ্ছেন বিরিঞ্চি, তামসী ঘরে ঢুকল। ঘরে আর লোক নেই, শুধু একটা বুভুক্ষু ছোট ছেলে বাপের নিষ্ঠুর গ্রাস থেকে বিস্কুটের অংশ পাবার জন্যে নিষ্ফল চেষ্টা করছে। আর চেঁচাচ্ছে।

একটা মুখের মধ্যে এতগুলো গর্ত থাকতে পারে আর সে সব গর্তের ধারে-ধারে এতগুলো চোখা হাড় একসঙ্গে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে এ আর তামসী দেখেনি। আর, মুহূর্তের জন্যে, কে মোক্তার কে মক্কেল বিরিঞ্চির হুঁস রইল না। সেই ফাঁকে অধ্যবসায়ী ছেলেটা মুখের থেকে বিস্কুটের শুকনো আদ্ধেকটা কেড়ে নিলে ছোঁ মেরে।

কি চাই? চাঁদা? আঁতুড় ঘর? সেলাইর কল? না, ইনসিওরেন্সের দালালি?

'একটা কেস সম্পর্কে আপনার কাছে এসেছি।'

যতদূর দীর্ঘ করা যায় শেষ চুমুক দিয়ে বাটিটা বিরিঞ্চি ছেলের হাতে চালান করে দিলেন। বিস্কুটের গুঁড়ো-মাখানো হাতটা কাপড়ে মুছতে-মুছতে বললেন, 'ব্যাপার কী? তিন শো ছেষট্টি না চার শো আটানব্বুই?'

তামসী থমকে দাঁড়াল।

'ধারা জিগগেস করছি। কোন ধারা? না, অদৃষ্টে শুধুই অশ্রুধারা?'

ব্যাপারটা মোটামুটি বললে তামসী। বললে, 'না, অশ্রুধারা নয়। টাকা দেব, যত লাগে। হাজিরের তারিখটা জানুন আর একটা জামিনের ব্যবস্থা করে দিন।'

মাড়ির থেকে বিস্কুটের চর্বিতাংশ জিভের উপর আনবার জন্যে বিরিঞ্চি মুখের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়েছিলেন দাঁতের কামড় পড়ে গেল। বললেন, 'সেই কলেক্টরের বাড়ির চোর? কী ভয়ানক!'

ভয়ানকটা কে, কলেক্টর না চোর, বুঝতে পারল না তামসী। বললে, 'চোর যতই ভয়ংকর হোক, মুক্তি না পেলেও মোক্তার তো সে পেতে পারে।'

'কিন্তু আমাকে নয়, মাপ করবেন।' বিরিঞ্চি হাত জোড় করলেন: 'জামিন দাঁড়িয়ে থাই, কলেক্টর-এস-ডি-ওর বিরুদ্ধ হতে পারব না। কলেক্টরের বাড়িতে ঢুকে চুরি করেছে, কে জামিনদারির দরখাস্ত করবে? দরখাস্ত করলেই বা কি। ম্যাজিস্ট্রেট মঞ্জুর করবে নাকি?'

'কিন্তু তার বিরুদ্ধে তো আপিল আছে জজের কাছে।'

'হ্যাঁ, সেই সঙ্গে এক কুড়ি চীনে হাঁস বা আঁকাবাঁকা শিং-ওয়ালা হরিণ বা অন্তত একটা দুগ্ধাল গরু দরকার। পারবেন জোগাড় করতে?'

'কিন্তু যদি তার অসুখ হয়ে পড়ে?'

'তা আর বিচিত্র নয়। পুলিশের হাতে যা মার খেয়েছে শুনেছি, কে জানে হয়তো হাঁসপাতালেই আটক আছে। তাই সরকারী ডাক্তারের শরণ নিন। ব্যথা-ট্যথা কিছু হয়েছে বলে তাকে একবার কল্ দিন আগে। এখানে হাতে-হাতে কারবার, একটা সার্টিফিকেট জোগাড় করে নিতে কষ্ট হবে না। চমচমে সার্টিফিকেট দেখলে ম্যাজিস্ট্রেট নরম পড়বে নিশ্চয়।'

'কিন্তু তখনো তো পেশাদার জামিনদার একজন সেই মোক্তারেরই দরকার হবে। আপনি—'

'ওরে ব্বাবা, আমি নয় কিছুতেই। আমার ও-অশ্রুধারা থেকে এ-অশ্রুধারা অনেক ভালো। কখন কে কোথায় হাজির-জামিনি জব্দ করে বসে, মারা যাই আর কি। আমি কেন, কেউ এগোতে সাহস করবে না। এখানে কে চেনে আপনাদের? জামিনে ছাড়া পেয়ে আসামী যদি ভাগে তবে কে তার পিছু নেবে? আপনি যে আপনি আপনারই বা ঠিকানা কি।'

এদিকটা ভেবে দেখেনি তামসী। সত্যিই তো, ছাড়া পেয়ে কোথায় যাবে তারা, কোন গৃহচ্ছায়ায়? কোথায় তাদের আশ্রয়, তাদের অন্তরঙ্গ নির্জনতা? দুঃখের আগুন সামনে রেখে কোথায় পাবে তারা মুখোমুখি বসবার জায়গা? যদি আবার রণধীর পালায়! যদি আবার চুরি করে! সত্যি, কে নেবে তার দায়িত্ব?

তামসী হাতের ব্যাগ থেকে দুটি টাকা বের করে রাখল টেবিলের উপর। উঠে চলে গেল নিঃশব্দে।

'দু নয়নে দশ ধারা হল না, আমারই কপাল মন্দ।' বিরিঞ্চি টিপ্পনি কাটলেন।

তামসী রাস্তায় নেমে এল। কোন দিকে যাবে ঠিক করতে পারছে না।

এমন সময় একটি যুবক সামনে এসে দাঁড়াল। সস্মিত মুখ, বলিষ্ঠ অভয় তার আবির্ভাবে। বললে, 'আমার সঙ্গে আসুন। ভোলাদা'র বাড়ি। ভোলাদা এখানকার স্বদেশী মোক্তার।'

স্বদেশী মোক্তার মানে বিনি পয়সায় ব্যবসা করেন নাকি? না, শুধু স্বদেশী মোকদ্দমার আসামীদের পক্ষ নেন?

আসলে ওসব কিছুই নয়। স্বদেশী মোক্তার মানে মোক্তার বটে, কিন্তু মোক্তারি করেননা, শুধু তদবির করেন। জানেন সব তদবিরের ঘাঁতঘোঁত।

সরকারী মহলের এমন দু-একটি তাঁবেদার, হয় উকিল নয় মোক্তার, চেনা যায় প্রায় প্রত্যেক সদরে-মফস্বলে। উপরালার সঙ্গে খাতির জমায়, দহরম-মহরম করে। ধামাটা ঝুড়িটা এগিয়ে ধরে। যত সরকারী খিটকেল তার ঝঞ্ঝাট পোহায়। কোথায় কি কৃষি-প্রদর্শনী হবে তার মেরাপ বাঁধে। কোথায় কোন সভায় কে বক্তৃতা দেবে পাড়াগাঁ থেকে শোনবার লোক ধরে আনে। কোথায় কার বদলিতে পার্টি হবে তার ফুলের মালা জোগাড় করে, নাম-লেখা কেক আনে আর ক্ষণে-ক্ষণে হ্যাসাগে পাম্প করে সভার জেল্লা বাড়ায়। সরকারী সকল ঘটে আম্রপল্লবটি হয়ে আছে। কিংবা কলসীর নিচে হয়ে আছে খড়ের বিড়ে। বাব-দাব খুব, খুব চৌচাপট। মামলায় নেই কিন্তু তদবিরে আছে; সওয়ালে নেই, কিন্তু আছে সুপারিশে। সামনে থেকে পেশ নয় পাশের থেকে পেশ। তোমার কি চাই? লাইসেন্স? নমিনেশুন? তোমার? তুচ্ছ একটা জামিন?

সব জায়গায়ই দেখতে পাবেন একটি-দুটি। এক কথায়, বেসরকারী রাজার-সরকার। দরবারে-কারবারে কোটের উপর মেডেল ঝোলায় আর মাথায় শামলা আঁটে। সব জায়গায়ই আছে, না থাকলে গভর্ণমেণ্ট চলে না। অমুক জায়গার অমুক বাবু, তমুক জায়গার তমুক বাবু, এই শহরের ভোলা বাবু।

'ভোলাদা ছাড়া কেউ কিছু সুবিধে করতে পারবে মনে হয় না। সেই কলেক্টরের বাড়ির চুরি তো?'

'হ্যাঁ।' তামসী চোখ নামাল।

'মোটা হাতে কিছু টাকা নেবে ভোলাদা, কিন্তু ঠিক জামিন্ করিয়ে দেবে। কলেক্টরকে বললেই টাউন-জামিন দিয়ে দেবে ঠিক, তা টাকা আছে তো আপনার কাছে?'

'আছে। অসাধ্য না হয়, দেখা যাবে।'

'আপনার কে হয়?' তামসীর চোখে চোখ রাখল নারায়ণ।

'বিশেষ কেউ নয়। এমনি চেনাশোনা —'

'বিশেষ কেউ হলেও লজ্জিত হবার কিছু নেই, মরতে যে বসেছে তার লজ্জার চাইতে তাকে যে বাঁচাতে চেষ্টা হচ্ছে তার গৌরবটাই দেখবার মত। আত্মহত্যা এক জিনিস, আত্মদান আর-এক।'

হৃদয়ের গভীরে এসে সুর লাগল। কে এই লোকটি?

লোকটি ছন্নছাড়া, বাউণ্ডুলে। কারু যদি কোনো উপকারে আসে তারই উপায় খুঁজে বেড়ায়। আর, বলুন, পরের কাজ করা মানেই দেশের কাজ করা। আর, এমন মজা, যাদের বলছি পর, তারাই আমার আপন। এই সব চাষা-ভুষা, মুনিষ-কিষান, মুটে-মজুর। যারা অধম, যারা গরিব।

আর, ভুলে গেছি বলতে, যারা আসামী। যারা রাজদ্বারে অভিযুক্ত।

তামসী হেসে ফেলল।

কিন্তু ভোলাদার হাসি মুখ ছেড়ে সমস্ত টাকের উপর ছড়িয়ে পড়ল। এত দিন যে কেন আসেননি আপনারা তাই বুঝতে পারছিলাম না। এই দুর্যোগে আমি ছাড়া আর সঙ্কট-ত্রাণ কোথায়? সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। আমাকে লোকে এখানে মোক্তার বলে না, ব্যারিস্টার বলে। কেন বলে? শুধু কলেক্টরেব কাছাকাছি আছি বলে। কলেক্টরের কাছে গিয়ে তাক বুঝে এক টাক হাসলেই জামিন করিয়ে আনতে পারব। আর, আমার হেপাজতে থাকাও যা হাজতে থাকাও তাই। সেকেণ্ড অফিসারের ঘরে মামলা, চাই কি, একটু কষামাজা করে খালাস করিয়েও আনতে পারি হয়তো। তামসীব বুকের শিরাগুলো শিরশির করে উঠল। হ্যাঁ, পঞ্চাশটাকা রাখুন, তার এক ক্রান্তি কম নয়। যত টাকারই মুচলেকা হোক, আমার ঐ বাঁধা গৎ। নামে যেমন আমি ভোলা, কাজেও তেমনি আত্মভোলা, মানে স্বার্থভোলা।

নারায়ণের মুখের দিকে চেয়ে সাহস খুঁজল তামসী। পাঁচটি দশ টাকার নোট নয়, বুকের থেকে পাঁচখানি পাঁজর খুলে দিল। বললে, 'কোর্টে আমাকে যেতে হবে?'

না, না, আপনি যাবেন কেন? আপনি উঠেছেন কোথায়? নারানের আস্তানায়? হরি ঘোষের গোয়ালে? যেখানেই উঠুন, বিকেলে বেড়াতে-বেড়াতে আসবেন একবার এখানে। এসে দেখবেন আপনার লোক আপনার জন্যে ঠায় বসে আছে পথ চেয়ে। নারানের যেমন একটি গোয়াল আছে, আমার তেমনি একটি খোঁয়াড় আছে। টাউনজামিন হয়ে যাদের ছাড়িয়ে আনি তাদের আখড়া। আপনার সঙ্গে আপনার লোকের কি সম্পর্ক জানিনা, যদি তেমন কিছু হয়, এক

সঙ্গে এক ঘরে থাকবারও বন্দোবস্ত হতে পারবে। অনেক টাউন-জামিনের জন্যে বাড়ি থেকে স্ত্রী আনিয়ে দিয়েছি। তার জন্যে অবিশ্যি আলাদা ফি আছে—'

নারায়ণের চোখদুটো বিরক্তিতে বিষাক্ত হয়ে উঠল।

'কথাটা কিছু মন্দ বলিনি হে সন্নেসিঠাকুর। স্ত্রী অর্থই স্ত্রীলোক নয়। পত্নীভাযাও বোঝায়। টাউন-জামিনে থেকে মন যখন বিগড়ে যায়, আবার চুরি-ডাকাতির দিকে ঝোঁক পড়ে, তখন স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে এক রাত্তির থাকতে দিয়ে বিষ কাটাই। আমার এটা শুধু জেলখানা নয়, এটা হাঁসপাতালও। বাঁধি-ধরি, আবার চিকিৎসা করি। তুমি কি বুঝবে স্ত্রীলোকের কুদরৎ ?'

'আচ্ছা, বিকেলে আসব।' তামসী বললে সুখস্বপ্নের চোখে।

'একসঙ্গে এক ঘরেই থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই। ইচ্ছে করলে আপনারা এখান থেকে চলেও যেতে পারেন আপনাদের খোদ বাড়িতে। নারান যখন আপনাদের মুরুব্বি তখন আর কোনো ভয় নেই। আর, ভয় করব কাকে ? কলেক্টরের এলেকা জেলা, আর আমি যে টাউনের জামিনদার তার এলেকা মাপবার আমিন হয়নি বাংলা দেশে। শুধু তারিখের দিন একবার হাজির হলেই হল। নয়তো জমকালো লেটার-হেড-ওলা একটা ডাক্তারী ফারখত।'

বিশ্বাস করবে কিনা কে জানে, ফিরে আসতে-আসতে নারায়ণ বললে, 'যদি পারে ভোলাদাই পারবে। আর যদি না পারে টাকা নিয়ে তাকে সটকাতে দেব না।'

'না, না, টাকা যাক। টাকা ফেরৎ চাইনা আমি। আমি ফেরৎ চাই—'

কথাটা শেষ করতে পারল না তামসী। কী ফেরৎ চায় ? ফেরৎ

চায় রণধীরকে ? না, সেই তাদের পরিচ্ছন্ন অতীত, যখন দেখা যায়নি এই বর্তমানের চেহারা ! সেই তাদের জীবনের প্রথম একমেটে প্রতিমা !

রোদ চড়ছে। নারায়ণ বললে, 'কোথায় আছেন ?'

'এই এক বন্ধুর বাড়িতে।' তামসী প্রশ্নটার পাশ কাটিয়ে গেল। 'আমাকে একটা গাড়ি ডাকিয়ে দিন। অনেক উপকার করেছেন আমার।'

গাড়ি করে লক্ষ্যহারার মতো ঘুরল এখানে-ওখানে। কোনো চিন্তার স্পষ্ট একটা ছবি ফোটাতে পারলনা মনের মধ্যে। সমস্তই হয়তো ছলনা এই সন্দেহের দুয়ার খোলা গেলনা কিছুতেই। দেখা গেল না ঘরের মধ্যেকার সম্ভাবনার মূর্তিকে। অল্প-অল্প খোলে, প্রতিমার ডাকের গয়না ওঠে একটু ঝলমল করে, আবার দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

'চলো ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কুঠি।' গাড়োয়ানকে চমকে দিয়ে হেঁকে উঠল তামসী।

'তোর জন্যে বসে আছি।' দেবিকা বেরিয়ে এল। 'কোথায় ছিলি এত বেলা ?'

'শহর দেখছিলুম ঘুরে-ঘুরে।'

'আমি ভাবছিলুম রণধীরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল নাকি রাস্তায় !' নিষ্ঠুরের মতো দেবিকা সূক্ষ্ম করে একটু হাসল। 'পরে ভাবলুম, তা কি করে হয় ? জেলের চাবি তো আমার আঁচলেই বাঁধা, গোছা খুলে নিয়ে যেতে পারিসনি ছিনিয়ে। পরে মনে হল, চলে গেলি নাকি ?'

'ট্রেন তো রাত্রে।'

'দেখলুম মাল দুটো পড়ে আছে। ভাবলুম তবে নিশ্চয়ই একবার ফিরে আসবি।' দেবিকা আরেকটা হাসির কণ্টক ফোটালো। যেন রণধীরকে সে ছাড়তে পারে কিন্তু এই মাল দুটো ছাড়তে পারে না।

স্নান করে খেয়ে অন্যমনা হয়ে চুপচাপ বসে ছিল তামসী। একটি সামান্য বিকেলের জন্যে কোনোদিন তার এত উৎকণ্ঠা হয়নি। বাইরে নিশ্চল রোদের দিকে তাকিয়ে আছে সে শূন্য চোখে। একটা নেশার মত লাগছে। সামান্য রোদ যে এত সুন্দর লাগে তা কে জানত।

দেবিকা পাশের ঘরে বসে উল বুনছে। তামসীর সঙ্গ ক্লেশকর হয়ে উঠেছে। যত কথাই সে বলুক না কেন, যতই ঘরোয়া বা হালকা, সব কথার অন্তরালে একটা ভিক্ষার কাতরতা সে শুনতে পায়। শীতের হাওয়ার মধ্যে যেমন মুমূর্ষু পাতার মর্মর থাকে প্রচ্ছন্ন হয়ে। আর যদি তামসী মুখ বন্ধ করে থাকে, সে স্তব্ধতাটা তো স্পষ্ট কষ্টের মত, রাগের মত মনে হয়। কী অন্যায়, কী অবিবেচক! বন্ধুতার জন্যে অকর্তব্য করতে হবে। মামলায় বস্তু নেই তবু জিতিয়ে দিতে হবে উকিলের খাতিরে। এমন কথা বলতে লজ্জায় ওর জিভটা অসাড় হয়ে গেল না? ছি ছি ছি! যে চোর, তার কোমরে দড়ি না দিয়ে গলায় বরমাল্য দিতে হবে? কথা বলবার আর জিনিস পেল না ও? তার চেয়ে ও টাকা চাইত, সুপারিশ চাইত, চাই কি চাকরি চাইত। তা না, মেখে চেয়ে বসল কিনা সিঁদেল এক চোরকে। ঘৃণায় সারা গা ঝলসে যাচ্ছে দেবিকার। সংসারে আজ মানুষের কত কাজ, কত চিন্তা, তার মধ্যে কিনা জেগে বসে কেউ প্রেমের জন্যে কান্না জুড়ে দিয়েছে! দেশের জন্যে সংগ্রামে মানুষের আজ কত কঠিন হবার কথা, কত অনম্র। তার বদলে এই বিলাস, এই অস্বাস্থ্য। আইন ও শৃংখলার দুর্গে বসে এই দুর্বলতা বরদাস্ত করা যাবে না। উলের কাঠি দুটো দ্রুতবেগে নড়তে লাগল দুই হাতে। যদি পারত, দেবিকা এখুনি এক ফুঁয়ে দিনের আলো নিবিয়ে অন্ধকার করে দিত। রাত্রের ট্রেনে এখুনি রওনা করিয়ে দিত তামসীকে।

কিন্তু দুপুর থাকতে-থাকতেই নীলাচল বাড়ি ফিরে এসেছে।

'তোমার সেই আসামীর আজ জামিন হয়ে গেল।'

'কোন আসামীর?' হাতের সেলাই বন্ধ হয়ে গেল দেবিকার।

'যে তোমার ঘড়ি-কলম চুরি করেছিল—'

'তাকে তুমি জামিন দিলে?' চেয়ার থেকে এক ঝটকায় লাফিয়ে উঠল দেবিকা। 'তার মানে? তোমার এই মতিচ্ছন্ন হবার কারণ কি? তোমার কাছে নিরিবিলিতে গিয়েছিল বুঝি তদবির করতে?'

'কী বলছ তুমি?' নীলাচল কিম্ভুতের মত চেয়ে রইল।

'একটা মেয়েমানুষের কান্নায় তুমি তোমার কর্তব্য ভুলে গেলে? এক চোর ঘরে ঢুকে জিনিস চুরি করে নিল, আরেক চোর এসে মন কেড়ে নিল তোমার? কেন, চেহারাটা কি খুব মনে ধরেছে? কালো রঙে চেকনাই ফুটেছে খুব?' দেবিকার একেবারে খাণ্ডারমূর্ত্তি।

'এর মধ্যে মেয়ে-টেয়ে কোথায়? ভোলাবাবু এসে জামিন দাঁড়ালেন, মনসিজবাবুকে ডেকে বলে দিলুম মঞ্জুর করে দিতে। এ শহরে ভোলাবাবুর জামিন বাতিল হয়নি কোনোদিন।'

'সত্যি বলছ, তামসী যায়নি তোমার কাছে? ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খায়নি? কান্নাকাটি করেনি তোমার হাতে ধরে?'

'কে তামসী? তোমার বন্ধু? যে এসেছে তোমার বাড়ি? সে যাবে কেন?

'সে আসামীর মাসতুতো লাভার। মানে দুজনেই চোর। একজনের চোখ বোঁচকার দিকে, আরেকজনের চোখ—' দেবিকা তীব্র দৃষ্টিতে বিদ্ধ করল স্বামীকে: 'বুঝতে আমার কিছু দেবি হয় না।'

'যাও, যাও।' নীলাচলও ঝাপটা মেরে উঠল: 'বুঝতে আমারো দেরি হয় না। তুমিই তোমার সখীর বৃন্দে-দূতী সেজেছ। তুমিই

তাকে টাকা দিয়েছ, ভোলা ঘোষের খোঁজ দিয়েছ। নইলে নতুন এসে ভোলা মোক্তারের সে টিকি ধরে কি করে? সে হাড়ে-টক বদমায়েসের টাকার খাঁই তো আর কম নয়। এদিকে তো শুনেছিলুম তোমার বন্ধু অভাবের লোক, অনটনে টনটন করছে—'

সেই তো কথা। অভাবেই তো লোকের স্বভাব নষ্ট হয়। তারপরে ভাসাজাল ফেলে অনেকেই বসে আছেন যদি ভেসে-চলা কোনো মেয়ে আটকায়। আর ও সব ভেসে-চলা মেয়েরও কোনো ভাল-মন্দ ভেদ নেই, বাস্ত-উটকো বিচার নেই, নরম-গরম তারতম্য নেই—

তাই তো নিজে সেধে খাল কেটে কুমীর ডেকে এনেছ। চোরকে ধরিয়ে দিয়ে চুরনীর সঙ্গে গলাগলি হয়ে কাঁদতে বসেছ। নইলে জেনে-শুনে আসামীর তদবিরকারকে তুমি জায়গা দাও কেন? বুদ্ধির ডগা তোমার এত ভোঁতা হয়ে গেছে? পেটের বিদ্যে সব নিংড়ে দিয়েছ?

এ নিয়ে কোন মীমাংসা হওয়া কঠিন। দু জনেই তুমুল গজরাতে লাগল। কিন্তু এক বিষয়ে দুজনের বিন্দুমাত্র দ্বিমত হলনা। ঘরের শত্রু বরযাত্রকে এখুনিই বিদেয় করে দিতে হয়।

তামসীর চোখে একটু ঢুল লেগেছিল। এরি মধ্যে, এক নিশ্বাসের মধ্যে, সে আশ্চর্য একটা স্বপ্ন দেখে উঠেছে। যেন এক সুনীল সমুদ্রে সে স্নান করতে এসেছে। কোথাও কোনো জনপ্রাণী নেই, তৃণতরু নেই। সে আর শুধু ঢেউ, ঢেউয়ের পর ঢেউ। এক-এক করে সে গায়ের জামা আর কাপড় খুলে ফেলল। ঝাঁপ দিল সেই নীল জলে, অতলস্পর্শ মৃত্যুতে। হঠাৎ চেয়ে দেখল, আর জল নেই, সে মাটির উপর শুয়ে আছে একাকী। শুষ্ক, নিঃসঙ্গ মৃত্তিকা। একটা লজ্জা,

একটা ক্ষুধা এসে আচ্ছন্ন করল তাকে ধীরে-ধীরে। দেখল মাটির ঘাস সহসা দীর্ঘাকার হয়ে তাকে ঘিরে ফেলেছে, ঢেকে ফেলেছে, লুকিয়ে ফেলেছে।

'আর কেন, যাও এবার নিধুবনে, তোমার কেষ্ঠঠাকুর ছাড়া পেয়েছেন।' দেবিকা তামসীর ঘরে ঢুকে প্রায় তার মুখের উপর চাবুক মারল।

তামসী হাসল। বললে, 'আমার সঙ্গে দুটো মাল আছে। দয়া করে একটা গাড়ি ডাকিয়ে দে শিগগির। যত তাড়াতাড়ি গাড়ি আনাতে পারবি তত তাড়াতাড়ি বেরুতে পারব।'

গায়ের রাগ গায়ে মারতে হল দেবিকার। যত অনর্থ ঘটাল ঐ মালদুটো। সবাসরি ঘাডধাক্কা দেওয়া গেলনা। গাড়ি আনতে যতই দেরি হবে ততই সে শক্তিশেল হয়ে বিঁধে থাকবে বুকের মধ্যে। ততই নিশ্বাসে বিষাক্ত করবে সে এই বাড়ির হাওয়া।

সত্যিই, জিনিসের কী ভার, কী বাধা! সামান্য একটা বিছানা আর বাক্স তাকে আড়ষ্ট করে রেখেছে, অকর্মক করে রেখেছে। সত্যি, কবে সে ভারহীন, বস্তুহীন হতে পারবে। সমুদ্রে যখন সে ঝাঁপ দিয়েছিল তখন তার কোনো ভার ছিল না বস্তু ছিলনা। সত্যিকার জীবনে কবে আসবে তার সেই রিক্ততার মুক্তি, সেই অবারণ বন্ধনহীনতা।

সহাস্যমুখে গাড়িতে উঠছে, দেবিকা খিঁচিয়ে উঠল: 'জামিনে ছাড়া পেয়েছে বলেই মনে করিসনে যে শ্রাদ্ধবাড়ির দাগা ষাঁড়ের মতো উদ্দাম হতে পারবে। তারপরেও বিচার আছে, জেল আছে—'

তামসী হাসিমুখে বললে, 'জানি। জেলভাঙার কারিগরও তৈরি হচ্ছে ঘরে-ঘরে।'

চব্বিশ

ভোলানাথ ঘোষ বললে চেনে না, স্বদেশী মোক্তার বললে চেনে। গাড়ি মোড় ঘুরল। অভিজাত ফাঁকা থেকে চলল অভাজন ঘিঞ্জিতে।

রাস্তাটা দীর্ঘ হোক এই শুধু কামনা করছিল তামসী। যাতে আরো অনেকক্ষণ সে ভাবতে পারে, বুনতে পারে স্বপ্নের ছিন্ন জাল। যাতে দিনের আলোটা আরো একটু অস্পষ্ট হয়, নীরবতার আভাস আসে বাতাসে। কী ভাবে দেখা হবে, কী কথা কইবে, চোখের উপর চোখ রেখে তাকাতে পারবে কিনা, হাসবে না মুখ ম্লান করে থাকবে, কিছুই সে ভাবতে পারছে না, দেখতে পারছে না। সে ভাবছে, দেখছে, অপরিচিত নির্জন ঘরে অপরিচিত নির্বাক অন্ধকার। প্রশ্নোত্তরহীন অন্ধকার। জিজ্ঞাসা নেই, জবাবদিহি নেই; বিচার নেই, বিশ্লেষণ নেই; অনুমান নেই, অভিমান নেই। ভয়ঙ্কর সুন্দর অন্ধকার, ভয়ঙ্কর সুন্দর ঘনিষ্ঠতা। একজনের ক্লান্তি দিয়ে আরেকজনের ক্লান্তি মুছে দিচ্ছে, একজনের লজ্জা দিয়ে আরেকজনের লজ্জা। একজন নিঃসংশয়ে ধরা দিয়ে ধরে রাখতে পারছে আরেকজনকে। জীবনের একটা তীব্রতর চেতনার মধ্যে উত্তীর্ণ হচ্ছে তারা, সূর্যের সামীপ্যে সুদূর কোন এক শিহরিত গিরিশৃঙ্গের উপরে। নবীনারম্ভের নান্দীমুখে। সেখানে সব পবিত্র, পরিচ্ছন্ন; সেখানে অন্ধকার দীর্ণ করে জন্ম নিচ্ছে ভবিষ্যতের সবিতা।

বন্ধ ঘর কেন, ঘর ছেড়ে পথেই না হয় বেরিয়ে পড়বে তারা।

ভোলাবাবু তো বলেছিলেন দিনের দিন হাজির হতে পারলেই হল, তার আগে চক্কর দিয়ে এসো না যেখানে খুশি। কেউ খোঁজ নিতে আসবে না। তাই সই, পথেই সোজা নেমে পড়বে তারা। পথে নেমে এসে আলোয় চারদিকে তাকিয়ে অনেক হালকা বোধ করল তামসী। অনেক জোরে-জোরে সে হাঁটছে, অনেক বড়-বড় পা ফেলে। হাঁটতে-হাঁটতে তারা চলে এসেছে মাঠময় এক গ্রামের মধ্যিখানে। ঝাকড়া-চুলো গাছের নিচে। ছায়াভরা ঘাসের উপর গা-হাত-পা টান করে শুয়ে পড়ল তামসী। তার শুধু আজ পথ চলবারই স্বাধীনতা আসেনি, এসেছে বিশ্রাম করবার স্বাধীনতা, ঘুমের আলস্যে শিথিল··হবার স্বাধীনতা। এতক্ষণ এই দীর্ঘ পথ অনর্গল হাসছিল সে, এখন একেবারে অঝোর ঝোরে কাঁদতে লাগল। অফুরন্তের মত। এত কান্নাও ছিল তার বুকের মধ্যে? ছিল কাঁদবার এত স্বাধীনতা? হাসল তামসী। কে জানে! কে জানে কোন নিঃসঙ্গ পাহাড়ের জঙ্গলে হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছে নিভৃত নির্ঝর।

হাওয়ায় ভাসলে তো চলবেনা, এক জায়গায় এসে দাঁড়াতে হবে নিশ্চল হয়ে। কোথায় যাবে তারা? কোথায় আঁকা রয়েছে সেই মানচিত্র? কিছুই জানেনা, রেখামাত্র না। কী হবে জেনে? যে দিকে দু' চক্ষু যায় চলে যাবে তারা। পালিয়ে যাবে। তারিখের দিন হাজির হবে না। হুলিয়া বেরুবে। পুলিশ কিছুতেই হদিস পাবে না। কত দুর্ধর্ষ আসামী ধুলো উড়িয়ে পাঁচির-পগার পার হয়ে গেছে। কত বীরব্রতা নারী জীবনের মূল্যে তাদের আশ্রয় দিয়েছে, আবরণ দিয়েছে।

হৃৎপিণ্ডের শব্দে তাল কাটল তামসীর। সে সব আসামী কি চোর? পকেটমার?

এই বাড়ি। ভোলাবাবু বাড়ি আছেন? না, তিনি গেছেন কোন

এক ব্যাঙ্ক খোলার নেমন্তন্নে। কটা পিতলের শিক আর কটা জাবদা খাতা জোগাড় করে যেখানে-সেখানে ব্যাঙ্ক গজাচ্ছে আজকাল। প্রচুর খাওয়া দিচ্ছে আর রঙচঙে ক্যালেণ্ডার বিলোচ্ছে। আর, বলা বাহুল্য, প্রত্যেকটি উদ্বোধনী সভায় সভাপতি হচ্ছেন কলেক্টর। তেমনি ধর্মসভায়, সাহিত্যসভায়, সমাজসংরক্ষণী সভায়। আর যেখানেই—

জানি। সেখানেই ঢাকের বাঁয়া।

আপনি কে?

আমি মোক্তারের মুহুরি।

মোক্তারের আবার মুহুরি আছে জানতনা তামসী। খানিকক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, 'জামিনে খালাস করে আনা হয়েছে এমন একজন আসামী নেই এখানে?'

কত আসামীই তো খালাস হচ্ছে অহরহ, কার কথা বলছেন? সেদিন কী মজা হল—দেখুন না। হাকিম যেই রায় দিল, খালাস, আসামী অমনি কাঠরা থেকে বেরিয়ে সোজা ছুট দিলে রাস্তা দিয়ে। বাবু আমাকে বললেন, সুরেন্দর, আমাদের ফি? ধরো হারামজাদাকে। কাছা-কোঁচা একত্র করে ছুটলাম, ধরলাম গিয়ে প্রায় আধমাইলটাকের মাথায়। বললাম, পালাচ্ছিস যে, খালাসী ফি দিয়ে যেতে হবেনা? লোকটা বললে, সকালবেলাই তো ফি দিয়েছি বাবুদের, আবার ফি কি? খালাস পেয়েছি শুনে দৌড়ে বাড়ি চলেছি পরিবারকে খবর দিতে। আর ফি নেই, হারামজাদা বলে কি? চট করে মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। বললাম, তুই তো ছাড়া পেয়েছিস কিন্তু গোড়ায় জামিন দিয়ে এসেছিলি যে, তা ছাড়াতে হবে না? সেই মুচলেকা যে আটকে থাকবে, তার ছাড়ানের ফি কই? লোকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। সম্পূর্ণ

খালাস তা হলে এখনো হয়নি এই রকম ধোঁয়া-ধোঁয়া কী ভেবে কাছার ডগা থেকে চারটে টাকা খুলে দিলে। দিয়েই আবার বাঁই-বাঁই করে ছুট। বাবুকে সাড়ে তিন টাকা দিয়ে আমি আট আনা ট্যাকস্থ করলাম। তাই বলছি, জামিনখালাসেরও মানে আছে দুই প্রকার। আপনি কার কথা বলছেন ?

তামসী পষ্টাপষ্টি বললে, 'কলেক্টরের বাড়ির সেই চুরির আসামী।'

'ও, হ্যাঁ, টাউন-জামিন পেয়েছে—'

'কোথায় তিনি ?' তামসীর কণ্ঠমূলটা কাঁপতে লাগল।

'এই কোথায় একটু ঘুরে আসতে গেছে। আপনি বসুন এসে এই ঘরে। এইটেই টাউন-জামিনদের আস্তানা। আমিও এখানেই থাকি এক খুবরিতে।'

টিনের ঘর, গর্তভরা কাঁচা মাটির মেসে। গোটা দুই ত্যাড়াব্যাঁকা লোহার চেয়ার, একটা রোগা-পটকা কেরাসিন কাঠের টেবিল। তাল ঠিক রেখে বসা বা টেবিলে হাতের ভর রাখা দুইই ক্লেশসাধ্য। উইয়ে-খাওয়া ন্যাড়া দুটো তক্তপোষ পড়ে আছে দুই পাশে, পোড়া বিড়ি আর দিয়াশলাইর কাঠির ছরকোট। টেবিলটার উপর একটা খবরের কাগজ আঠা দিয়ে আঁটা, অনেক সব পেন্সিলের আঁকিবুঁকি। আগে বোধ হয় ভিতরে ছেলেদের পড়ার টেবিল ছিল—অনেক জন্তু-জানোয়ারের মুখ আঁকা। একটা একেবারে হুবহু মুহুরির মুখ, নইলে শেয়ালের কানে কলম থাকবে কেন ? মুখ তুলে চাইল তামসী। দেখল মুহুরি এ তল্লাটে নেই।

কোথায় গেল রণধীর ? তামসীর বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল। পালিয়ে গেল না তো ? এই বিরলে-বিদেশে তাকে ফেলে রেখে সে যেতে পারে কখনো ? কেন, এক দিন যায়নি ?

আঠা দিয়ে আঁটা সেই খবরের কাগজের এক অংশে জোর করে চোখ রাখল তামসী। সেই খবরটাতে না আছে বর্ণ, না বা আছে বাস্তবতা। তামসী খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগল খবরটাতে ক' টা র আছে, ক'টাই বা ত। যদি র বেশি থাকে তা হলে—আর যদি ত বেশি থাকে তা হলে—কী তা হলে? ত বড় কম। ত-র আশা নেই। না, এই আরেকটা ত। আলো অস্পষ্ট হয়ে আসছে। অক্ষর চেনা যাচ্ছে না।

হঠাৎ, পিছনে, দরজার দিকে, ভারী নিশ্বাস শোনা গেল। অনড় হয়ে দাঁড়াল একটা অনভিব্যক্ত ছায়ামূর্তি।

'আমি তখনই আন্দাজ করেছিলাম তোমারই এই কারসাজি।' মূর্তি ঘুরে এল চোখের সামনে, অবয়বী হয়ে, স্পর্শনীয় হয়ে। 'ভোলাবাবু আমাকে কিছুতেই বলবেন না কী করে এ সম্ভব হল। ভেবেছিলেন খুব একচোট চমকে দেবেন আমাকে। মনে-মনে আমি ঠিক আঁচ করেছিলাম। তুমি ছাড়া আর কার এমন অহংকার হবে!'

এতটুকু চমকায়নি রণধীর। এতটুকুও প্রত্যাশার বাইরে মনে হয়নি তার। তাই তামসীকেও চমকে দেয়নি সেই রৌদ্র-ঝলকিত "অসি" নামে ডেকে উঠে। স্বরে যেন সেই উষ্ণ উন্মাদনা নেই, কেমন একটা শীতল বিতৃষ্ণা। স্পর্শহীন নিস্পৃহতা।

এক মুহূর্ত মূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল তামসী। তাকিয়ে রইল রণধীরের মুখের দিকে। কেমন যেন অদ্ভুত, অচেনা মনে হচ্ছে। যেন আরেক দেশের, আরেক গ্রহলোকের। যেন অনেক দূর থেকে দেখছে। মুখটাকে তাই সুন্দর লাগছে না। কেমন রুক্ষ, রসশূন্য দেখাচ্ছে। শীর্ণতাটা মনে হচ্ছে রুগ্নতার মত।

না, সমস্ত চোখের ভুল তামসীর। রোদে-রোদে সে ঝলসা-কাণা হয়ে গেছে। না, কিছুতেই সে বিশ্বাস হারাবে না, ধৈর্য হারাবেনা।

গ্রহণের রাত্রে অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকতে-থাকতেই সে চন্দ্রের রাহুমুক্তি দেখবে। মাটি খুঁড়তে-খুঁড়তেই মিলবে তার স্থির জল, সবল জল। বালির দূরলীন স্তরের অন্তরাল থেকে বেরুবে হর্মমালিনী, সেই পুরাতনী সভ্যতা।

তামসী টেবিলের উপর দীর্ঘ ভঙ্গিতে তার ডান হাত প্রসারিত করে ধরল। সবলতায় অনাবৃত ডান হাত। বললে, 'বোসো।'

রণধীর বসল না। পায়চারি করতে লাগল। খাঁচার মধ্যে বন্দী জানোয়ারের মত।

বললে, 'তোমার খুব পয়সা হয়েছে, না? খুব বড়লোক হয়েছ? খুব শাঁসালো মক্কেল গেঁথেছ? নইলে তোমার এত তেজ, এত স্পর্ধা!'

দুই উন্মীলিত চক্ষুর উপর যেন ঘুসি খেল তামসী। কিন্তু অন্তরের স্থৈর্যকে সে আহত হতে দিল না। বললে, 'তুমি মাথা ঠাণ্ডা করে বোসো আমার পাশে, এই চেয়ারে। দাঁড়াও, আগে একটা আলো আনাবার চেষ্টা করি।'

'থাক, কাজ নেই।' রণধীর বাধা দিল: 'আলোতে তোমার মুখশ্রী আর না দেখালেও চলবে। জানি, আমার মুখটাও লোকচক্ষে দেখাবার মত নয়। হ্যাঁ, আমি চোর—তবু আমি তোমার চেয়ে সরল, তোমার চেয়ে স্পষ্ট। হয়তো তোমার মতো আমি কুৎসিত নই। আমি শুধু নিজেকেই অধঃপাতে নিয়ে যাই, তোমার মতো নিজের সঙ্গে আরেকজনকে, আরো বহুজনকে, টেনে নামাইনা।'

তামসী দুই করতলে মুখ চেপে ধরল। যেন একটাও না স্বররেখা বেরিয়ে আসে অতর্কিতে।

রণধীর এগিয়ে এল টেবিলের দিকে। বললে, 'তোমার কী মতলব, আমাকে এখন কী করতে হবে?'

সত্যি, এটা এখন বিহ্বলতা দেখাবার সময় নয়। তামসী মুখ তুলে ম্লান রেখায় হাসল। বললে, 'আমি কী জানি! তুমিই বলো না—'

'আমি বলব?'

'হ্যাঁ, যদি বল, জামিনের সর্ত অক্ষরে-অক্ষরে পালন করবে, তবে এখানেই থাকতে হয়। আর যদি বলো, এখান থেকে চলে যাবে, তা হলে চলো, রাত্রের ট্রেনেই বেরিয়ে পড়ি। গাড়ি আমি ছাড়িনি, দাঁড় করিয়ে রেখেছি।'

'চলে যাব! কোথায়?'

বড় বেশি আশা হল তামসীর। বললে, 'কোথাও না। যে দিকে চোখ যায়। এখান থেকে ওখানে, আরো একখানে। পালিয়ে যাব আমরা।'

'পালিয়ে যাব? তোমার সঙ্গে? সেটা কি তবে আমার পালিয়ে যাওয়া হবে?'

তামসী নিশ্চল হয়ে রইল।

'তোমার সঙ্গেই যদি যাই তবে তোমার থেকে পালাতে পারলুম কি করে?'

তামসীর মনে, হল তার শরীর থেকে হাড়গুলি যেন খসে-খসে পড়ছে। হাতে-পায়ে তার জোর নেই, কিন্তু কণ্ঠস্বরে সে শক্তি আনল। বললে, 'আমার থেকে পালাতে পারাটাই কি তবে তোমার আসল মুক্তি?'

'নইলে. তুমি মনে কর, তুমি উত্তাল সমুদ্রে পাল মেলে দিয়ে ফালাও বাণিজ্য করবে, আর আমি তোমার অন্নভোজী হয়ে তোমার গাধাবোটের লস্করি করব, সেটাই আমার জীবনের সার্থকতা? অত গরমাই ভাল নয়, টাকা বা বয়স কোনোটাই টিকে থাকেনা শেষ পর্যন্ত।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম।' তামসী টেবিলের একটা ধার বাঁ হাত দিয়ে আঁট করে চেপে ধরল: 'ভেবেছিলাম তোমার চোর-নামের কলঙ্কটাও শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে দেবনা। জামিনে ছাড়িয়ে এনে প্রথম থেকেই তার ঘসামাজা শুরু করব। ভুল হয়েছিল আমার। বুঝিনি সেই কলঙ্কের ঘা মাস-মেদ খেয়ে একেবারে হাড়ে এসে লেগেছে।'

'নিশ্চয়ই ভুল হয়েছিল। একশো বার ভুল। তুমি ভেবেছিলে জেলটা খুব খারাপ জায়গা, আর যেখানে তুমি বসবাস করছ সে জায়গাটা খুব সৌখিন, উচ্চবংশীয়। ভুল! যেখানে তুমি আছ সেখানের চেয়ে জেলখানা অনেক বড় পুণ্যস্থান। কুষ্ঠ স্পষ্ট, প্রকট রোগ, গুপ্তগতি নয়। গোপন ব্যাধির চেয়ে তা অনেক ভদ্র, অনেক ধার্মিক।'

এমন সময় লণ্ঠন হাতে ভোলাবাবুর প্রবেশ। সহাস্য টাক নিয়ে। বলতে-বলতে, 'এ কী কথা, টাউন-জামিনের ঘরে আলো দেয়নি এখনো? ও সুরেন্দর, এদের খাওয়ার কথা বলে দিয়ে এসেছ হোটেলে? ফি নিয়েছ? রাত্তিরে থাকবার ফি?'

তামসী তখুনি উঠে দাঁড়াল। বললে, 'আমি চললুম।'

'চললেন?' ভোলাবাবু টাকে চুলকোতে লাগলেন: 'হাজত থেকে আপনার জন্যে এত করে আসামী ছাড়িয়ে আনলুম আর আপনি অমনি চললেন? কেন, কী হল?'

'ধর্মের কাহিনী বোঝানো গেল না। এরা কে কবে ধর্মের কাহিনী শুনেছে বলুন? পুঁই আদাড় ছাড়া এদের মন আর কোন দিকে যাবে?' তামসী দরজার দিকে পা বাড়াল।

'আমিও চললুম।' বলে উঠল রণধীর।

'আপনিও চললেন?' ভোলাবাবুর টাকে প্রায় চুল গজাবার জোগাড়। 'কোথায়?'

'থানায়। থানায় গিয়ে আমি সারেণ্ডার করব। জামিন বাতিল হয়ে আমি ফের যাব হাজতে। আমি ডিফেণ্ড করব না। দোষ স্বীকার করব। সোজাসুজি জেলে যাব। পাপকে ঢাকবার জন্যে প্রবঞ্চনাকে ডাকব না।'

ভোলাবাবুর টাকে আর ঘাস গজাল না, টাক হেসে ফেলেছে। বললেন, 'বুঝতে পেরেছি। অজাযুদ্ধের পর এখন ঋষিশ্রাদ্ধ চলেছে। আসল লঘুক্রিয়াটা এখনো বাকি। দেরি নেই, এখুনি ঝাঁটপাট দিয়ে বিছানা পেড়ে এনে সব ঠিকঠাক করে দিচ্ছি। কই হে সুরেন্দর, ফি-র চার্টটা দেখিয়েছ?'

'তার চেয়ে নির্দিষ্ট পল্লীতে গিয়ে রাত্রিযাপন করাও অনেক সম্মানের।' রণবীর মরিয়া হয়ে বললে।

'মাপ করবেন ভোলাবাবু।' ভামিনী ঘুরে দাড়াল 'সঙ্গে আমার মাল আছে। স্যুটকেসের মধ্যে গয়নার বাক্স। সসর্প ঘরে বাস করাটা বারণ করে দিয়েছে শাস্ত্রে।'

ভোলাবাবু একবার এদিক আরেকবার ওদিক তাকাতে লাগলেন। দু জন রাস্তার উলটো দু'মুখে বেরিয়ে গেল। ভোলাবাবু দুই অঙ্গুষ্ঠ উৎক্ষিপ্ত করে বলে উঠলেন. 'আসামীও নেই, ফরিয়াদীও নেই, আমি মুখখু হাকিম এজলাস কামড়িয়ে পড়ে আছি।'

বেশিক্ষণ পড়ে থাকতে পারলেন না। ছুটতে-ছুটতে লাগ ধরলেন রণবীরের। রণবীর বললে, 'আপনার ভয় নেই। নামতে হলে আমি নিজেই শুধু পথে নামি, অন্যকে পথে বসাইনা।'

রণবীরের জীবিকার্জনের পথ কুসুমাস্তৃত ছিল না। দগ্ধভাগ্য সে, বারে-বারে রুদ্ধদ্বারের সামনে তাকে প্রতিহত হতে হয়েছে। কাঁটায়-খোঁচায় ছিঁড়ে গিয়েছে তার হাত-পা। অন্ধ ভাগ্য তখন তাকে টেনে

নিয়ে এসেছে অন্ধকার চোরা গলিতে, ঠেলে দিয়েছে ক্রমনিম্ন পিচ্ছিলতায়। তবু, তখনো, আশা হারায়নি রণধীর, প্রতি স্খলিত পায়ের প্রাক্‌মুহূর্তে মনে হয়েছে এই বুঝি মিলে যাবে তার স্থির তীর, নিজেকে নিবারণ করার আকর্ষণ। কিন্তু কোথায় তার সেই প্রতিমুখাগতা শুক্রতারা। কোথায় সেই তিমিরহারিণী। রসিক ভাগ্য একদিন তাকে নিয়ে এল তামসীর দুয়ারে, তার নিবিড় আবৃতির মধ্যে। দেখল সম্পদে-শোভায় গর্বে-গৌরবে ঝলমল করছে তামসী। প্রতিষ্ঠা পেয়েছে নিজের অধিকরণে। তুষারকিরীটিনী গিরিচূড়ার মত দূর মনে হয়েছিল কিন্তু ডাক দিয়ে দেখল সে তার পার্শ্ববাহিনী গ্রাম্য নদীরেখা। স্বপ্নের সুরে কুলকুল করে বয়ে চলেছে। বয়ে চলেছে কোন জলনিধির সন্ধানে। মুহূর্তে নিজেকে রাজচক্রবর্তী বলে মনে হল। মনে হল তামসীর ঐশ্বর্য তার নিজের ঐশ্বর্য, তামসীর সাফল্য তার নিজের অহঙ্কার। জীবন, যৌবন, আত্মসমর্পণ—কিছুই ভিন্ন বলে মনে হল না। মনে হল তমস্বিনী রাত্রির তপস্যাবসান হচ্ছে। আবির্ভাব হচ্ছে জ্যোতির্ময় জীবনারম্ভের। ভবিষ্যমান ভারতবর্ষের।

কিন্তু কী দেখল সে রাত্রের গভীরে এসে? দেখল স্বপ্নের সেই সৌধ শূন্য হয়ে মিলিয়ে গেছে মেঘস্তরে, পড়ে আছে বীভৎস পণ্যপীঠ। সেই স্বপ্নাচ্ছন্ন নদী জঞ্জালে আবদ্ধ হয়ে স্রোত হারিয়ে ফেলেছে, হয়ে উঠেছে পল্বলের পঙ্ককুণ্ড। ঐ যে সব চমকদার চুমকি, আসলে ও সব তীক্ষ্ণ ক্ষতমুখ। ঐ যে সব পারিপাট্য, আসলে ও সব কাপট্যের ভূমিকা। তারপর আর কি দেখবার ছিল রণধীরের? আর কিসের প্রতীক্ষা করবার? তার আশা নেই, ভবিষ্যৎ নেই, ফিরে দাঁড়াবার সংকীর্ণতম জায়গা নেই। সমস্ত পাপের চেয়ে বড় পাপ হচ্ছে প্রবঞ্চনা। সমস্ত নির্মমতার চেয়ে বড় নির্মমতা হচ্ছে পরানুকম্পা।

'একটা জিনিস বুঝলাম—'রণধীর বলল চলতে-চলতে।

'এই দিকে থানা, এই বাঁয়ের রাস্তায়।' ঠিক রাস্তায় এনে ভোলাবাবু নিশ্চিন্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কি ?'

'জেলখানাটাই নিখুঁত খাঁটি জায়গা। আর, বাইরে থাকি কি ভিতরে, আমার কাছে আমার সমস্ত জীবনটাই জেল। আকাশ নেই, গাছপালা নেই, নারীকণ্ঠ নেই, শিশুর হাসি নেই। সারা জীবন আমার ট্রেন চলবে একটা সংকীর্ণ সুড়ঙের মধ্য দিয়ে। সে সুড়ঙের আর শেষ নেই, ক্ষান্তি নেই। শুধু শ্বাসরোধী অন্ধকার আর ধোঁয়া, ট্রেনের চাকায় আর পাহাড়ের প্রতিঘাতে অসহ্য আর্তনাদ। একটা জীবন্ত বিভীষিকা। কোথায় রোদ কোথায় মাঠ কোথায় বাতাসের দোল!'

এই যে থানা। ভোলাবাবু হন্তদন্ত হয়ে ভিতরে ঢুকলেন। সামনে দারোগাবাবুকে পেয়ে উৎকণ্ঠিত স্বরে বললেন, 'দেখুন মশাই, দেখুন। এ লোকের জায়গা কি জেলখানা না পাগলা গারদ ?'

পঁচিশ

গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল রাস্তায়। তামসী গলা উঁচিয়ে বললে, 'সেকেণ্ড অফিসারের বাড়ি চেন?'

চিনে-চিনে নিয়ে এসেছে গাড়োয়ান। খসা-ধসা ভাড়াটে বাড়ি। সামনের দরজাটা খোলা, পর্দার ওজুহাতে একটা চট ঝোলানো। কিন্তু একরতি আলো নেই, শব্দ নেই এক ফোঁটা। এক রুগ্ন অন্ধকার যেন এক বিবর্ণ স্তব্ধতাকে আলিঙ্গন করে আছে।

তামসী রোয়াকের উপর উঠে এল। কি করে ঘোষণা করবে নিজেকে ভেবে পেলনা। দরজা বন্ধ থাকলে কড়া নাড়তে পারত। না, ভয় কি! এগিয়ে গেল তামসী।

'কে?' ভিতরে লোক আছে। অত্যন্ত ক্লান্ত কণ্ঠের প্রশ্ন। কৌতূহলহীন।

'আমি।' যেন কত দিনের পরিচয় স্বরে এমনি আমেজ আনল তামসী। 'ভিতরে আসতে পারি?'

'আসুন।' প্রতিধ্বনিতে উত্তাপ নেই।

মনসিজ সেদিনের মতই চটের ইজিচেয়ারে হাঁটু ছমড়ে বসে আছে। সেই ইজিচেয়ারটাই কিনা ঠিক কি। গায়ে তেমনি গেঞ্জির উপরে কোট, পরনের কাপড়টা কোমরে গোল করে জড়ানো। সেই হাড্ডিসার তক্তপোষ, নিস্খোলস টেবিল, পুঁয়ে-পাওয়া চেয়ার। কচি পাঁঠার কৃষ্ণকায় কমনীয়তাটুকুই অদৃশ্য হয়েছে।

বোঝা যাচ্ছে মনসিজের আর প্রমোশান হয়নি। সাইকেল ছেড়ে এজলাস পেলেও সে ডেপুটি হতে পারেনি। বরং টি-এ খুইয়েছে, ভেট-বেগার খুইয়েছে। মনসিজের মনে সুখ নেই। হাকিমকে খাওয়াতে হবে বলে মোক্তারবাবুরা দু পক্ষ থেকেই টাকা খাচ্ছে, এক আধলাও ট্যাঁক থেকে ছিটকে আসছে না। বিপরীত ফল ঘটলে মক্কেল তিরস্কার করছে, 'তখন বললুম বাজে খরচ বাবদ পুরো একশো টাকাই দে—তা না, সাশ্রয় করতে গেলি। পঞ্চাশ টাকায় কখনো কাজের বাজে-খরচ হয়? ও পক্ষ বেশি টাকার বাজে-খরচ করে কেমন জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল বল দেখি—'

অন্ধকারে চোখ বুজে মনসিজ তার ভবিষ্যৎ ভাবছিল। যদি এখুনি সে চাকরিটা ছেড়ে দেয় সেই ভবিষ্যৎ।

'আমাকে চিনতে পারেন?' নির্দেশ পাবার আগেই চেয়ারে বসেছে তামসী। তার আজ অনেক সাহস। অনেক স্বাচ্ছন্দ্য।

কিন্তু গলার স্বরে পুলকিত হবার লগ্ন চলে গিয়েছে মনসিজের। হাতের কাছে টেবিলের উপর লণ্ঠনের পলতেটা অনেক গভীরে ডোবানো ছিল। হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে দিল আস্তে-আস্তে। সঙ্গে-সঙ্গে একটি পিচ্ছল চিক্কণ হাসি তামসীর চোখের কালোতে জলজল করে উঠল।

সেই হাসিটা যেন কেমন নগ্ন, নির্দিষ্ট। মনসিজকে এমন এক জায়গায় স্পর্শ করছে যেটা অনাবৃত অথচ দাহবোধহীন। এমন এক দিনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে যেদিন এই হাসিটা সমাপ্তির রেখা হতে পারত অনায়াসে। কিন্তু আজ এই হাসি ভস্মের নিচে অগ্নিচিহ্নের মত দেখল মনসিজ। নম্র চোখে বললে, 'ও! আপনি!'

'চিনতে পেরেছেন তা হলে?' চাউনিটা আরো একটু তরল করল তামসী।

'হ্যাঁ। জামিন দেবার পর উঠেছিল আপনার কথা। দুয়ে-দুয়ে চার করতে তাই দেরি হল না।'

কিন্তু এ যে দুয়ে-দুয়ে পাঁচ হবার উপক্রম। চিনতে পেরেছে অথচ এমন নিঃসাড়! এমন নিরস্ত! এই উপেক্ষার অর্থ কি। নতুন শীত পড়ে এসেছে অথচ তামসীর আচ্ছাদনের অল্পতার জন্যে তার আজ মায়া নেই। রাঁধা মুরগির মাংস দেয়া দূরের কথা, এক পেয়ালা চা দিয়ে পর্যন্ত সাধছে না। কেন এই নিঃস্নেহতা? কিছু এখন খেতে দিলে নির্লজ্জের মত খেতে পারত তামসী, কিন্তু নির্লজ্জের মত তা চাইতে দেবার প্রশ্রয় নেই কেন চারপাশে? যে লোক নিজের থেকে এসেছে তাকে নিজের লোক বলে ভাবতে কেন এত আলস্য?

'আপনি কেন এসেছেন?' সামনের দিকে ঝুঁকে এসে অন্তরঙ্গ ষড়যন্ত্রীর মত চাপা গলায় জিগগেস করলে মনসিজ।

সত্যি, কেন এসেছে? নিজের উপকারের জন্যে, না, সমাজের উপকারের জন্যে? সমাজের উপকার হোক কি না-হোক তাতে তার কী যায় আসে? বা, সমাজের প্রতি তারও একটা কর্তব্য আছে বৈকি। নিজের প্রতি যখন অপরাধ করেছে সে অম্লানমুখে ক্ষমা করেছে। সে-হীনতাটা মনে হয়েছে শরীরের প্রচ্ছন্ন গ্লানির মত। সংশোধন করে নিয়েছে নিজের স্বাস্থ্যের জোরে। কিন্তু সমাজের সম্বন্ধে যে অপরাধ তার মার্জনা নেই। সে হীনতাটা অশুচি পূতিক্ষতের মত; ভালোবাসার সিল্কের ব্যাণ্ডেজ দিয়ে তাকে ঢেকে রাখা যায় না। নির্দয় হাতে তার চিকিৎসা চাই। যাতে অন্য অঙ্গে না সংক্রমণ হয়। চিকিৎসককে তাই সচেতন করে দেয়া দরকার। মন্ত্রবলে ব্যাধি সারে এমন অসার কথা যেন না সে বিশ্বাস করে। যেন কোনো শৈথিল্য না আসে, কোনো অমনোযোগ।

'আপনি মিছিমিছি এসেছেন। আপনি চলে যান।'

'চলে যাব!' তামসীর হাসিমুখ অন্ধকার হয়ে গেল।

'হ্যাঁ, কেউ দেখে ফেললে কিছু ভেবে বসবে নিশ্চয়।'

কে কী ভাববে! তামসী যেন তা গ্রাহ্য করে! নড়ে-চড়ে ঢিলেঢালা হয়ে বসল সে আরো মজবুত হয়ে। ভাবুক না যার যা খুশি। লাগাম ছেড়ে দিয়ে ভাবতে দাও। যার যা খুশি বলুক না চোখ টিপে, ঠোঁট বাঁকিয়ে। তামসী কারুর ধার ধারে না।

অন্তঃপুরে গোলমাল শোনা যাচ্ছে। অনেকগুলি ছেলেপিলের কান্নাকাটি, অনেক তাড়ন-তর্জন। যেন অনেক বিশৃংখলা, অনেক অসন্তোষ। অনেক বা জোড়াতাড়া, টানাহেঁছা। তাই হয়তো এই ভয়, এই অচেষ্টা।

কিন্তু তামসী তো নিজের উমেদারিতে আসেনি। সে এসেছে সমাজের মুখপাত্র হয়ে। উর্ধ্বতম শাস্তির সুপারিশে।

তিক্ত গলায় বললে, 'ভাবতে দিন। পরের ভাবনায় গায়ে ফোস্কা পড়েনা আমার। আপনারও পড়েনা বলেই জানতাম।'

'সে ভাবনার কথা বলছি না। বলছি—প্রত্যেক তৃতীয় ব্যক্তিই গুপ্তচর—কেউ দেখে ফেললে কানাঘুসো করে বেড়াবে, আসামীর পক্ষে মামলার তদবির করতে রাত্রে চুপিচুপি আপনি হাকিমের বাড়িতে এসেছেন। তাতে ফল হবে এই—'

'মামলার তদবির করতে এসেছি? আমি? আসামীর পক্ষে? ককখনো না।' তামসী ঝাঁকরে উঠল।

'অন্তত লোকে তাই বলবে। কলেক্টরের কানে উঠলে মোকদ্দমা ট্র্যান্সফার হয়ে যাবে অন্য কোর্টে, হয়তো কোনো অনাহারী ম্যাজিস্ট্রেটের ফাইলে। ফল হবে উলটো, একটুখানি অসাবধানতার জন্যে সব ভেস্তে

যাবে। তাই যা বলি শুনুন।' মনসিজ চেয়ারটা আরো কাছে টেনে এনে স্বর আরো খাটো করল: 'গুটিগুটি চলে যান। আপনার কিচ্ছু ভাবনা নেই। আসামী আমি খালাস করে দেব।'

'খালাস করে দেবেন!' তামসী যেন দমে গেল, থেমে গেল, নিঃশেষ হয়ে গেল।

'হ্যাঁ, বলে দেবেন গিলটি প্লিড যেন না করে। আর দেখুন, ওসব ঘেসো মোক্তারে চলবে না, একটি তু-কানকাটা উকিল দেবেন, মুখে যার কিছু আটকায়না, মুরগি আর ষাঁড়ের গল্প যে এন্তাব বানিয়ে যেতে পারে—'

তামসী কতক্ষণ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে রইল। এও সম্ভব? এই তার মামলার তদবির?

স্বরে সে সাহস আনল। বললে, 'কলেক্টরের বাড়ি ঢুকে যে চুরি করে সে কখনো ছাড়া পায়?'

'আমার কাছে পায়।' মনসিজ নিজের অজানতে তপ্ত হয়ে উঠল: 'শুধু কলেক্টরের বাড়ি আর কলেক্টরের বউ। যেন তাইতেই একেবারে গোটা ভাগবত অশুদ্ধ হয়ে গেছে। বলি, প্রমাণ কি? কলেক্টরের বউ দাঁড়াবে এসে কাঠগড়ায়? দাঁড়াক না একবার এসে।' মনসিজ উৎফুল্ল হয়ে উঠল: 'বিটকেল উকিল বিতিকিচ্ছি প্রশ্ন করে একেবার কাদা-চিংড়ি করে ছাড়বে। ওটা চুরি না আসলে প্রেমোপহার, মাথা থেকে বার করবে অনেক চটুকে গল্প। বিবিজান তখন নিজেই লবেজান হয়ে যাবেন।'

'ছি ছি ছি, চুরি করে ফের মিথ্যা কথা বলবে?'

'ডাহা মিথ্যে কথা বলবে, খাজা মিথ্যে কথা বলবে। আইনে সেটাকে মিথ্যে বলে না, বলে স্বপক্ষ সমর্থন। ওসব নিয়ে আপনাকে

মাথা ঘামাতে হবে না। আপনি শুধু একটি ফেরেববাজ উকিল লাগিয়ে দিন। বিবিসাহেবার তেজটা আমি একবার দেখি। আমি তো ডেড এণ্ড-এ এসে পৌচেছি, আমার উঠাও নেই নামাও নেই, ভয়ও নেই ভরসাও নেই। উকিল শুধু হালটা ঠিকমত ধরে থাকবে, আমি এক পাড়ি দিয়ে সোয়ারিকে ঠিক পৌছে দেব ওপারে। খোলা মাঠ, খোলা হাওয়ার দেশে। আবার নতুন করে স্বরু হবে আপনাদের পথ চলা।'

বুকের ভিতরটা অস্থির করে উঠল তামসীর। বললে, 'এমন যে চোর তার মুক্তি পাওয়াটা স্ববিচার?'

'এমন যে দাঁড়কাক সমাজের থেকে তার ময়ূরের সম্মান পাওয়াটা স্ববিচার? চুরি কেন, ডাকাতি করতে পারত না? সমস্ত কৃত্রিমতা থেকে বিবস্ত্র করে দিতে পারত না ওদের?'

'দেখুন, আপনি ব্যক্তিগত রাগের কথা বলছেন—'

'বলছিই তো। সমস্ত কিছুই তো ব্যক্তিগত। আমার প্রমোশান যে হল না সেটাও তো ওদের ব্যক্তিগত খামখেয়াল। আমাকে কম জ্বালানটা জ্বালাচ্ছে! আমি যদি স্বযোগ পাই তবে কেন আঁচড় কাটবনা—অন্তত কালির আঁচড়?'

'তাই বলে মাঝখান থেকে চোর ছাড়া পাবে?' তামসীর অসহ্য লাগল: 'না, কখনো না। এ অন্যায়, ভীষণ অন্যায়। তার উর্ধ্বতম শাস্তি হওয়া উচিত। আইনে ক বছর লেখে?'

'যান, আপনি আর ছলনা করবেন না। যাকে দরজা খুলে তক্তপোষের তলায় আশ্রয় দিয়েছিলেন তাকে নিয়ে আস্থন সেই অন্ধকার ঘুপসি থেকে, আমি আবার তার জন্যে দরজা খুলে দিচ্ছি।'

ও, হ্যাঁ, বুকের আঁচলের তলায় লুকিয়ে রাখতে পারেনি বলে

একদিন তাকে তক্তপোষের নিচে আশ্রয় দিয়েছিল। সেদিন সেটা ছিল একটা পাপের কথা, অখ্যাতির কথা। আজ তার উপরে মহত্ত্বের মুদ্রাঙ্ক পড়ছে। যেন বীরকীর্তি।

'আপনাদের ভাবনা কি!' মনসিজ ক্লান্তের মত চেয়ারে পিঠ হেলিয়ে দিল: 'আপনারা দেশের কাজ করছেন। আপনাদের কোনো পাপ স্পর্শ করতে পারে না, কোন পরাজয় বশ করতে পারে না—'

লজ্জায় মাথা হেঁট করল তামসী। এই তার উদাহরণ?

'মাঝে-মাঝে পাঠ ভুল হয়ে যায়। ভাল যে অভিনেতা সামলে নিতে তার দেরি হয় না। কিন্তু তার ভয় কি—আপনার মত যখন ভাল প্রম্পটার রয়েছে পাশে। ঠিক সে কেটে বেরিয়ে যাবে। কত বড় ভবিষ্যৎ আপনাদের—যারা দেশের কাজ করছেন। আজ যদি আপনাদের ধুলো, কাল তবে সোনা, আজ যদি পাঁক কাল তবে পদ্ম। মৃত্যু পর্যন্ত আপনাদের সম্ভাবনা। কিন্তু আমাদের—আমাদের ভবিষ্যৎ কী? আমরা কার কাজ করছি?'

নিঃস্বের মত স্তব্ধ হয়ে বসে রইল তামসী। নিরস্ত্রের মত।

'আপনি চলে যান।' আবার সামনের দিকে ঝুঁকে এসে নিম্নস্বরে বললে মনসিজ: 'এখানে বসে থেকে কেস মাটি করে দেবেন না। কেউ হয়ত এখুনি এসে পড়বে। দেশের কাজ করতে না পারি—কিন্তু আপনারা যারা করছেন—'

কানে যেন কে গলানো গরম শিসে ঢেলে দিচ্ছে। তামসী বিতাড়িতের মত বেরিয়ে এল রাস্তায়।

দেশের কাজ! একটা তীক্ষ্ণ তপ্ত গুলি এখন যদি তার বুকের স্থির মধ্যস্থলে এসে বিদ্ধ হত তো নিজের রক্ত দেখে গভীর শান্তি পেত তামসী।

গাড়িকে বললে ইস্টিশানের দিকে নিয়ে যেতে। টিকিট কেটে মেয়েদের থার্ডক্লাশ কামরাতে উঠে পড়ল। না খাওয়া না ঘুম—ভিড়ের মধ্যে জানলার দিকে মাথা রেখে বসে রইল নিঝঝুমের মত। ছুই চোখ জোর করে বন্ধ করা। যেন চোখের দৃষ্টি কোনোকালে আর ফিরে না আসে। তাকাতে না হয় নিজের দিকে, চারপাশের পৃথিবীর দিকে!

কিন্তু কান কি করে বন্ধ করবে? চলন্ত গাড়ির চাকা কী বলছে বিদ্রূপ করে? বলছে দেশের কাজ, দেশের কাজ!

'দেশের যে একটা কাজ করব লোকে তার স্বযোগ দেবে না।' দেবিকা গর্জে উঠল। স্বামীকে বললে, 'তুমি ভেঙে দাও এই একজিবিশন।'

শহরে একটা কৃষি-শিল্প-প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত হয়েছে। কথা ছিল কলেক্টর-পত্নী তার দ্বার উন্মোচন করবেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে কমিটি মত বদলেছে। সাব্যস্ত হয়েছে, প্রদর্শনী যখন দেশের কৃষি-শিল্প নিয়ে, তখন গ্রাম থেকে কোনো চাষা এসে তার উদ্বোধন করবে। সেই চাষা, যার স্বাস্থ্য মজবুত আর বলদ জোড়া তেজীয়ান। এক হালে যে অন্তত দশ বিঘে চাষ করতে পারে।

'তোমাকে ভাবতে হবে না। ও একজিবিশনকে আমি জুয়োখেলার আড্ডা বানিয়ে ছাড়ব। নইলে চলবে নাকি ভেবেছ? গ্যাম্‌ব্লিং বুথে বসিয়ে দেব ফিরিঙ্গি ছুঁড়ি।' দাঁত দিয়ে পাইপ কামড়ে রাগটাকে পিষে ফেলল নীলাচল: 'এই দেশকে এখন উচ্ছন্নে দেয়া হচ্ছেই দেশের কাজ।'

স্বপ্ন দেখছে নাকি তামসী?

একটা ছোট জংশন-স্টেশনে ট্রেন থেমেছে। নিশুতিরাতে ঝিঁঝিঁ ডাকছে একটানা।

'শুনুন, কিছু খাবেন?'

হাতের উপাধানে মাথা নোয়ানো। নিশ্চল হয়ে বসে আছে তামসী।

বললে, 'না, খিদে পায়নি।'

কে যেন আবার বললে স্নিগ্ধ স্বরে, 'কতদূর যাবেন?'

'জানি না।'

'কিন্তু কিছু খেয়ে নিলে ভাল হত না?'

'আপনি খান গে।'

আচ্ছন্ন তন্দ্রার মধ্যে কার সঙ্গে কথা কইছে তামসী? চোখ কি সে মেলবেনা একটিবার?

কিন্তু শেষরাতের দিকে চোখ মেলতে হল তামসীকে। ট্রেন আর যাবেনা। এখানেই তার শেষ। হ্যাঁ, স্টেশনের পরেই বাস আছে দাঁড়িয়ে। ভোর হলে ছাড়বে। বাইশ মাইল রাস্তা। আড়াই ঘণ্টা। যেতে পারবে যেখানে সে যেতে চায়। তাকে নামিয়ে দিয়ে বাস আরো চলে যাবে দক্ষিণ। আরো আট মাইল।

বাসে এসে বসল তামসী। লোক বোঝাই হচ্ছে ক্রমশ। অন্ধকারে কে কার পা মাড়িয়ে দিচ্ছে, ভাই-বাছা বলে আবার আপোষ করে নিচ্ছে নিজেদের মধ্যে। কত রকমের গালগল্প চলেছে। কিছু কানে নিচ্ছে, কিছু নিচ্ছেনা তামসী। সমস্ত অন্তর-বাহির অন্ধকারে পূর্ণ করে নিঃসজ্ঞের মত এক পাশে বসে আছে। পৃথিবীর মত প্রত্যূষের প্রতীক্ষা করছে।

কে একজন তার পাশে এসে বসল। মেয়ে নয়। মেয়ে আর কেউ ওঠেনি। কণ্ডাক্টরই পাশে বসতে বললে। জিগগেস করলে, আপনার লোক কিনা। সম্মতি পেল হয়ত। নইলে বসল কেন? প্রশ্ন ও উত্তর —দুটোর আন্দাজই চমৎকার। দেখবে নাকি লোকটা কে? কোনো

উৎসাহ নেই তামসীর। দেখব-দেখব চেষ্টা করেও দেখবার ইচ্ছে হল না।

গাছে-গাছে পাখার ঝটাপটি সুরু হল। সুরু হল উৎফুল্ল কাকলী। আকাশের প্রান্তরেখা নীলাভ হয়ে এল।

চোখ মেলল তামসী।

বসবার নির্দিষ্ট সংখ্যা বাসের গায়ে লেখা আছে, কিন্তু দাঁড়াবার সংখ্যার ইতি-অন্ত নেই। বনেট-বাম্পার তো আছেই ছাদের উপর লোক উঠেছে। এর পর যারা উঠবে তারা নাকি কোলের উপর বসবে। যারা কোল দিতে রাজি হবে তারা এক চৌথ রিবেট পাবে ভাড়া থেকে।

'তাই নাকি?' নারায়ণ নিজের মনে হেসে উঠল।

আবার চোখ বুজল তামসী। ভাবল, মনসিজের বাড়ি থেকে সে অমন তাড়াতাড়ি পালিয়ে এল কেন? সাহস হল না কেন আরো কতক্ষণ বসে থাকবার? বেশ তো, দেখে ফেলত কোনো গুপ্তচর। মামলা বদলি হয়ে যেত তাঁবেদার অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে। তা হলে জেলে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারত তামসী। ক্ষুধা বোধ করে দুটো মুখে দিতে পারত। গভীর ঘুমে মুছে দিতে পারত অস্তিত্বকে।

গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না। কোমরে র‍্যাপার জড়িয়ে হ্যাণ্ডেল ঘোরাচ্ছে কণ্ডাক্টর, কিন্তু বোবা মোটরে আওয়াজ ফুটছে না। একেকবার ঝেঁকে উঠছে শরীরটা আবার তখুনি নিস্পন্দ হয়ে যাচ্ছে।

'আপনি কদ্দূর যাবেন?' নারায়ণ জিগগেস করলে।

'আগে যাই কিনা ঠিক কি।' তামসী পাশ কাটিয়ে গেল।

না, স্টার্ট নিয়েছে। কতক্ষণ টিকে থাকবে কে জানে। গর্তভরা রাস্তা, শূন্যে তুলে আছাড় মারছে মাটির উপর। যাচ্ছে শামুকের মত। রাস্তা যেখানে বিপজ্জনক, সমস্ত প্যাসেঞ্জারকে নেমে পড়ে গাড়ি হালকা

করে দিতে হচ্ছে। এমনি করতে করতে কতক্ষণে পৌঁছুবে তার ঠিক নেই।

শুধু তামসীই নামছে না। আর নারায়ণ যখন তার আপনার লোক তখন ড্রাইভার তাকে পাশে বসে থাকতে দিচ্ছে।

গাড়ি আবার চলল বোঝাই হয়ে।

'কদ্দুর যাচ্ছেন ?'

জায়গাটার নাম করলে তামসী। বললে, 'আমার বোনের বাড়ি। আপনি ?'

'আমি যাব আরো দূরে। গাঁয়ের মধ্যে। চাষাদের নিয়ে কী একটা ব্যাপার ঘটেছে—'

কোনো উৎসাহ নেই। কিন্তু গাড়ি আবার থামল কেন ?

একটা ঘাঁটি মতন মনে হচ্ছে। উলটো দিকের আরো একটা বাস আছে দাঁড়িয়ে। খালি হয়ে। এ বাসটাও খালি করে দিতে হবে। আর সে যাবেনা। এক পা না।

কেন, কী ব্যাপার ?

এইমাত্র খবর পাওয়া গেল আজ দশটা থেকে বাসের স্ট্রাইক। দশটা বাজতে মোটে আর এখন দশ মিনিট বাকি।

সে কি কথা ? রাস্তা যে বাকি এখনো আরো বারো-তেরো মাইল।

উপায় নেই। পয়সা ফেরত চান পড়তা কষে দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু ঘড়ি বেঁধে স্ট্রাইক যখন একবার ঘোষণা করা হয়েছে তখন আর নড়চড় নেই।

আমরা তবে কী করে যাব ? প্যাসেঞ্জারের দল খেপে উঠল। নারায়ণ দাঁড়াল মাথাল হয়ে।

নিজের নিজের পথ দেখুন।

গাড়ি ছাড়বার আগে বলনি কেন? কেন মাঝপথে নামিয়ে দেবে? মরিয়া হয়ে উঠল সোয়ারিরা। পয়সা ফেরৎ কে চাইছে? আমরা পুরো ট্রিপ চাই।

এঞ্জিন বিগড়ে গিয়েছে আমাদের। পথে দুর্ঘটনা ঘটলে কী করতেন? মানে যখন রাস্তা ডুবে যায় বর্ষার সময়, তখন করেন কী? এই কাছেই প্রোপ্রাইটরের বাড়ি, সেখানে গাড়ি জিম্মা করে দিয়ে আমরা ছুটি নেব। কি, গায়ের জোর দেখাবেন নাকি? মারামারি হলে শেষ পর্যন্ত ঘায়েল হয়ে যেতে পারি বটে, কিন্তু তাতে গাড়ি কি আর চলবে? গাড়ি চললেও কি সিধে যাবে, না পড়বে খানায় কাৎ হয়ে?

উলটো দিকের খালি বাসের লোক দুটো দাঁত বার করে হাসছে। তারা কত সহজে নামিয়ে দিতে পেরেছে সোয়ারী, কোনো অসুবিধে হয়নি। বলিস কেন, মেয়েমানুষ সোয়ারী নিয়ে হয়েছে মুস্কিল, তার জন্যেই যত টেণ্ডাই-মেণ্ডাই। যা না বাপু, গরুর গাড়িতে চেপে, নিরিবিলিতে, ছায়ায়-ছায়ায়। সৎ পরামর্শ তো নিবিনে—যত সব—দু বাসের কণ্ডাক্টর অর্ধ-দগ্ধ বিড়ির মুখে অর্ধ-ব্যক্ত রসিকতা করলে।

'চলে আসুন।' নারায়ণের ক্রুদ্ধ মুষ্টিতে শান্ত হাতের মৃদু স্পর্শ রাখল তামসী। 'কাদের হয়ে আপনি লড়বেন? ঐ দেখুন কেমন স্বচ্ছন্দে পয়সা ফিরিয়ে নিচ্ছে। যেন এইটুকু মস্ত লাভ! অনেক রকম দুর্যোগ-দৌরাত্ম্যের মত এটাও ঘাড় কাৎ করে মেনে নিচ্ছে অক্লেশে। তারপর,' কণ্ডাক্টরের দিকে তাকিয়ে: 'তারপর এরা যদি একত্র হবার কোনো সংকল্প করে থাকে তবে তাতে বাধা হবার আমাদের অধিকার নেই। এরা এত দিন কষ্ট করে আমাদের কষ্ট দূর করেছে, আজ আমরা কষ্ট করে এদের কষ্ট লাঘব করি। চলে আসুন, বাকি পথ হেঁটে যাব আমরা।'

আগুনে জল ঢেলে দিল তামসী। কণ্ডাক্টরকে সে চিনতে পেরেছে। হ্যাঁ, তার খুড়তুতো ভাই, জগৎ। সংসারের ধাক্কায় নেমে পড়লেও অপাঙক্তেয় হয়নি। নিঃস্ব হলেও নিঃস্বত্ব নয়। জাত গেলেও ইজ্জত ফিরে পেয়েছে। শাখা থেকে নেমে এসেছে শিকড়ে, শক্তির মূল কেন্দ্রে।

মনে-মনে পাশে এসে দাঁড়াল তামসী। কিন্তু জগৎ কি তাকে চিনতে পারছে না? তবে সংকোচে সরে থাকছে কেন? তামসীও তো সমাজের বৈদূর্যমণি নয়, সেও তো পথে পড়ে-থাকা পাথরের টুকরো। স্তূপীভূতেরই এক অংশ। বৃহত্তর আত্মীয়তায় গাঁথা।

অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে তারা, খালি বাস নিয়ে চলে এল জগৎ। বললে, 'আসুন, আপনাদের পৌছে দিয়ে আসি।'

নারায়ণ জয়ের একটা গর্ব বোধ করতে যাচ্ছিল, তামসী বললে, 'নিজেরা পৌছুতে পারেন কিনা তাই দেখুন। আমাদের জন্যে ভাবতে হবে না।'

কোন-এক অচেনা গ্রাম্য গৃহস্থের বাড়িতে তারা মাথা ধুয়ে ধোঁয়া-ওড়ানো ফ্যানসা ভাত খেয়ে নিলে। পরে পাৎনার উপরে পুরু করে খড় বিছিয়ে টপ্পরওয়ালা একটা গরুর গাড়িতে তারা চেপে বসল।

এবার তামসীর দু চোখ ভরে ঘুম আসছে উচ্ছল হয়ে। কিন্তু হায়, তার আসেনি এখনো ঘুমের মধ্যে শিথিল হবার স্বাধীনতা।

এমনিই একটা উদাস-করা উধাও পথেরই সে স্বপ্ন দেখছিল, কিন্তু এ তো পথ হারাবার পথ দেখায় না, কেবলই পথপ্রান্তের ইঙ্গিত করে।

এইখানে আপনাকে নেমে যেতে হবে। এই আপনার সেই শহরে যাবার ফাঁড়ি।

হ্যাঁ, আমি জানি। আমি আরো এসেছি আগে।

'একা যেতে পারবেন ?' এটা নারায়ণের উদার বন্ধুতার অতিরিক্ত কিছু নয় তো ?

তামসী হাসল।

কিন্তু সে-হাসি উড়ে গেল তার প্রাণধনের বাড়ির দুয়ারে এসে। শুনলে, উষসী নেই।

নেই মানে ?

বাড়ি নেই।

কোথায় গেছে ?

শুধু একটা বুড়ো ঝি অবশিষ্ট আছে। বললে, 'বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।' শেষে নির্দন্ত মাড়ি ঘসে বললে, 'বেরিয়ে গেছে।'

ছাব্বিশ

'কে ?'

তামসী উত্তর দিল না। এগিয়ে আসতে লাগল পা টিপে-টিপে। এগিয়ে আসতে লাগল নতুন নির্জনতায়। নতুন উন্মুক্তিতে। উষসী নেই, সে চলে গিয়েছে বাড়ি ছেড়ে, এ যেন একটা কত বড় পরিপূর্ণতা।

বাঁটোয়ারার মোকদ্দমা চূড়ান্ত ডিক্রি হয়ে অংশ মোতাবেক ছাহাম পেয়েছে সরিকরা। নক্সা ভাঁউরে চিহ্নিত দখল নিয়েছে। ঋষিবর চলে গিয়েছে তার বেদ-বিদ্যালয়ে, বার-লাইব্রেরিতে।

এলেকা ছোট হলেও একলা কর্ত্তাত্তি পেয়ে আস্থা বেড়ে গিয়েছে প্রাণধনের। জমিদারিতে জিদ এসেছে। আগে যখন এজমালে ছিল, ভাবখানা ছিল কি করে ফুঁকে দেবে, এখন ভাবনা হয়েছে আটঘাট বেঁধে কি করে বাজিয়ে যাবে বাজনা। মানে, খাজনা আদায়ের বাজনা। তাই খুব কড়া করে গেরো দিচ্ছে। ঘসামাজা করছে হিসেবে। কি করে খরচ-তখরচ কমাবে, আয়-আদায় বহাল রাখবে ষোলআনা। আত্মীয়ের আগাছার ঝাড় বিদায় করে দিয়েছে একঝাঁটে। ঝি ছাড়িয়ে দিয়ে চাকর রেখেছে। মদের বদলে ধরেছে আফিং। আগে যদি বা উচ্ছৃঙ্খল ছিল, এখন হয়েছে কঠোর কৃপণ, আচারভ্রষ্ট।

'কে ?'

মেয়ে-মেয়ে লাগছেনা ? মন উড়ু-উড়ু করে নাকি ? ছোঁক-ছোঁক

করে? না, ঘুপসি সেরেস্তায় বসে ঝাপসা দেখছে প্রাণধন? উচাটন হবার আছে কি? র-ঠ করে একটা বিয়ে করে নিয়ে নিলেই চলবে। মাঠান জমির মত মেয়ে, সব সময়েই যে মাটি হয়ে আছে। ঘাসজলের মত। অমন ডাকাতে বাড়ির মেয়ে নয়। দেখতে ছোট হলেও ধানীলঙ্কার ঝাল বেশি।

হঁ্যা—তারপর—বাহাত্তরের তুই নামল হাতে রইল সাত—

হিসাব তজদিগ করছে প্রাণধন। কোথাও না পাই-পয়সার তছরুপ হয়। একপাশে দাঁড়িয়ে সেহানবিশ, আরেক পাশে তশিলদার।

'কে? দিদি না? সেই দেবীমূর্তি না?' এক লাফে বারান্দায় চলে এল প্রাণধন। হুমড়ি খেয়ে পড়ল তামসীর পায়ের উপর। আর, এতটুকুও প্রস্তুত হতে না দিয়ে উদ্দামশব্দে কেঁদে উঠল হাউ-হাউ করে।

এমন একটা বিষবিকৃত মুখ কল্পনা করতে পারতনা তামসী। এমন একটা পিণ্ডাকৃত মূর্খতা।

'আমার মধ্যে আর অস্তবস্ত নেই, আমি ঝাঁঝরা হয়ে গেছি। কোঁপরা হয়ে গেছি। আমাকে বাঁচান।'

'কেন, কী হয়েছে?'

'এদিকে লাটদারি পেলাম ওদিকে আমার মহাল লাটে উঠল। সিংহাসন পেলাম কিন্তু মুকুট পড়ল খসে। আনলাম সোনার খাঁচা তৈরি করে, কিন্তু পাখি আমার উড়ে গেল—'

'কেন, মরে যায়নি তো?'

'মরে গেলে দেশশুদ্ধু লোককে ডেকে আনতাম দিদি, কি করে সোনার পিরতিমেকে বিসর্জন দিতে হয়ে। চন্দনকাঠে দাহন করতাম তাকে। গায়ে পরিয়ে দিতাম গনগনে গয়না। আগুন না সোনা কে বেশি রাঙা —লোকের ধাঁধা লেগে যেত। কিন্তু এ আমার সে কী করল—'

আবার উদ্দাম কান্না। অসহায়, অপটু উষসী কিছু একটা করেছে তা হলে!

'কী করেছে ?'

'আমার ঘরের চুড়ো ভেঙে দিয়েছে, নড়িয়ে দিয়েছে ভিত-বনেদ। মুখে চুনকালি মেখে দিয়েছে আমার। কাউকে না বলে একবস্ত্রে বাড়ি থেকে চলে গিয়েছে একদিন।'

তামসীর হেসে উঠতে ইচ্ছে করল। হাততালি দিয়ে উঠতে। কিন্তু মুখে একটা দয়ালু দুঃখের ভাব মাখিয়ে রেখে জিগগেস করলে, 'কোথায় গেছে ?'

ভগ্নহৃদয়ের হতাশ ভঙ্গি করল প্রাণধন। বললে, 'কেউ জানেনা। কত খোঁজাখুঁজি, কত থানা-পুলিশ, কোথাও কোনো খবর নেই।'

তবু এটাই যেন কত বড় সুখবর। উষসী যে এই জীবন্মৃততা থেকে বেরিয়ে যেতে পেরেছে এটাই অপূর্ব ঘটনা। বিপ্লবের নিমন্ত্রণপত্র তারও দুয়ারে এসে পৌঁছে গেছে। একটা ডাকাতি হোক এ বাড়িতে, তাকে নিয়ে যাক এ বাড়ির বাইরে, এ তার একান্তের কামনা ছিল। কিন্তু নিজেই সে নিজের অন্তরে খুঁজে পেয়েছে সেই দুর্বৃত্তকে। দরজা খুলে তাকে নিভৃতে অভ্যর্থনা করতে হয়নি। দরজা খুলে নিজেই সে তার অভিসারী হয়েছে। হোক সে মৃত্যু, হোক সে কলঙ্ক, তবু তা বিপ্লবের সারথি। সে এ জীবন থেকে দেখতে পেয়েছে আরেক জীবনাধিককে।

উপরে চলে এল তামসী, অন্তঃপুরের নিরালায়। ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টায় নিম্নস্বরে জিগগেস করলে, 'কেন চলে গেল ?'

এবার না জান কি অকথন শুনতে হয়। কিন্তু প্রাণধন স্বচ্ছন্দে সমস্ত অপরাধের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নিল। বললে, সে অধম, সে অযোগ্য, সে কদাচারী। অনেক সে তার ক্লেশের কারণ হয়েছে,

অনেক অপমানের। ক্ষীরপঙ্ক ছেড়ে সে ক্লেদপঙ্কে গিয়ে ডুবেছে। পাপ স্বীকার করতে তার আর আজ কুণ্ঠা নেই। কেননা সে আজ থেমেছে, ফিরেছে, পৌঁচেছে তার নিজের জায়গায়। আপনার পা ছুঁয়ে বলতে পারি দিদি, আমি বদলে গেছি, ছেড়ে দিয়েছি সেই অধঃপাতের রাস্তা। যতই ভোগের আগুন জ্বালি নিজেই দগ্ধ হই, ভোগ আর নিবৃত্ত হয়না। সেই ময়দানের আর ওর নেই। যত দৌড়ুই, ময়দানও ততই বেড়ে যায়। আমি হাঁপাই কিন্তু ময়দান হাসে। আমি ফুরোই কিন্তু ময়দান ফুরোয় না। তাই মাঠ ছেড়ে ঘরে চলে এসেছি। কিন্তু আমার সেই ঘরের মানুষ, মনের মানুষ ফিরল কই?

তামসী ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগল ঘর-দোর। সমস্ত কেমন সাজানো-গুছোনো, চুপচাপ। একটা যেন শৃংখলা ও পরিচ্ছন্নতার প্রলেপ পড়েছে। সত্যিই একটা পরিবর্তন হয়েছে গৃহবাসের। আগের সেই ফেনিল কদর্যতা নেই, সেই নির্লজ্জ ঔদ্ধত্য। শান্তি ও স্তব্ধতার পবিত্রতা যেন অক্ষত হয়ে আছে।

তামসীর বুকের ভিতরটা ধ্বক করে উঠল। এই স্তব্ধতা মৃত্যুর স্তব্ধতা নয় তো? আত্মহত্যা করেনি তো উষসী?

বাড়িতে পা দিয়েই তখুনি তাই চলে যাওয়া গেল না। কদিন থেকে এ রহস্যের উদ্ধার করতে হবে।

একটা কোথাও স্ত্রী-আত্মীয় নেই। সব বিতাড়িত হয়েছে। সাধাবণ ঝি-চাকর আমলা-ফয়লা আছে, তারাও আনাচে-কানাচে নির্বাসিত। জিজ্ঞাসা করতে প্রবৃত্তি হয়না, তা ছাড়া শেখানো কথাই বলবেনা তার ঠিক কি। চোখ মেলে রাখলেই সত্য উদ্ঘাটিত হবে। ধৈর্য ধরো। ধৈর্য কাকে বলে তার মতো আর জানে কে?

'আপনি কদিন এখানে থাকুন।'

তামসী দ্বিরুক্তি করল না। বললে, 'থাকব। যদ্দিন না একটা কিনারা হয়—'

'থাকবেন?' প্রাণধন উছলে উঠল: 'রাণীর মতো থাকবেন, না ঘরনীর মতো? মানে,' প্রচণ্ড হোঁচট খেয়ে নিজেই সামলে নিল তক্ষুনি: 'মানে, মানী অতিথির মতো দূরে-দূরে পর হয়ে থাকবেন, না, আত্মীয়ের মতো সব কিছু আপনার করে আপনার হয়ে থাকবেন?'

সরল সহাস্য মুখে তামসী বললে, 'আত্মীয়ের বাড়ি এসে পর থাকতে যাব কেন?'

প্রাণধন জানে এই মহত্ত্বময় উত্তরই সে শুনতে পাবে। যদি বিশ্বাস করেন তো বলি, আপনার আসবার আগে আপনাকেই চিঠি লিখছিলুম। আর কাকে নালিশ জানাব আপনি ছাড়া? আগ্রহই শেষ পর্যন্ত বিগ্রহে প্রকাশিত হল। আমি জানি আমার এ নিঃস্বতায় আপনি বিমুখ থাকতে পারবেন না। আপনি বিচার করবেন, বিহিত করবেন।

সরলতারও নিষ্ঠুরতা আছে। তামসী বললে, 'বলুন কী করতে হবে, করব।'

শুকনো গলায় ঢোঁক গিলল প্রাণধন। 'আমি আর পারিনা। ভেঙে পড়ছি। আপনি আমার সংসারের ভার নিন।'

'স্বচ্ছন্দে।' ভ্রূক্ষেপও করলনা তামসী। প্রায় হাত পাতল। বললে, 'স্বচ্ছন্দে কেন, সানন্দে। যদ্দিন না উষসী ফিরে আসে তদ্দিন তার সংসারের হাল-চাল ঠাট-বাট সব আমি বজায় রাখব। দিন, চাবি দিন আমার হাতে।'

উষসীর কাঁচের আলমারির মধ্যে অনেক বই-খাতার ফাঁকে বাবার একটা ফোটো অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বুকটা শিউরে-শিউরে উঠছে তামসীর। বাবার মুখ সে ভুলে গিয়েছিল, সেই অপরূপ উজ্জ্বল

চক্ষু দুটো। সে-চোখে শুধু তিরস্কার, না, আছে কোনো প্রচ্ছন্ন আশীর্বাদ, চোখের কাছে এনে তাই দেখতে ভারি আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে। তিনি যে তাকে মসী বলে ডাকতেন সে কি শুধু কালিমার কাহিনী, না, তাতে আছে জ্যোতির্ম্ময়তার প্রতিজ্ঞা? একদিন কলঙ্কী চন্দ্রের সঙ্গে তমোহারী সূর্যের একত্র বাস হয় বলেই তো তা অমাবস্যা।

তা ছাড়া, কে জানে, হয়তো ঐ তার গোপন আলমারিতেই রয়েছে তার চলে যাওয়ার ঠিকানা।

এক তাড়া চাবি নিয়ে এল প্রাণধন। বললে, 'আপনি আজ আমাকে এক পলকে হালকা করে দিলেন। আঁকড়ে ধরার চেয়ে ছেড়ে দেয়ায় যে কী সুখ তা বুঝতে পাচ্ছি এখন।'

হ্যাঁ, একটা লোহার সিন্দুকের চাবি, একটা মহাফেজখানার। বাক্স-প্যাঁটরা আলমারি-সিন্দুক সব আপনি বুঝ-সুঝ করে নিন। লাগামে ঢিল দিতে চান দিন, কষতে হয় কষুন। জমিদারিটা বাঁচান।

ঘাবড়ালনা তামসী। বললে, 'একদিনে সব হজম করতে পারবনা। আস্তে-আস্তে। আজকে শুধু এই কাঁচের আলমারির চাবিটা দিন। কে জানে, হযতো একটা আলমারি আযত্ত করবার আগেই সে এসে পড়বে।'

সে এসে পড়লেই বা তাকে হাত বাড়িয়ে তুলে নেবে কে? যে অমন গোঁযারের মতো জোর দেখিয়ে চলে গেল এ সংসারে তার আবার প্রশ্রয় কোথায়?

তা ছাড়া, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সে আর আসবেনা।

আসবেনা?

না, সে গেছে আমার উপর প্রতিশোধ নিতে। আমাকে জবরান জব্দ করতে। আমার মুখে কালিজুলি মাখাতে। তার পথে বাধা আসুক, আঘাত আসুক, অপমান আসুক, এখানে ফিরে আসবার মত

পরাজয় সে কিছুতেই ভাবতে পারেনা। আর, আমিই বা কী ভাবতে পারি বলুন? আমি কি এত সামান্য এত সম্বলহীন যে যে গেছে তারই জন্যে হাপুসচোখে কাঁদব, যে আসছে তার জন্যে হা-পিত্যেশ করবনা? হরে-দরে পুষিয়ে নিতে পারবনা? বাজার এখন পডতি বলেই কি আর আমাব পড়তা পড়বেনা ভেবেছেন?

এ একেবারে আরেক রকম মূর্তি। তবু দেখনহাসি হাসল তামসী। বললে, 'বলা কি যায়, বহুদিনের অদর্শনের পর যদি ফেব দেখা হয়, হয়তো আঁকুপাঁকু করে উঠবেন।'

আর কত অদর্শনের দণ্ড নিতে হবে তাকে? নিতান্তই বদলে গেছে বলে সে আব হালুচালু কবছেনা। ভদ্র হযে গেছে, শান্ত হয়ে গেছে। দুঃখরাতের বুক চিরে চাঁদের কলি দেখা দিলেও জোযার তুলছেনা। বসে আছে পূর্ণিমার প্রতীক্ষায। পূর্ণপাত্রেব প্রতীক্ষায়। প্রাণধনও শোধ তুলতে জানে।

দুপুবের শেষে খাওয়া-দাওযাব পব তামসী উষসীর আলমারিটা ঘাঁটতে বসল। বাবার ছবিটা দেখল অনেকক্ষণ তীক্ষ্ণ চোখে। সে-দৃষ্টিতে আশীর্ব্বাদ না ভৎর্সনা কিছুই পডতে পাবছেনা তামসী। যেন একটা অভয়দক্ষিণার আভাস পাচ্ছে—শুধু এগিযে যাবার আহুতি। অশ্রু-নম্র চোখে প্রণাম করে আবার তা রেখে দিল স্পষ্ট জায়গায়। উবসী যখন ফিরে আসবে তখন প্রথমেই যাতে চোখে পড়তে পারে। যাতে সহজেই এ-চোখে খুঁজে নিতে পারে ক্ষমা, সহিষ্ণুতা।

আরো অনেক সে ঘাঁটাঘাঁটি করল। কতগুলি শাড়ি-জামা, বই-খাতা, খুচরো গয়নার খোলা একটা বাক্স, কিছু টাকা-পয়সা আর টুকি-টাকি কটা প্রসাধনের জিনিস। কাগজপত্রের জঞ্জাল ঘেঁটেও পাওয়া গেল না একটা ছেঁড়া চিঠির টুকরো। অগ্নিদীপনের এতটুকু ধূমচিহ্ন।

রাত্রে শুয়ে একাকী অন্ধকারে তামসীর ভয় করতে লাগল। প্রাণধনের ভব্যতার ভয় নয়, উষসীর ভবিতব্যতার ভয়। সে ক্ষীণশ্বাস জলধারা কি করে হঠাৎ অত্যন্তগামিনী হল—পাষাণবিদারিণী? কী দুনিবার দুঃসাহসে সে এই উচ্চচূড় অভিজাত আশ্রয় ছেড়ে চলে গেল অপরিচিত অন্ধকারে? সে কিসের প্রেষণা? সে কি প্রেম, না, মৃত্যু, না অবিচ্ছিন্ন অত্যাচার? কোন শান্তি, কোন সিদ্ধির সন্ধানে সে আজ দূরযায়িনী?

আর তামসী কিনা একটি উষ্ণ নীড়ের জন্যে পাখা গুটিয়ে রয়েছে। সে কিনা চাইছে পত্রপরিবৃত শ্যামল স্নেহচ্ছায়া। মনে-মনে সেই লিপ্সা আছে বলেই হয়তো বিশ্রাম নিতে বসেছে এখানে। এমন কি, মনের গহনে এমন প্রার্থনা পর্যন্ত করছে যেন উষসী একদিন ফিরে আসে। ফিরে এসে বাবার ছবিকে প্রণাম করে মার্জনা চেয়ে নেয়।

না, বাবা মরে গেছেন। উষসী যেন কোনো দিন না ফিরে আসে। তার আবস্তের যেন না শেষ হয়। আর সে, নিজে,—বালিশে মুখ ঢাকল তামসী—ঝরে যাক, মরে যাক, কোনো দিন যেন না ফিরে যাবার নাম করে। তার শেষের আর আরম্ভ না হয় কোনোদিন। সমুদ্রের মৌনে সে ডুবে যায়, মুছে যায় নিঃশেষে।

প্রাণধনকে কি ভব্যতায় আরো শিক্ষিত করা দরকার? আরো তপঃক্লেশসহ? নইলে দিনে-দিনে তামসী শিকড় মেলছে কেন? একটার পর একটা চাবি বাঁধছে কেন আঁচলে? সমস্ত সংসারে রাখছে কেন প্রশ্রয়ের শীতলতা?

যে যাই বলুক, ভীত স্তব্ধ বাড়ির দেয়াল থেকে এখনো পাঠোদ্ধার হয়নি। কেন, কোথায় চলে গিয়েছে উষসী?

তামসী নিচে নেমে এল, চাকর-বাকরের মহলে। রান্না-ভাঁড়ারের

তদারকে। সবাই পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল। আনাচে-কানাচে কান পেতেও কানাঘুসো কিছু শুনতে পেলনা। জিগগেস করলে, সেই বুড়ো ঝিটা কোথায়? শুনলে, হুজুরানীর সঙ্গে ঠিক ভাবে কথা বলতে পারেনি বলে বরখাস্ত হয়ে গেছে। বুঝতে পারল, যে সর্বশেষ বন্ধুটি ছিল তাও আর নেই।

'আপনি কেন যাবেন রান্নাঘরে কালিঝুলি মাখতে?' প্রাণধন আপত্তি করল। 'ওখানে কি আপনাকে মানায়?'

কোথায় মানায় জিগগেস করল না তামসী। বললে, 'কাজ একটা কিছু করতে হবে তো—'

'কাজ? কাজের ভাবনা কি। চলুন কোথাও আমরা দূরে বেড়াতে যাই, অনেক দূরে।'

'আপনার জমিদারি?' তামসী হাসল। 'জমিদারি দেখবে কে?'

'দেখুক না-দেখুক, কিছু এসে যায় না। ও আমি ছেড়ে দিতে পারি। আপনি এত ছেড়েছেন, আপনার জন্যে—'

'কেউ কিছুই ছাড়ে না। ছাড়িয়ে নেয়। তাই ছাড়িয়ে নেবার দিন না আসা পর্যন্ত ছেড়ে দেবেন না দয়া করে। বরং ভাল করে চৌকি দিন।'

এতে এত হাসবার কী ছিল কে জানে। প্রাণধন দম নিয়ে বললে, 'তাইতো আপনাকে রেখে দিতে চাই। এক বিষের কাটান আরেক বিষ।'

তামসী চুপ করে গেল। একটা ইঙ্গিত কি ঝলসে উঠল হঠাৎ?

'কোথায় আর টো-টো করবেন, এখানেই থেকে যান।' প্রাণধন স্খলিতস্বরে বলতে লাগল: 'ব্যাপারটা মোটেই অশাস্ত্রীয় হবে না। আমি অনেক ভদ্র হয়েছি। বাঁটোয়ারার পর আমার আয় বেড়েছে।

নতুন বাড়ি কিনছি কলকাতায়। কেন ঘরের সন্ধানে আর দোরে-দোরে ঘুরে বেড়াবেন? এত বড় যার আশ্রয়, তার কিসের অভাব?'

'বা, আমি তো এই বাড়িতেই আছি! সবুর করুন, আগে উষসীর মৃত্যুসংবাদটা জানি ঠিকঠাক।'

একটা খাস-ঝি বহাল হয়েছে তামসীর। বলে, 'বাবু বলেন কী অমন কালিঝুলি মেখে বসে থাকো—এটা ভালো দেখায় না। সাজ-গোজের বয়স তো আর চলে যায়নি—'

যায়ইনি তো। কই, গয়না-শাড়ি কই? শুধু মুখের কথা!

অতদূর ঝি কী জানে? সে বড় জোর চুল বেঁধে দিতে পারে, নখ কেটে পরিয়ে দিতে পারে আলতা। গায়ের মাটি তুলে দিতে পারে ঘসে-ঘসে।

তাই দে বাবা, তাই দে। আর এমন সুযোগ পাব না। পা দুটো টিপে দে আচ্ছা করে। কত হেঁটেছি, আরো কত হাঁটব।

হাঁটতেই একদিন বেরুচ্ছিল তামসী। বুঝছিল বাড়িতে বসে থেকে কোথাও সে ঠিক সন্ধান পাবে না। পাবে বাইরে, প্রতিকূল প্রতিবেশীর মহলে।

'শুনুন।' পিছন থেকে ডাক দিল নগেন। বাজার-সরকার। 'বাবু আপনাকে ডাকছেন।'

ব্যাপার কী?

ব্যাপার সামান্য। এই বেশবাস তার পক্ষে উপযুক্ত নয়, বিশেষত যখন সে পায়ে হেঁটে রাস্তায় বেরুচ্ছে। অন্তত যে-বাড়িতে সে অধিষ্ঠাত্রী হয়েছে তার মর্যাদার অনুরূপ নয়।

সত্যিই তো। তামসী লজ্জায় হেসে ফেলল। বললে, 'তবে ছাদে গিয়ে বেড়াই।' বুঝল, পাড়া বেড়াবার পথ তার খোলা নেই।

আরেক দিন আবার ডাক পড়ল তামসীর।

ওটা সেরেস্তা। আমলা-মুহুরির আস্তানা। ওখানে আপনি যাবেন কেন?

বা, জমিদারির কাজকর্ম একটু-আধটু শিখতে চেষ্টা করব না? কী ভাবে খাতা লেখে, তেরিজ কষে? কোন খাতার কী নাম?

না। জমিদার বাড়ির সেটা রেওয়াজ নয়। তাদের বাড়ির স্ত্রীলোকের আভিজাত্য তাতে ক্ষুণ্ণ হয়।

এখন বুঝতে পারছি। অনুতপ্ত মুখ করল তামসী। একেবারে হেঁজিপেঁজির ঘর থেকে এসেছি কিনা, সব ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারি না।

বুঝল, দোতলা থেকে নামা তার নিষেধ হয়ে গেছে।

জামবাটি করে সকালে দুধ নিয়ে এসেছে ঝি। তাই খেতে-খেতে তামসী নিচে হঠাৎ একটা গোলমাল শুনল। ক্রুদ্ধ ও আর্তকণ্ঠের চীৎকার।

ঝিই এসে খবর দিল। সেহানবিশবাবুকে কর্তা মেরেছেন। হ্যাঁ, গায়ে হাত তুলে মেরেছেন। হিসেব মেলাতে ভুল করছিল বারে-বারে।

শুধু মারা? চাকরি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল। হিসেব মেলাতে পারে না, সে আবার সেহানবিশ? চুপি-চুপি দেখে আয় তো, এখনো চাকরি করছে কিনা—

করছে বৈ কি। তার পরের দিনও করছে। না করলে খাবে কি? তবে যা, চুপিচুপি এই চিঠিটা দিয়ে আয় তাকে। তার চাকরিটাকে খেতে হবে।

দুপুরবেলা প্রাণধন ঘুমোচ্ছে। কটা ঘুঘুর ডাক ছাড়া আর কোনো

শব্দ নেই। দোতলার সিঁড়ির মুখে সেহানবিশ, বটকৃষ্ণ, তামসীর সঙ্গে দেখা করলে। ত্রস্ত স্বরে বললে, 'কী জরুরি কথা, তাড়াতাড়ি সেরে ফেলুন। নগেন সরকার দেখে ফেললে বাবুর কাছে রিপোর্ট করে দেবে। আমার চাকরি থাকবে না।'

'আপনার চাকরি যায় তাই তো আমি চাই।'

'চান?'

'হ্যাঁ, সমর্থ পুরুষ হয়ে মার ফিরিয়ে দিতে পারেন না তার আবার চাকরি কি?'

'সকলেই নারায়ণ রায় হতে পারে না। আমাদের যাদের ছাপোষা সংসার আছে—'

কে নারায়ণ রায়? বাড়ি কোথায়? সে এখানে কেন?

সে এখানে আমারই মত খাতা লিখত। কী খেয়াল হয়েছিল ভিতর থেকে দেখতে এসেছিল জমিদারির ফের-ফেরের। কী ভুল করেছিল, বাবু তাকে চড় মেরেছিলেন। সে জেল-খাটা স্বদেশী, আপনি আর কোপনি, চতুর্গুণ করে মার সে ফিরিয়ে দিলে। শুধু শরীরে নয়, মনে, সমস্ত সংসারে। চাকরি ছেড়ে চলে যাবার সময় একা গেল না, বাবুর স্ত্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল।

তামসীর বুক কাঁপতে লাগল শুকনো পাতার মত। কি করে সম্ভব হল এ অঘটন?

অন্তঃপুরেও ছিল এমনি মারের কাঠিন্য। মনের বৈরিতা। দুই অত্যাচারিতের মধ্যে জন্মেছিল এক অলক্ষ্য সহানুভূতি একই উৎপীড়নের বিরুদ্ধে। একই পথ তারা আবিষ্কার করল, শুধু নির্গমনের নয়, প্রতি-আক্রমণের। সমধর্ম কর্মের দীপনায়। এক দুরুচ্ছেদ শোষণের শোধনে। ঋণ-পরিশোধে।

কোথায় তারা ? উদ্বেল হয়ে উঠল তামসী।

এই মাইল আষ্টেক দূরে, অধঃপতিত গ্রামের মধ্যে। চাষাদের একত্রীকৃত করছে। নিয়ে যাচ্ছে প্রতিঘাতের ঘনতায়। আপনি যাবেন ?

উড়াল দিয়ে যাব। গ্রামটার নাম বলুন।

নাম বললে। বললে, সকালবেলা বাস যায় পাশের সড়ক দিয়ে। বড় রাস্তা থেকে পোয়াটাক পথ ভিতর দিকে। আল পাবেন খটখটে।

আপনিও যাবেন একদিন সেই হালট ধরে। যেদিন আপনার চাকরি থাকবে না।

বেঁটে নগেন সরকার আসছে এ দিকে। পালান।

আফিং যেন বহুদূরের রাস্তা, মদ অনেক দ্রুতগামী, অসমসাহসিক। সেই সন্ধ্যায় প্রাণধন তাই মদ খেল। দুঃখের উপর টনকের ঘা আর সে সইতে পারছে না। সময় অত্যন্ত মন্থর, রক্ত ক্ষিপ্র। বলবন্ত ঝড় না হলে উড়বে না এই পুঞ্জিত প্রত্যাখ্যান।

ঝি বললে, বাবু এসব পাঠিয়ে দিলেন। সেজেগুজে যেতে বললেন তাঁর কাছে।

ঝলমলে রঙিন শাড়ি-ব্লাউজ আর নানা অঙ্গের গয়না কতগুলো। সন্থ-কেনা নয় বোধ হয়, আর কারু ব্যবহৃত।

একটা কোথাও লকলকে চাবুক পাওয়া যায় না হাতের কাছে ? সপ্তজিহ্ব আগুনের মত তামসী দাউ-দাউ করে উঠল।

আর কী বলতে যাচ্ছিল ঝি, তামসী ঝাঁকরে উঠল। বাঘিনীকে আর ঘাঁটাসনে বলছি। অঘটন হবে।

'তবে এ সব ফিরিয়ে নিয়ে যাব ?'

'না। এ সব তোর। তুই আমাকে সাজাতে চেয়েছিলি না ?

এ-সব দিয়ে তোকে আজ সাজিয়ে দেব। তুই শুধু রাত করে চুপিচুপি খিড়কির দরজাটা খুলে দিয়ে আসবি।'

'ওমা, সে কি গো? তুমি চলে যাবে, আর আমি—'

'গজস্কন্ধ বুঝবেনা কিছুই তারতম্য। সহজেই, অনেক টাকার মালিকি পেয়ে যাবি। জমি-জায়গা হবে, মাটকোটা হবে, ঘাটবাঁধানো পুকুর হবে তোর—'

দাসী সলজ্জ কটাক্ষ করল।

রাত না পোহাতেই রিক্তহাতে বেরিয়ে এসেছে তামসী। রেলের সরু লাইনের স্টেশনের দিকে না গিয়ে বাসের ফাঁড়ির দিকে এগুলো।

কিন্তু বাস কই?

ওদের স্ট্রাইক মেটেনি এখনো। একটা গরুর গাড়ি ডেকে দিচ্ছি। সেই বল্লভপুর যাবেন তো?

পিছনে নগেন সরকার। সঙ্গে কুলির মাথায় তামসীর পরিত্যক্ত সুটকেস আর দড়ি দিয়ে বাঁধা সতরঞ্চি জড়ানো বিছানা। ও দুটো জিনিসের থেকে মুক্তি নেই তামসীর।

বিশ্বস্ত বন্ধুর মত মনে হল জিনিসদুটোকে। ও দুটোকে ফেলে যাওয়ার কোনো মানে হয়না।

'কোনো মানে হয়না।' বললে নগেন সরকার। 'যাচ্ছেন অজ পাড়াগাঁয়, কদ্দিন থাকবেন তার ঠিক কি। বাক্স-বিছানা না হলে চলবে কেন? আর অমন পালিয়ে যাবারই বা কী হয়েছে? আমাকে বললে সব ভদ্রভাবে সমাধা করে দিতে পারতাম।'

আসলে লোকটা হয়ত ভাল। অন্তত এখন তো ভাল। তেজী গরুর গাড়ি জো ড় রে আনল। খড়-পাতা টপ্পরওয়ালা গাড়ি।

গই-গাঁয়ের নির্দেশ দিয়ে দিলে গাড়োয়ানকে। বললে, একজন আটপ্রহরী দেব সঙ্গে ?

দরকার নেই। গাড়োয়ানই জান্তা।

তবু কৌতূহল হচ্ছিল তামসীর। জিগগেস করলে, 'বাবু কী বললেন ?'

'কী আর বলবেন। বললেন, মানুষ করে আস্বা, কিন্তু ঘটান জগদম্বা।'

সাতাশ

এই সব প্রজা নাতোয়ান প্রজা—খাজনা দিতে অপারগ প্রজা। প্রাণধনের ভক্ষ্যভোজ্য। সবাই খুদকস্তা, দু'পাড়ায় দু'চাপে দু'জাতের বসতি। খুব বেশি ফাঁক-ফারাক নেই। ডাকলে শোনা যায়, কাঁদলে শোনা যায়। একই রকম রোগে-ভোগা ছেঁড়া-কানি-পরা হা-হন্ত চেহারা। ডিগডিগে পেট, জিরজিরে বুক। শুধু হাতের থাবাগুলো চওড়া, আঙুলগুলো মোটা-মোটা। লাঙল-ঠেলা আর মাটি-ঘাঁটার ঢেরা-সই। শক্তির ইঙ্গিত আছে, কিন্তু শক্তি নেই। হাতের মুঠোর মধ্যে অতিষ্ঠ নিঃস্বতা। বর্বর মাটি যারা উর্বর করল তারাই কিনা সব চেয়ে অকিঞ্চিৎ!

'আমরাও গরুর মতই খাটি, গোয়ালে গিয়ে সানি খাবার মত দু মুঠো ভুষি খাই।'

'তা-ও জোটেনা হর-রোজ। খাজনা টেনে আর সংসার টানতে পারিনা।'

'তা ছাড়া নাতোয়ানের দুনো মালগুজারি। আসলের উপরে সুদ, খাজনার উপরে ক্ষতিপূরণ। মড়া না পুড়লেও পাটুনীর কড়ি মারা যায় না কিছুতেই।'

না, দেবেনা তোমরা খাজনা। বলে নারায়ণ। পাশে দাঁড়িয়ে ঊষসী। হাল না, বকেয়া না, খাজনা দেবেনা এ বছর।

কী অমানুষের বছর পড়েছে এবার। সময়মত জল হয়নি। সব জমি জাগেনি তাই। দড় হয়ে আছে, তিরিক্ষি হয়ে আছে। আর-আর বার ধান হত যেন মেঘ করে থাকত। এবার ধান হয়েছে না ডুব্বো হয়েছে। এবারে ঠিক ভাতের অভাবে মারা পড়ব। কাতিকে জল না হয়ে যখন অঘ্রানে হল তখনই বুঝেছি ফলাফল। যদি বর্ষে কাতি, সোনা রাতি-রাতি। যদি বর্ষে আগন, হাতে-হাতে মাগন।

সস্তার বাজার সে আর নেই। দর-দাম তেজী হচ্ছে ক্রমে-ক্রমে। তেল-লুন, পেঁয়াজ-লঙ্কা, আর তাদের অঙ্গণের বন্ধু হুঁকো-তামাক। মজলিস আর গুলজার হয় না। আহ্লাদ-আমোদ ইস্তফা নিয়েছে জীবন থেকে। ভাত-কাপড়ের দুঃখে বুঝি বা এবার সবাই ফেরার হয়ে যাব।

না, কোনো ভয় নেই। খাজনা দিবি নে এ বছর। ধান ছাড়বিনে। জমি আঁকড়ে পড়ে থাকবি। বাজার রাখবি দালাল-ফড়ের হাতে নয়, তোদের হাতে। তাতেই সুরাহা-সুগতি হবে। মুখ দেখতে পাবি সুদিনের।

কিন্তু কী জঙ্গীবাজ জমিদার!

তা আর বলতে। উষসী নিজের চোখে দেখে এসেছে তার চেহারা। দুর্বল প্রজা, খাজনা দিতে পারেনি, পাইক এসে পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে নিয়ে গেছে। কয়েদ করে রেখেছে বন্ধ ঘরের মধ্যে। লঙ্কা পুড়িয়ে ধোঁয়া দিয়েছে। শেষে গরু বেচে জমি বেচে মিটিয়ে দিয়েছে খেলাপী খাজনা। যে দেবে বলে কথা দিয়ে আর ফিরতে পারেনি, ঘর জ্বালিয়ে তাকে নিঃস্বত্ব করে দিয়েছে। আর, নিষ্পীড়নের কী সে দুর্দান্ত প্রকার-পদ্ধতি। হালের খাজনা দিচ্ছে, উশুল পড়ছে তামাদী বকেয়ার ঘরে। নায়েবনজরে কেটে নিচ্ছে মোটা অংশ,

এমন কি চেকের দাম, যে পেয়াদা তাগাদায় গিয়েছিল তার খাই-খোরাকি। তা ছাড়া বাব-বাবিয়ানা কত! মোটর কিনবে প্রাণধন, তার জন্যে মোটরোয়ানা চাই, গ্রামে কে বেশ্যাবৃত্তি করতে বসেছে তার জন্যে নাগর-সেলামি। দেবতাস্থাপনের জন্যে ঈশ্বরবৃত্তি, অথচ সেই দেবতার কাছে এসব প্রজার ঘেঁসবার অধিকার নেই। কথায়-কথায় ভেট-বেগার। মাগনা খেটে যাবে কিন্তু খেতে পাবেনা। চারদণ্ড খাড়া না থাকলে অমনি জরিমানা।

দিনের পর দিন চোখের উপর দেখেছে এই নির্যাতনের দৃশ্য, প্রতারণার অনুষ্ঠান। সইতে পারেনি উষসী। নিজের গ্রাসের অন্তরালে দেখেছে এদের অসভ্য ক্ষুধা, নিজের আরামের অন্তরালে অসহ্য লেগেছে এই দগ্ধানি। নিজে অপমানিত বলেই হয়তো বুঝতে পেরেছে ওদের অপমান, নিজের বঞ্চনার মাঝে ওদের অকিঞ্চনতা। [illegible] ওদের মত সেও কি অকর্মক হয়ে থাকবে? অসাড় আকাশে কি ঝড় উঠবেনা? ওদের মধ্যে সব চেয়ে যা ভয়ের, তা ওদের ঐ স্তূপীভূত ভয়, অনড় অসহায়তা। সেই অচেষ্টা কি একেবারেই অচিকিৎস্য? ওদের ভয় বলে উষসীও কি ভয় পাবে? ওরা বসে আছে বলে কি উষসীও থাকবে কোণমুখো হয়ে? উষসী যখন জাগতে পারল তখন ওরাই বা জাগবে না কেন? ক্ষীণশ্বাস নদীই যদি জাগতে পারল, তখন জাগবেনা কেন সেই নিবাত সমুদ্র? নিথর সমুদ্র?

উষসী প্রথম দেখা দিল করুণার বেশে। এল নিচে নেমে। যে প্রজা বেগার দিতে এসেছে তাকে খেতে দিলে পেট পুরে। যাকে বেঁধে রাখা হয়েছে তাকে খালাস করে দিলে। যার জরিমানা হয়েছে তার হাতে গুঁজে দিলে দণ্ডের টাকা। যে গরু বেচে খাজনা শুধেছে তাকে দিলে খেসারৎ।

মহালে ঢ্যাঁটরা পড়ে গেল অসুরের ঘরে সুরধুনী এসেছেন।

এত অল্পে মন ভরছিল না উষসীর। ভিতরে সে প্রবেশ করতে চাইল। নারায়ণ তাকে খুলে দিলে দরজা। বললে, দেখুন, কোত্থেকে আসছে আপনাদের সম্ভোগের সম্ভার, কোন উপবাসীর ঝুলি থেকে। যদি সত্যিই কিছু করতে চান, দেখুন, হাতে করুণা নেবেন কিনা, না কুঠার নেবেন!

কোন সন খাজনা দেবে? হাল সন, মা-ঠাকরুণ, সালিয়ানা দাখিলা নিয়ে যেতে চাই। কেন বকেয়ায় উশুল দেবেন? প্রজা যে সন উল্লেখ করছে তাইতেই আদায় নিন। না, নিতে পারবেন না রাজার নজর, নায়েবসম্মান। আমার সামনে ফর্সা ফারখৎ লিখে দিন। তোমার কী? জমা একবার দাখিল-খারিজ করে নিয়েছি তবু আবার ষোল আনা খাজনার দাবিতে আর্জি করেছে। সে কি কথা? অন্য সরিকে কবুল করতে চায় না জমা-বিভাগ। তাতে কি? ও যখন ওর অংশ-মত মিনহাই পেয়েছে তখন আর ওকে ঠকানো কেন? তুমি কে ওখানে বসে আছ মন-মরার মত? নদীতে জমি প্রায় আদ্ধেক ভেঙে গিয়েছে, তবু খাজনা হারাহারি কমি করে নিচ্ছেনা। কোন বছর কতটা নদীগত হয়েছে তার জরিপী প্রমাণের ভার প্রজার ঘাড়ে। আদালতে তা প্রমাণ হয়ে যাক, খাজনা মকুব পাবে। তার আগে যতক্ষণ না ইস্তফা দিচ্ছে, আমরা এক কাগ-ক্রান্তিও ছাড়ব না। সে কি সর্বনেশে কথা! খরচ করে জরিপ করাবে নির্ধন প্রজা, নদী যাকে নিরন্ন করল? নদীর যেমন জমির লালসা, জমিদারের তেমনি খাজনার? আশ্চর্য! চোখের উপর নদী দেখে আন্দাজে বুঝে নিতে পারেন না থিত জমির পরিমাণ? সেই বুঝে ধরাট করে দিন।

এমনি চলছিল প্রাণধনকে লুকিয়ে-চুরিয়ে। সুমার খাজাঞ্চিরা

একটু বা প্রশ্রয়ের ভাব থেকে এদিক-ওদিক সুসার করে দিচ্ছিল প্রজাদের। কিন্তু বেশিদিন এ ভাবে চললে রাব-দাব মান-ইজ্জৎ সব তো যাবেই, সমস্ত জমিদারিই যাবে রসাতলে। তাই ব্যাপারটা কানে উঠল প্রাণধনের। একটু বা পল্লবমণ্ডিত হল। নারায়ণই মূল গায়েন।

গর্জন করে উঠল প্রাণধন: 'এ সব কী আরম্ভ করেছ?'

নিমেষে বুঝে নিল উষসী। শান্তস্বরে বললে, 'সুখী হবার চেষ্টা করছি।'

'সুখী হবার?' থমকে গেল প্রাণধন।

'হ্যাঁ, নিজের জন্যে কিছু করবার মধ্যে আর সুখ নেই। চেষ্টা করছি, পরের কোনো কাজ করতে পারি কিনা। পরের উপকার করতে পারার মত সুখ নেই পৃথিবীতে।'

'এখানে চলবেনা এ সব কেলেঙ্কারি।' প্রাণধন দাঁত-খামাটি করে উঠল। 'আমারই ঘরে বসে আমারই বনেদ খুঁড়বে?'

'যদি বলো তো তোমার ঘর ছেড়ে চলে যাব।'

চলে যাব! উষসী যেন দেখতে পেয়েছে সেই চলে-যাওয়ার দেশ। এক অন্তহীন রিক্ততার রাজ্য। যেখানে রিক্ততা সেখানেই শক্তি, সেখানেই সংগ্রাম। আর যেখানেই শক্তি আর সংগ্রাম সেখানেই সত্য।

সেই রিক্ততার রাজ্যেই অনন্তবীর্যের জন্ম হবে একদিন।

এর পর প্রাণধন একটা অশ্লীল মন্তব্য করলে, যা শুধু তার পক্ষেই সম্ভব! বললে, যেতে হলে তার কথার অপেক্ষা করবে না, অপেক্ষা করবে তার নাগরের ইসারা। তবিল অনেক সে তছরুপ করছে, কিন্তু খাজাঞ্চিখানায় নাগরসেলামিটা যেন দিয়ে যায়।

সেদিন অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হয়ে গেল।

এক প্রজা এসেছিল বাকিপড়া নিলামী জমি বন্দোবস্ত নিতে।

হাতনাগাৎ সব পাওনা সে মিটিয়ে দিতে প্রস্তুত, জারির খরচ—নায়েবনজর পর্যন্ত, তবু তাকে তার বাস্তু-বিলেন ফিরিয়ে দেয়া হবে না। কেন, ব্যাপার কী? সেলামি চাই। বিঘে ভুঁই কুড়ি টাকা সেলামি। বাহাল বন্দোবস্তে সেলামি নেবে—এ কী নৃশংসতা? উষসী ঝামটে উঠল। উপরালার রুবকারি পেয়ে গেছে, কাছারি আর কানে তুলছেনা এই মেয়েলি কাকুতি। উষসীর গায়ে যেন অপমান লাগল। সে জিগগেস করলে, কত টাকা? প্রজা বললে, দশ বিঘে, দু শো টাকা। মরিয়ার মত উষসী উপরে চলে গেল, ঘোমটা-খসা পিঠের উপরে অবাধ্য চুল এলিয়ে দিয়ে। আলমারি খুলে বার করে আনলে টাকা। প্রজা হাত বাড়ায় না দেখে টাকাটা জোর করে গুঁজে দিলে তার মুঠোর মধ্যে। বললে, 'একমুষ্টে ফেলে দাও মুখের সামনে। দেখি তোমার জমি থেকে তোমাকে কী করে বিচ্ছেদ করে রাখে এরা!' পরে নায়েবকে লক্ষ্য করে বললে: 'আদালতে গিয়ে এবার চূড়ান্ত দরখাস্ত দাখিল করুন। অন্তত একটা আমলনামা দিয়ে দিন একে।'

প্রাণধন্ন যখন শুনল হন্যে হয়ে উঠল।

'তোমাকে বলেছি না নিচে কাছারিতে যেতে পারবে না কোনো দিন? খাতক-প্রজার ব্যাপারে মাথা গলাতে পারবেনা?'

'তোমাকে বলেছি তো, আমার আর কিছুতে সুখ নেই! এ সংসার আমার কাছে শ্মশান-মশানের মত। শুধু, দুঃস্থ-দুঃখী কাউকে কখনো কিছু আরাম দিতে পারি, জোরের থেকে জুলুমের থেকে, অন্যায় শোষণের থেকে রক্ষা করতে পারি—এটুকুই আমার আরাম।'

সুখসন্ধানী প্রাণধনও কিছু কম নয়। আর, সে সর্বদা সুখ চেয়েছে স্থূল হাতের মধ্যে। তাই সে হঠাৎ বাঁ হাতের মুঠিতে উষসীর খোলা চুলের মোটা একটা গুচ্ছ সজোরে টেনে ধরল।

উষসী একটা টুঁ শব্দ করল না। গা পেতে মার খেল পৃথিবীর মত।

গৃহশক্রকে নিপাত করে প্রাণধন বহিঃশক্রর সম্মুখীন হতে চাইল। কাচারিতে নেমে তলব হল হিসাব তজদিগের। মা জগদম্বাই জানেন সে কী বুঝবে গণা-গাঁথার, শুধু একবার চোখ লাল করে নারায়ণকে কড়কে দেওয়া। ডাক হল নায়েবের। কি, কাজকাম ঠিক হচ্ছে সবাইকার? না, বেদের রোজগার বাঁদরে খাচ্ছে?

প্রায় সেই দশা। সবিনয়ে বললে সদরনায়েব। নারায়ণবাবু খালি ভুল করছেন। বকেয়ার খাজনা হালের ঘরে উশুল টানছেন। জাহাজ প্রায় তলাফুটো হতে চল্লেছে।

ডহর ডাঙ্গা করে ছাড়ব। সত্যি?

বোঝবার দোষে দু-এক ক্ষেত্রে ভুল হতে পারে, কিন্তু প্রজা যেখানে স্পষ্ট হাল বলে খাজনা দিচ্ছে শঠতা করে তা তামাদী বকেয়ার ঘরে উশুল দেব বা সুদের অন্দরে কেটে নেব তা বরদাস্ত করি কি করে? নারায়ণ বললে অকম্প দৃঢ়তায়।

প্রথমে তর্ক। শেষে হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজনায় প্রাণধন নারায়ণের গাল বাড়িয়ে এক চড় কসালে। সামান্য অবজ্ঞেয় আমলা, তার এই ঔদ্ধত্য!

উপরে বসে উষসী একটা চীৎকার শুনতে পেল। যেন একটা অনড় দুঃস্বপ্ন জাঁতার মত বুক চেপে আছে, এমনি ভয়ার্ত শব্দ। সন্দেহ নেই, প্রাণধনের গলা। উষসী নেমে এল মন্ত্রজীবিতের মত। তবে কি প্রজারা ক্ষেপে উঠেছে? আক্রমণ করেছে কাছারি? নখে-দাঁতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে প্রাণধনের উপর?

না, নারায়ণ হাতে-হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে মার। বেশি ঘাল করতে পারেনি, আর-আররা এসে মাঝে পড়ে ছাড়িয়ে দিয়েছে। উষসীকে রক্ষা করেছে তার বৈধব্য থেকে।

উষসী বেরিয়ে এল রাস্তার উপরে। দ্বিপ্রহরের প্রাখর্যে। প্রতিবাদের স্পষ্টতায়।

বললে, 'চাকরি ছেড়ে চললেন নিশ্চয়ই—'

'হ্যাঁ, আপনি ?'

'আমি ঘর ছেড়ে।'

'বলেন কি ?' নারায়ণ তাকাল উষসীর দিকে, তার খোলা চুল ঝামরানো মুখ-চোখের দিকে। বললে, 'ভেবেছেন কী পরিণাম ? এই দোর চিরকালের জন্যে বন্ধ হয়ে যাবে আপনার কাছে।'

'এক দোর বন্ধ তো হাজার দোর খোলা। আমাকে আপনি আপনাদের কাজের মধ্যে নিয়ে চলুন, বিপ্লব তৈরি করার কাজে।' ধীর পায়ে উষসী চলতে লাগল পাশে-পাশে : 'আমার দিদিও রাজনীতিতে গিয়েছে। কিন্তু, সে হচ্ছে ভাবের রাজনীতি, বাস্তবের রাজনীতি নয়।'

একটা ধূলির ঘূর্ণি উড়ে গেল।

'সঙ্গে কিছুই আনেন নি তো ?' জিগগেস করলে নারায়ণ।

'কিছু না।'

'সেইটেই মুক্তি, রিক্ততার মুক্তি। চাষা-মজুরদের অভাব-অভিযোগ টাকা-পয়সা দিয়ে সরাসরি আমরা মিটিয়ে দিই সেটা কাজের কথা হবেনা। আমরা ওদেরকে সাহায্য করব তা ঠিক, কিন্তু সাহায্য করব, যাতে ওরা নিজেদেরকে সাহায্য করতে পারে। যাতে সবাইকে টেনে বা ঠেলে নিয়ে আসতে পারে একটা বড় ও মজবুত জীবনের মধ্যে। আপনার এতদিনের খয়রাত তাই বৃথা হয়েছে।'

'না, বৃথা হয়নি। ওরা আমাকে চিনতে পারবে, সন্দেহ করবে না অনাত্মীয় বলে।'

কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত রাগটাই না বড় হয়ে ওঠে। যেন বড় হয়ে ওঠে ওদের কল্যাণের অভিলাষ। প্রতিহিংসা নয়, প্রতি-বিধিৎসা।

কিন্তু জমিদার কী জঙ্গীবাজ!

তোমরাই বা কম কিসে? বলতে লাগল নারায়ণ। যতক্ষণ তোমরা একা ততক্ষণ তোমরা অসহায়, কিন্তু যখনই তোমরা একত্র, একীকৃত, তখনই তোমরা দুর্জয়। কথায় বলে, একা না বোকা, কিন্তু একত্র না একচ্ছত্র। অনায়াসে তখন তোমরা জালিমের জুলুম ঠেকিয়ে দিতে পারবে। তোমাদের কোনো দাবিই কানুন-বরখেলাপ নয়। হ্যাঁ, খাজনা দেবেনা এ বছর। জমিদার তার খাস জমিতে ভেরি বেঁধে জল আটকে রেখেছে, দোন দিয়ে সিঁচতে দেয়নি পাশের জমিতে, একটা মুড়ি পযন্ত কেটে রাখেনি। ফসল হবে কি করে? যাদের ধান-কড়ারি জমা তারা দেবেনা এবার ধান। যেখানে নিজের খোরাক নেই সেখানে পরের ঘরের খানাপিনা?

সাহেবীমুলুকে যুদ্ধ লেগেছে—তার তাপ-ভাপ পৌছুচ্ছে এসে এদেশে। এদেশেও আগুন লাগাবে। প্রজায়-জমিদারে, খাতকে-মহাজনে, মজুরে-পুঁজিদারে। তোমরা দুই পাড়া দুই জাত· হিন্দু মুসলমান নও, তোমরা একজেতে, তোমরা সগোত্র—একই শুষ্কীকৃত জনপিণ্ড। তাই বলছি, হও একজোট, হও একজিদ্দি। আস্তে-আস্তে এগোও। আজ শুধু এক বছরের খাজনা, আস্তে-আস্তে সমস্ত জন্মজীবনের রাজস্ব। আজ শুধু এক কেতা জমি, দু চার বন্দ; আস্তে-আস্তে সমগ্র মেদিনী।

খাজনা না দিলে ক্রোক-বিক্রি করে নেবে যে। শোনা যাচ্ছে ঐ কোটালের হাঁক-ডাক। বাস্তবের স্বরে কথা বলে চাষীরা।

তোমরা জাননা, কত দূর তোমরা এগিয়ে এসেছ। অর্জন করেছ কত অধিকার। পেয়েছ দান-বিক্রির স্বত্ব, লোপ করে দিয়েছ হস্তান্তরী মাশুল। খাইখালাসী আপনা থেকে ছুটে যাচ্ছে, জমি বাড়লেও জমাবৃদ্ধি রয়েছে মুলতুবি। তারপর বাকি খাজনার দায়ে অস্থাবর করা উঠে গেল। গ্রেপ্তারিটা আছে বটে কিন্তু কে নেবে সেই চালুনি করে ঘোল বিলোবাব ঝক্কি? টাকা ধরতে-পেলনা তো শরীর ধরে কি হবে? ধরবার মধ্যে ধরবে ঐ জমিখানা। ধরুক, কিনে নিক ইস্তাহার করে। কিন্তু, তারপর, নিক না-হয় বাঁশগাড়ি দখল, কিন্তু, খবরদার, কেউই বন্দোবস্ত নেবেনা। না, কেউই না। এ-পাড়া ও-পাড়া, এ-গাঁ ও-গাঁ, খুদকস্তা-পাইকস্তা—কেউই আসবে না এই জমিতে। মুনিষ-কিরষান, ভাগীদার-বর্গাইত পর্যন্ত না হও একজোট, হও একজিদ্দি। জমি অটুট হয়ে পড়ে থাকবে তোমার নিজের হেপাজতে। তোমার উচ্ছেদ নেই, তোমাব বিলোপ-বিনাশ নেই। কেউ তোমাকে হটাতে পারবে না, খসাতে পারবে না। নতুন ফসলে স্বাক্ষরিত হবে তোমার নতুন দিনের অধিকার।

আস্তে-আস্তে এই নিলামী-দখলও উঠে যাবে একদিন। নতুন আইন পাশ হবে। যাদের মাটি তাদের জমি। যাদের চাষ তাদেরই তাজ-তক্ত।

মাঠের বাইরে ছোট একখানা মাটির কোঠাবাড়ি, পাশেই রান্নাব দোচালা। পাশ-গাঁয়ের তালুকদারের থেকে ভাড়া নিয়েছে নারায়ণ। আছে আরো দুটি যুবক কর্মী, সবাই চরকিবাজির মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাতারাতি কিছু একটা করে ফেলার জন্যে ব্যস্ত। ছুটোছুটি, সোরগোল, কথার স্ফুলিঙ্গ। শুভ্র রৌদ্রে বাজছে যেন সতেজ জীবনের বাজনা।

একটি মুচি-বায়েনের মেয়ে আছে রান্নার তদারকে। হাড়ি-হাজরার ছেলে জল এনে দিচ্ছে দূরের টিপ-কল থেকে। বেদামে ওষুধ নিতে এসেছে গেঁয়ো অভাবী অভাজনরা।

হ্যাঁ, দিদি উপরতলায় থাকে। দিদি আমাদের গঙ্গাজল। আর বাবু? বাবু থাকেন নিচে, সঙ্গীদের সঙ্গে। কিছুই তাঁর ঠাঁই-ঠিকানা নেই, কখনো শহরে, কখনো গাঁয়ে, কখনো বা পুলিশের হাজতে। বাবু আমাদের ভোলানাথ। রুদ্রদেব।

ঐ যে আসছেন ওঁরা।

দূর থেকে দেখতে পেল তামসী। রোদের আকাশে দুটি শুভ্র বিহঙ্গ। বিপ্লবের অগ্রনায়ক। নবজীবনের বার্তাবহ।

উষসীর মাথায় কাপড় নেই, সিঁথিটা শাদা, আঁচলটা হাওয়ায় বিস্ফারিত। যেন ধূমলেশহীন একটি অচঞ্চল বহ্নিরেখা।

'এ কি, আপনি? আপনি এখানে?'

'তুমি? দিদি?'

উষসীকে আনন্দতপ্ত বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল তামসী। কানের কাছে মুখ এনে বললে, 'তোকে আশীর্বাদ করতে এসেছি।' পরে নারায়ণের মুখের দিকে উজ্জ্বল চক্ষু তুলে: 'এসেছি আপনাদের কাজে হাত মেলাতে।'

'আমি জানি আপনি আসবেন।' নারায়ণ উৎসাহে জ্বলে-জ্বলে উঠল: 'জানি, আমাদের যাত্রায় সঙ্গচ্ছেদ হবেনা। গরুর গাড়িতে একত্র এসেছি, পায়ে-হাঁটা বন্ধুর পথেও আপনাকে পাশে পাব। আমাদের কাজের মধ্যে আপনাকে পেলে আমাদের কাজ আগুনের মত ছড়িয়ে পড়বে। আপনি জানেন না আপনি সেই দীপবতী নারী যার ক্ষীণ শিখার বিন্দুতে রয়েছে দীপান্বিতার প্রতিশ্রুতি।'

তামসীর মনের মধ্যে একটা অজানা ভয় শির-শির করে উঠল। সেই শ্বেত বিহঙ্গ কি রৌদ্রদীপ্ত আকাশ ছেড়ে ছায়ামণ্ডিত নীড়ের মুখে ধাবমান হল নাকি? তামসী হেসে উঠল। হেসে উঠল স্নুহাসস্নিগ্ধ উষসীর মুখের দিকে চেয়ে। প্রশ্রয়শীল সারল্যে।

'শুনেছি আপনার নাকি ভাবের রাজনীতি। ভাব ছাড়া কাজকে কে মহান করবে? কাজ তো তৃণগুল্ম, ভাব হচ্ছে বিশাল বনস্পতি। আমাদের কাজের চষা মাঠে আপনি এসে ভাবের বীজ পুঁতুন। খড়কুটো জড় করে আগুন যদি বা জ্বালি, তাতে আপনি সঞ্চার করে দিন আত্মাহুতির প্রতিজ্ঞা। সেই ভাবের আন্তরিকতার উত্তাপ না থাকলে জ্বলবে কেন সেই অগ্নিকুণ্ড?'

সূক্ষ্ম উপেক্ষার সৌজন্যে তামসী আবার হাসল। বললে, 'কাছের মানুষটিকেই ভুলে যাচ্ছেন বুঝি? আমি তো ভাব, বাষ্প—আর এ হচ্ছে দৃষ্টান্ত, বাস্তব। ভাবের চেয়ে উদাহরণ অনেক বেশি মূল্যবান। ভাবুন তো কত বড় অঘটন ঘটাল এ। কত বড় কাজ!' উষসীর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল সস্নেহে।

'নিশ্চয়, নিশ্চয়। তা কি আর আমি জানিনা?' নারায়ণ লজ্জিত স্তব্ধতায় ধীরে-ধীরে চলে গেল অন্তরালে।

কিন্তু দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর গাছের ছায়ার নিভৃতিতে আবার এসে সে একান্তে তামসীর কাছে বসেছে। অদূরে ঘাসের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে আছে উষসী, শান্তের মত, নিরাকাঙ্ক্ষের মত। জীবনে তার আর কোন স্পৃহা নেই, উত্তেজনা নেই, তার শুধু এখন কাজের জলস্রোত, কাজের নির্মলতা।

'এর মধ্যে বড় শহরে গিয়েছিলুম—' বললে নারায়ণ।

'কী খবর?'

'প্রথম দিনেই গিলটি প্লিড করে বসেছে। একেবারে বাজে-ক্লাশ। এক ডাকেই ছ মাসের আর-আই।'

তামসী স্তব্ধ হয়ে রইল। শূন্য হয়ে রইল।

কিন্তু সব চেয়ে অবাক করল তাকে সংবাদটা নয়, সংবাদদাতার কণ্ঠস্বরটা। যেন একটা প্রচণ্ড উল্লাস। যেন তীক্ষ্ণ অবজ্ঞা। বা, একটু কৌলীন্যের অহংকার। যারা আসামী, যারা রাজদ্বারে অভিযুক্ত, সবাই তারা তার উপকারের যোগ্য নয়। তাদের মধ্যে সে জাত-অজাত মানে, মানে বা মান-অমানের মানদণ্ড।

'তাই বলে আমাদের থেমে থাকলে চলবে না। যে পিছিয়ে পড়ল তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে ফেরানো যাবেনা পদক্ষেপ।'

'তার মানে ?' তামসী তাকাল ক্লান্তের মত।

'তার মানে কে কখন জেল থেকে বেরোবে তার প্রতীক্ষায় মুলতুবি রাখা যাবেনা আমাদের জেলে যাওয়া।'

দু জনে হেসে উঠল। তামসীর হাসি ফুরিয়ে গেলেও নারায়ণের চোখের কালোতে লেখা রইল সেই হাসির উদ্বৃত্তি।

সে পালাবে, চিহ্নহীন হয়ে পালাবে। মুহূর্তে মন স্থির করে ফেলল তামসী। এখানে থেকে সে উষসীকে আবৃত করবেনা, ছায়াচ্ছন্ন করবেনা। তার জীবনে ব্যর্থ করে দেবেনা বিপ্লবের সম্ভাবনা।

সেই ছেলেবেলাকার মত দিদির গা ঘেঁসে নির্ভাবনায় শুয়ে আছে উষসী। রাত্রের অন্ধকারের শান্তিতে ঘুমের নির্মলতায় যেন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। এত ঘুম, এত শান্তি, এত সমর্পণ উষসী পেল কোথায় ?

'তুমি আমার জন্যে এতটুকু ভয় কোরো না।' মাঝরাতে ঘুম ভেঙে বলে উঠল উষসী : 'আমি আমার জীবনে পরম আশ্রয় পেয়ে গেছি।'

কে সে ? উন্নিদ্র চক্ষু মেলে চমকিত অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল তামসী।

'কেউ না। শুধু আমার এই কাজ। আমার এই কাজের সারল্য। এই কাজের পবিত্রতা।'

'সুখ পাচ্ছিস ?'

'সুখের আর ওর নেই। যে ভীরু তাকে সাহসের ভাষা দিচ্ছি, যে দুর্বল তাকে দিচ্ছি সমর্থ সঙ্গের স্পর্শ, যে অন্ধ তাকে দেখাচ্ছি নবপ্রভাতের স্বপ্ন—তার মত সুখের আর আছে কী, দিদি ?'

'ঘা সইতে পারবি ?'

'যে আঘাত আমাকে মূল্য দেবে, সম্মান দেবে, তা সইতে পারব না ?'

কাটল খানিকক্ষণ চুপচাপ।

'দিদি। দিদি, ঘুমুচ্ছ ?'

'না। কেন ?'

'তোমার নিজের কথা তো কিছু বললে না—'

'বলব, ভোর হোক।'

কিন্তু ভোর হতে না হতেই বাড়ি ঘিরেছে পুলিশে। খানাতল্লাস করবে। আছে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা।

আটাশ

তামসী ধড়মড় করে উঠে বসল। যেন স্বপ্নের ঘোরে বুকের আঁচলটা বিস্রস্ত করলে। কী লুকোবে, কাকে লুকোবে, কিছু বুঝে উঠতে পারল না।

না, কিছুই তার লুকোবার নেই। ভয় করবার নেই। শুয়ে আছে সে মাটিতে সপ পেতে, থাক-দেয়া ইঁটের উপর বসানো তক্তপোষের উপরে নয়। কোনো বেআক্কেল চোর আশ্রয় নেয়নি এসে অন্ধকারে।

তাকাল একবার উষসীর দিকে। অভঙ্গ ঘুমে আবৃত হয়ে আছে। যে আঘাত তাকে মূল্য দেবে, সম্মান দেবে তা সহ্য করবার জন্যে সে সমর্পিত।

গায়ে ঠেলা দিয়ে জাগাল তামসী। বললে, 'পুলিশ এসেছে।'

'এসেছে ?' যেন এতদিন এরই জন্যে প্রতীক্ষা করে ছিল তেমনি প্রচ্ছন্ন তৃপ্তির স্বরে উষসী বললে, 'এবার আমি জেলে যাব। অনেক বড় হয়ে যাবে আমার পৃথিবীর পরিধি।'

আনাচ-কানাচ আগাপাস্তলা সার্চ হচ্ছে বাড়ি-ঘর। সদর-মফস্বল। শুধু পুঁথি-পত্র বা বোমা-বারুদ নয়, কিছু বা মালেরও সন্ধান করতে হচ্ছে। জমিদারের বাড়িতে চুরি হয়ে গিয়েছে সম্প্রতি।

এই বাক্সটা কার ?

কারুর নয়, সকলের। আলাদা করে কোনো মার্কা-মারা নেই

আমাদের। যখন যার দরকার তখন সে ব্যবহার করে। কাপড়-চোপড় বালিশ-বিছানা। সমস্ত কিছু।

স্ত্রীলোক? স্ত্রীলোক নেই বাড়িতে?

ভদ্রভাবে কথা বলতে শিখুন।

কথা বলতেই শিখতে হবে, কাজ করতে নয়।

হ্যাঁ, উপরেই যাবে এবার। না, স্ত্রীলোকদের সরে যেতে বলার কোনো মানে হয় না। এরা একেবারে পর্দা-ঘেরা কুলবালা নয়, এরা পগার ডিঙিয়ে ঘাস খেতে শিখেছে।

এই স্যুটকেসটা কার?

'আমার।' তামসী বললে গম্ভীর ভাবে, যেন কত বিত্তবিভব রয়েছে ঐ বাক্সের মধ্যে।

দিন, চাবি দিন। চাবি লাগেনা, অমনি খোলা যায় আঙুলের টিপনিতে। তা হলে, বাক্সরও কোনো আঁটুনি-বাঁধুনি নেই, সমান ঢিলঢিলে! সমান আলগা-আদুড়।

তামসীর কান দুটো ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল। কিন্তু এখুনি কী হয়েছে!

স্যুটকেসের কোন তলা থেকে বেরুল একটা রুমালে-বাঁধা পুঁটলি। সেই পুঁটলিতে নানা ছাঁদের নানা ঝলকের গয়না। গলার, বাহুর, মণিবন্ধের। টুকরো-টুকরো আগুনের হলকা। টুকরো-টুকরো বিদ্যুতের চমকানি।

অসম্ভব একটা ভোজবাজি হয়ে গেল তামসী ভাবতে পারে কিন্তু উষসী পারল না। সে স্পষ্ট স্বচক্ষে দেখল দিদির বাক্সর ভিতর থেকেই বেরুল এই গয়নার পুঁটলিটা। পুলিশ সঙ্গে করে নিয়ে এসে হাত-সাফাই করে বাক্সর মধ্যে চালান করে দিয়েছে এই গাঁজাখুরি আষাঢ়ে গল্পের জায়গা নেই। তা ছাড়া, পুলিশ পাবে কোথায় এ জিনিস? এ যে তার

নিজের গায়ের গয়না! অন্তত অনেকগুলি তো বটেই। শুধু ঐ পুষ্পহারটা বোধহয় নতুন।

উষসীর নিজের গলার প্রশ্ন পুলিশের গলায় ফুটে উঠল : 'এ সব আপনি কোথায় পেলেন?'

মুখ-চোখ পাংশু বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে তামসীর। গলা কাঠ হয়ে এসেছে, হাঁটু দুটো ভেঙে পড়বে বুঝি। চোখে ধাঁধাঁ দেখছে। নিশ্বাস টানতে পারছে না।

'বলুন।' মনে হল যে পুলিশ নয়, উষসীই ঝাঁকরে উঠেছে। গলার স্বরে ব্যঙ্গের ঝাঁজ মেশানো।

তবু উষসীরই চোখে চোখ রেখে আশ্রয় খুঁজল তামসী। তাকাল প্রায় ভিক্ষুকের মত। মনে হল নিচে নারায়ণের মত সেও এগিয়ে এসে বলবে, এ আমাদের দুজনের বাক্স, আলাদা দখলের কোনো সীমানা করা নেই। এ আমার নিজের গায়ের গয়না, বাড়ি ছেড়ে চলে আসবার সময় সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। আর কোনো জিনিসপত্তর আনিনি বটে কিন্তু গায়ের গয়না কে ছেড়ে আসে? আর গায়ের গয়না তো গায়ে এঁটে বেড়ানো যায় না, তাই দিদি এলে দিদির বাক্সর মধ্যে সরিয়ে রেখেছি।

কত সহজ, কত আপাতসুদর্শন।

কিন্তু উষসীর চোখে এতটুকু প্রশ্রয় নেই, এতটুকু সজলতা। যেন একটা ঘোরালো কালো সন্দেহ মৃত-নিশ্চল পাথর হয়ে রয়েছে। কালো পাথরের টুকরোর মতই কঠিন সেই দৃষ্টি। তাতে এতটুকু মমতা নেই, মার্জনা নেই, বিশ্বাসের অবকাশ নেই। চোখের শুভ্রতাটা যেন বিশুষ্ক আকাশের দয়াহীন রুক্ষতা।

তামসীর ইচ্ছে হল, নিজে যা বুঝছে, সোজাসুজি বলে দেয় সেই

কথাটা। বলে দেয়, এ আর-কিছু নয়, প্রাণধন আর তার সরকারের কারসাজি। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, গলার স্বরে ফোটাতে পারবেনা এমন সারল্য যা শুনে পুলিশে বিশ্বাস করবে, বিশ্বাস করবে উষসী। প্রাণধন আর তার সরকার কেনই বা এই চতুরতা করবে তার কোনোই স্পর্শনীয় ব্যাখ্যা পাওয়া যাবেনা। আরো অগ্রসর হয়ে শেষ পর্যন্ত বলবে কি, বিকলাঙ্গ কামনার প্রতিঘাতের প্রতিশোধ? কিন্তু, জিগগেস করি, কোথা থেকে এল এই প্রতিহননের তীব্রতা? কোন কুহক-কৌশলের পরিণামে?

সব কথা জলের মত পরিচ্ছন্ন করে বুঝিয়ে দিতে পারবে তামসী? না, কেউ বুঝবে? না, এই আবিষ্কারের প্রসঙ্গে এটা কারু বোঝবার?

কুণ্ঠিত অভিমানী চোখে আবার, আরেকবার তাকাল তামসী। দেখল উষসীর চোখ অন্য দিকে ফেরানো।

'কি, চুপ মেরে গেলেন যে! বলুন, একটা কিছু কৈফিয়ৎ দিন। কি করে এল এ আপনার বাক্সে?'

'জানিনা।' তামসীও চোখ ফেরাল।

'কিন্তু আমরা জানি। আপনি এসব চুরি করে এনেছেন।'

'চুরি করে!' তামসী মাটির উপর বসে পড়ল না। নীরক্ত ঠোঁটে বিকৃত রেখায় একটু হাসল।

'হ্যাঁ, অন্তত গৃহস্বামীর বা প্রাণধনবাবুর সেই অভিযোগ। কেন, ওঁর বাড়িতে অতিথি হয়ে ছিলেন না কত দিন?'

'ছিলাম।'

'সংসারে কর্ত্রীত্ব করেননি সে কদিন?'

'হয়তো করেছিলাম।'

'তাঁর তখন স্ত্রীহীন সংসার—'

'হ্যাঁ।' তামসী তাকাল উষসীর দিকে। দেখল সে আর দাঁড়িয়ে নেই, বসে পড়েছে মাটির উপর। বিবর্ণ মুখ, ভূতাবিষ্ট চাউনি।

'বাড়িতে তাঁর স্ত্রী না থাকার সুযোগে সহজেই কর্ত্রীত্ব আদায় করতে পেরেছিলেন—ঠিক কিনা? আর সেই সুযোগে গোছা করে চাবি বেঁধেছিলেন আঁচলে?'

'হ্যাঁ, চাবি নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিলাম বটে।' তামসী শুষ্করেখায় আবার হাসল।

'চাবি নিয়ে নাড়াচাড়া করবেন কেন, একেবারে বাক্স নিয়ে করেছিলেন। শেষে আর লোভ সামলাতে পারেননি। ভেবেছিলেন বোন তো ভেগে গেছে, এবার তার জিনিস যা পাই কিছু হাতিয়ে নি। অন্তত তার গা-ছাড়া গয়নাগুলো হাতছাড়া করি কেন? কি, তাই না?'

তামসী স্তব্ধ হয়ে রইল। দেখল উষসী দু-হাটুর মধ্যে মুখ গুঁজে রয়েছে। অস্ফুট একটা কাতবেক্তিও তার মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে হয়ত।

উষসীর কাছ থেকে আর কোনো আশা নেই। দেখা যাক প্রাণধনের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যায় কি না।

'শুধু চুরিই ভাবছেন কেন?' তামসী স্বচ্ছকণ্ঠে বললে, 'প্রাণধনবাবু তো নিজের থেকে উপহারও দিতে পারেন। পারেন না? এত দিন তাঁর সংসারি করে দিলাম, সেই জন্যে কিছু মাইনেও তো আমার পাওনা হবে!'

তাই। তাই ঐ পুষ্পহার। উষসী যেন আরো ডুবে গেল।

'কিন্তু প্রাণধনবাবুর নালিশটা অন্যরকম। যাই হোক, যা বলবার আদালতে বলবেন, এখন চলুন।'

উষসী হঠাৎ মুখ তুলে ঝামরানো মুখে ঝাঁকরে উঠল: 'আমাদের ধরতে আসেননি?'

'নিশ্চয়।' পুলিসের কর্তা নিরাসক্ত ভাবে হাসল: 'আপনাদেরটা খটখটে কেস, কোনো গোলমাল নেই। আর এ একেবারে কাদাকিচেল। আপনারা ডিভিশন ওয়ান আর এ একেবারে থার্ড ক্লাশ—' পুলিশের লোক ঢোঁক গিলল: 'একটা রাজনীতি, আরেকটা, কি বলে ওটাবে—দুর্নীতি।'

উষসী কে তা আর নিশ্চয়ই জানতে বাকি নেই পুলিশের। তবু তার কাণ্ডে সে এতটুকু দুর্নীতি দেখলে না। উপায় কি, যেমনি ভাবে নালিশ হয়েছে তেমনি ভাবেই তো দেখবে। তবু পুলিশের দেখার চেয়ে উষসীর দেখাটাই বেশি করে দগ্ধ করছে তামসীকে। যেমনি ভাবে শুনল তেমনি ভাবেই সে দেখল।

'নইলে একটা কথাও সে জিগগেস করল না কেন? ববং থানায যাবে শুনে বিশেষ ভাবে সাজগোজ করতে বসল। ভাবখানা এমন, আমিই বেশি সুন্দর, বেশি সম্মানার্হ, আমি বিপ্লবিনী। আর, তুমি হেয়, অপকৃষ্ট, তুমি থাক অমনি শ্রীহীন হয়ে। আমি ডিভিশন ওযান, আর তুমি খোসাভুষি।

দু দলে ভাগ হয়ে গেল তাবা, সমযে ছেদ দিয়ে। প্রথম দলে উষসী-নারায়ণরা। শেষ দলে তামসী একা। প্রতীক্ষমান ভিড় ওদের সঙ্গে-সঙ্গেই গেছে। তামসীর সঙ্গে-সঙ্গে শুধু পথ।

প্রথমবার সে যখন থানায় যায় পায়ে হেঁটে, তখন তার পরনের শাড়িটা এর চেয়ে অনেক খেলো আর নোংরা ছিল। কাকিমার কাছে গিয়েছিল একখানা শাড়ি চাইতে, কাকিমা মুখ ঝামটা দিয়েছিলেন। তবু সেদিনকার সেই গ্রাম্য অসংস্কৃত বেশবাসে নিজেকে তার কত সুন্দর

মনে হয়েছিল, কত যৌবনধন্য। সেদিনও পথচারীদের চোখে ঠিক প্রশংসার দৃষ্টি ছিল না, তবু, যে যাই বলুক, নিজের বুকের মধ্যে তপ্ত হয়ে ছিল বড় কাজের তৃপ্তি, রক্তের মধ্যে আত্মদানের মদিরা। কিন্তু আজ এ কী হল ? বুক শূন্য, রক্ত শীতল, সমস্ত পথস্পর্শ কলুষকুৎসিত।

আজকের উষসীর মতই তার অহংকার ছিল! অভিজাত রাজনীতির অহংকার। নীতির চেয়ে রাজসিকতাটাই যেখানে প্রধান। আজ তার সমস্ত অহংকার ভেঙে-চুরে ধুয়ে-মুছে শেষ হয়ে যাক। রণধীরের জন্যে আবার তার ব্যাকুলতা ফিরে আসুক।

জেল-হাজতে গেল তামসী। তার কে আছে যে মোক্তার ধরবে তার জন্যে ? জামিন দিয়ে ছাড়িয়ে আনবে ? কানে-কানে পরামর্শ দেবে পালিয়ে যাবার ? গায়ে-পায়ে শৃংখল খোলবার দুঃসাহসিক পরামর্শ ?

শুধু আছে একজন মেয়ে-গার্ড। প্রায় বুড়ো হয়েছে কিন্তু সধবাত্ব যায়নি, কপালে গোলাকার সিঁদুর, পরনে চওড়াপাড় শাড়ি। স্বামী কোথায় প্রশ্ন করলে বলে নিরুদ্দেশ হয়েছে। ভয় নেই, এই জেলেই দেখতে পাব একদিন। ঠিক কয়েদী হয়ে আসবে আমার লেগে।

সেই মাঝে-মাঝে দুঃখু করে। বলে, 'এমন ভরাভতি বয়েস, ছিমছাম চেহারা, গয়না তুমি চুরি করতে গেলে কেন ? কত লোক অমনি যেচে-সেদে দিয়ে যেত ভারে-ভারে। ঘিয়ে খেতে, দুধে আঁচাতে। তা না, এ কি অনাছিষ্টি !'

দেয়ালে পিঠে দিয়ে মেঝের উপর নিঝুম হয়ে বসে থাকে তামসী।

পাহারাউলী ঘন হয়ে সরে আসে। গলা নামিয়ে বলে, 'হাতের চেয়ে আম বড় করলে চলবে কেন, ঠিকমত চাল-চালাকিটি থাকা চাই। ভেক না হলে ভিক্ষা মেলে কি ? তাই আমার কথা শোনো। এবার

যখন ছাড়া পাবে, ঠিকমত ফাঁদ পেতে ঠিকমত ফন্দি ধরবে। এই তো সময়। হাটবাজারের বেলা বেড়ে গেলে কাজ বাজাবে কখন? কথায় বলে, যদ্দিন ছরৎ তদ্দিন। আমার কথাটি কানে তুলো বোনঝি, দেখবে ভুঁই থেকে টুঁই পর্যন্ত গয়নায় মোড়া হয়ে আছ। সৎপরামর্শ শুনে আমরাও কোন না দু একখানা গায়ে তুলেছি! এই যে যুগলবালাকে দেখছ—ডাকাতের ঘরের ডাকাতনী—এখন মোটা টাকা খরচ করছে, বলি, টাকা পেলে কোথায়? আমার বাপু ওল-কুটকুটে মুখ, কারু কুলকুষ্টি আমার অজানা নেই—'

থামতে বললে থামে না। মশার কাঁসর বাজছে, ঘুম নেই চোখের কোণে। বসে-বসে শুধু পচা পচাল শুনতে হয়।

প্রথমবার সে যখন কাঠগড়ায় গিয়ে উঠেছে, হাবেভাবে উল্লেখ করেছে শুধু তেজস্বিতার ইঙ্গিত। চুল বেঁধেছে, শাড়ির পাড়টা চওড়া করে পাট করে রেখেছে বুকের উপর, বসতে টুল দিলেও সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে, ভঙ্গিতে এনেছে দৃপ্তির ব্যঞ্জনা। কখনো ব্যঙ্গময় হাসি হেসেছে সাক্ষীদের বাচালতায়, উকিল-মোক্তারের লম্ফঝম্পে। কিন্তু আজ? আজ সে বসেছে একেবারে খাঁচার তক্তার উপরে, আঁচলে মুখ ঢেকে। রুক্ষ চুল, অপরিচ্ছন্ন শাড়ি, দলিত-চূর্ণিত চেহারা।

সেদিন যে তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, লুকিয়ে-চুরিয়ে এক-আধবার ছুঁতে যে হাত বাড়াত মাঝে-মাঝে, সে আজ কোথায়? তারা জেল-হাজতে আলাদা-আলাদা থাকত, কিন্তু মিলত এসে এক কাঠগড়ায়। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে প্রত্যহের সেই প্রথম অভিনন্দনের হাসিটি ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার সময়কার বিষণ্ণতাটুকু প্রকৃতির মানচিত্রে আর লেখা নেই। মনে হত এ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হোক সমস্ত জীবনে। কিন্তু আজ? মুখ থেকে আঁচল সরিয়ে আদালতে জনতার দিকে তাকাল

একবাব তামসী। প্রাণধন আর নগেন সরকার সাক্ষী দিতে এসেছে। উঃ, এ যন্ত্রণা শেষ হবে কতক্ষণে?

আনডিফেণ্ডেড যাচ্ছে। একজন ছোকরা মোক্তার এগিয়ে এল কাঠরার গরাদের দিকে। বললে, 'আপনার নিজের কোনো লোক নেই?'

'না।'

'সাফাই নেই কোনো?'

'না।' তামসী মুখের থেকে আঁচল সরাল। বললে, 'আমি গিলটি প্লিড করব।'

কাঠগড়ায় তার পাশের জায়গাটা আজ শূন্য, কিন্তু যেখানে সে যা:: সেখানে তাব শূন্যতা কি সাম্যসঙ্গের অনুভূতিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবেনা? মনের থেকে ঘুচে যাবেনা কি সমস্ত বন্ধন-ব্যবধানের বেদনা? সেই পরিচ্ছন্ন অভিনন্দনের হাসিটি কি আবার ফুটে উঠবেনা তার চক্ষুতে-অধরে?

উনত্রিশ

ঠাণ্ডা হয়ে থাকার দরুন মাসখানেক রেয়াত পেয়েছে তামসী। মাস এগারো পর বেরুল সে জেল থেকে।

সে দাগী, তার গায়ে পূর্ব-অপরাধের ছেঁকা লাগানো। তাই তার শাস্তিটা একটু বেশি হয়েছে। আগে সে ছিল ডাকাতের দেশের মেয়ে, এখন হয়েছে চোরের ঘরের কুড়ুনী।

এখন যদি দেখতে একবার তামসীকে। শুকিয়ে আদ্ধেকের আদ্ধেক হয়ে গিয়েছে। কাঠ বেরিয়ে পড়েছে—চোয়ালের, কণ্ঠার, কোমরের, আঙুলের প্রত্যেকটি গিঁটের। আঙরে গিয়েছে চেহারা, যেন বেরিয়ে এসেছে কোন নির্দয় বিভীষিকা থেকে। জীবনকে দেখে এসেছে আরেক চোখে। সেখানে শুধু পাপ আর বীভৎসতা। আশার এতটুকু অবকাশ নেই, নেই এতটুকু বিশ্বাসের নীলাকাশ। যেন, এ পথে যখন একবার এসেছে, এ পথেই চিরকাল চলবে, আরো ক্লান্তিকর পঙ্কিলতায়। জীবন আর তাদেরকে আশ্রয় দেবে না, দীপ দেখাবেনা, শোনাবেনা আশ্চর্য কোন দৈববাণী। ছাড়া পেলেও আবার ফিরে আসবে এখানে। শোণিতপায়ী সাপ বুকের মধ্যিখানে বিঁধিয়ে রেখে অন্ধকারের এক কোণে শুকিয়ে-শুকিয়ে মরবে।

ভালোই হয়েছে। সমস্ত অন্তর ঢেলে স্বীকার করেছে তামসী। ভালোই হয়েছে। মনের কোণে কোথায় যেন একটু অহংকার ছিল,

অভিমান ছিল, সে বড় সে উঁচু, সে পবিত্র—সে সামান্য গয়না-চোর নয়, সে দেশের জন্য জেলে গেছে, আদর্শকে সে নত হতে দেয়নি—নিঃশেষে চূর্ণ হয়ে গিয়েছে সে-অহঙ্কার, মুছে গিয়েছে সে কৌলীন্যের রাজটীকা। ভালোই হয়েছে। আগে তার আকুলতার মাঝে মহানুভবতার ভাব ছিল, স্নেহের মাঝে নির্মল অনুকম্পা। তাকে সে কৃতার্থ করবে এমনি অনুগ্রহের প্রস্রবণ। সেবকবাৎসল্য। বন্ধ হয়ে গিয়েছে সে-উৎসমুখ, সেই করুণার অভিষেক। ভালোই হয়েছে। আগের বার সে জেলে দেখে গিয়েছিল আশা, জীবনের প্রতি প্রমত্ত আকর্ষণ; এবার দেখে যাচ্ছে সে পাপ, হতাশা, জীবনের উপর প্রবল অনাসক্তি। ভালোই হয়েছে। তার আর কোন মোহ নেই, কুসংস্কার নেই। আকাঙ্ক্ষা নেই, উপেক্ষা নেই। রুচি নেই বিতৃষ্ণা নেই। তার পৃথিবী অনেক বড় হয়ে গিয়েছে, রাজপথ থেকে অন্ধ গলিতে, অন্তঃপুর থেকে পরিত্যক্ত ফুটপাতে—বেড়ে গিয়েছে তার স্বাধীনতা, কূলহীন আবিল জলস্রোতে, অন্তহীন আশ্রয়হীনতার মধ্যে। লজ্জা নয়, ভয় নয়, নয় নয় অশ্রদ্ধা।

কেউ নেই আর আজ ফটকের বাইরে। শুধু বিকলাঙ্গ জীবন তিক্ত মুখে ব্যঙ্গের হাসি হাসছে। কলকাতা যাবার রাহা-খরচ দিয়ে দিয়েছে সঙ্গে—একটা খবরের কাগজ কিনল তামসী। লণ্ডনে প্রচণ্ড বোমা-বর্ষণ হচ্ছে। ইংরেজ এবার হারবে। স্বাধীন হবে ভারতবর্ষ। আর কোন খবর নেই, শুধু এ খবরে উত্তেজনা খুঁজল মনে-মনে। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল তাতে তার কী। তাতে তার কী কৃতিত্ব!

তার কৃতিত্ব শুধু সংগ্রামে। এই স্তূপাকার পঙ্গুতার বিরুদ্ধে। সংগ্রামেই তার শুদ্ধি, তার মুক্তি, তার সার্থকতা। তার আশ্রয়-আয়োজন।

'সংগ্রাম চাই, আপোষহীন সংগ্রাম। এ আমাদের আপোষের

মামলা নয়, রফানিষ্পত্তি করে এর মিটমাট হয় না। এ লড়াই করে ছিনিয়ে নেবার মামলা।' সামনের মাঠে কে বক্তৃতা দিচ্ছে: 'আপোষ করে যা পাওয়া যায় তা দুধ নয় ঘোল, সোনা নয় বাংতা। কাঁটা নেব না আমরা, মাছ নেব। দুষ্টু গরু নেবনা আমরা। দুষ্টু গরু থেকে আমাদের শূন্য গোয়ালও ভাল—'

মাঝে একবার জেল বদল হয়েছিল তামসীর। এটা আরেকটা শহর, একেবারে অজানা। কিন্তু এই শহরে, এই মাঠের মধ্যে, পৃথিবীতে এত লোক থাকতে, ভবদেবকে বক্তৃতা দিতে শুনবে সে কল্পনাও করতে পারত না। ইতিমধ্যে দেশের অনেক কিছুই বদলে গিয়েছে দেখছি। ঠিক দেখছি তো দূর থেকে?

মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেল তামসী। হ্যাঁ, ভবদেবই বটে। আগুনের মত বক্তৃতা দিচ্ছে।

'হাত থাকতে জগন্নাথ হয়ে থাকবনা। চক্র ধরব কৃষ্ণের মত—'

ভবদেব কি বেরিয়ে আসতে পারে সহজে? সঙ্গে প্রশংসমান জনতার হুল্লোড়। তবু একপাশে দাঁড়িয়ে তামসী তার মুহূর্তটির অপেক্ষা করতে লাগল।

'এ যে, তুমি? তুমি কোত্থেকে?' ভবদেব প্রায় আকাশ থেকে পড়ল।

'বিস্ময়টা আমারও কিছু কম নয়।'

'এ কী চেহারা হয়ে গিয়েছে তোমার। ব্যাপার কী?'

'বা, জেল থেকে বেরুলাম যে আজ।' তামসী দমলনা এতটুকু।

'জেল থেকে। ও, হ্যাঁ—' ভবদেবের চাউনিটা কেমন কুণ্ঠিত হয়ে গেল। ধীরে-ধীরে তাতে মিশল এসে বেদনার কুয়াশা, মমতার মাধুরী। সমর্পিত চোখে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

'তাই বুঝি আগ বাড়িয়ে যান নি আজ আর গাড়ি নিয়ে !' তামসী হাসল : 'একেবারে অচ্ছুৎ হয়ে গেছি, তাই না ?'

'জানিনা। কিন্তু এটুকু দেখতে পাচ্ছি ঠিক দিনটিতে তোমার সঙ্গে আমার ঠিক দেখা হয়ে যায়। তোমার মুক্তির দিনটি আমারো জীবনে একটি বড-দিন নিয়ে আসে।'

'একটা গাড়ি ডাকুন।'

ভবদেব একটা সাইকেল-রিক্সা ডাকল। বসল পাশাপাশি, পরিচ্ছন্ন ঘনিষ্টতায়। তামসী তার অস্পৃশ্য নয়, বিসর্জনের জিনিস নয়। বলতে কি, সেই তার জীবনে বিদ্রোহের প্রথম বিদ্যুৎরেখা এঁকে দিয়েছে। দিয়ে গিয়েছে মর্মরব্যাকুল অরণ্যের অস্থিরতা। ক্ষণকাল ঘরে এসে ঘরছাড়ার বংশীস্বর।

মাথার উপরে ঢাকনিটা তুলে দিল না কেউ। গায়ে মুখে-চোখে পরিচ্ছন্ন রোদ পড়ুক।

'বাজার বিচারে দণ্ড পেয়ে জেল থেকে বেরিযে আসার পর আর নিজেকে নির্দোষ বলা যায়না, না ?' তামসী বললে ক্লান্তের মত।

'জানিনা। কিন্তু সত্যের দরজায় আগড় নেই। যা সত্য তা একদিন ঠিক দেখা যায়।'

'মিথ্যে কথা। তাই আজকের দিনটাকে আমার মুক্তির দিন বলবেন না। আমার আর মুক্তি নেই।'

'আছে।'

'আছে ?' চলকে উঠল তামসী।

'হ্যাঁ আছে। মুক্তি হচ্ছে স্রোতে, সংগ্রামে। বিপন্নয় জীবনের দুর্দমতায়। শুধু এগিয়ে যাও, যুদ্ধ করে যাও, বিশ্বাসের নেহাইর উপর জীবন পুড়িয়ে এনে কাজের হাতুড়ির ঘা মারো। তাতেই তোমার মুক্তি,

তোমার দহনের পবিত্রতা।' বক্তৃতার জের মেটেনি বুঝি ভবদেবের : 'যে চোখ আজ তোমার লজ্জায় ঝাপসা হয়ে আছে, কাল আবার সেই চোখ গর্বের আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। আজকের দিনটা সত্য নয়. সত্য হচ্ছে সেই আগামী কাল।'

তামসী ম্লান মুখে বললে, 'সেই আগামী কাল আর আসেনা কখনো। যে একবার চোর সে চিরকালই চোর।'

না, আসে। এই ধরো সে নিজে। কী ছিল সে? সামান্য মাইনের কলেজের মাস্টার। যা পেত তা দিয়ে সংসার চলত না. ডাইনে আনতে বাঁয়ে ফুরিয়ে যেত। সমাজের চোখের সামনে লজ্জিত মুখ করে বসে থাকত গোবেচারা হয়ে। .কিন্তু আজ? আজ তার সাংসারিক অবস্থা আরো নেমে গেছে। কিন্তু তার আনন্দের তার শক্তিব তার গর্বের আর অবধি নেই। কেন. জিগগেস করছ? বঝতে পারছ না? সে চলে এসেছে বৃহৎ সংগ্রামের মধ্যে, প্রচণ্ড বিপদের সামনে। প্রকাণ্ড সার্থকতার আবিষ্কারে। সেইটেই তো মুক্তি।

আরো খোলসা করে বলতে হবে? এক কথায়, চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছি। ছাড়িয়ে দিয়েছেও বলতে পার। উগ্র রাজনৈতিক মতামত-ওয়ালা মাস্টার কলেজের পক্ষে নিরাপদ নয়। এই নিয়ে বিরোধ বাধল। মতামতগুলি ছাঁটতে-কাটতে পারলুম না। নিজেই কাটা পড়লুম। বেরিয়ে এলুম সেই কুম্ভীপাক থেকে। ভাবলুম, চাকরিটাকে বড় করতে পারবনা, কিন্তু ছবিটাকে বড় করি। চাকরিহীন জীবনে ছোট-ছোট দুঃখ তো এমনি পাবই, কিন্তু বড় কাজের সঙ্গে-সঙ্গে দুঃখটাকেও বড় করে দেখি।

'কিন্তু কাজটা কি?' তামসীর প্রশ্নটা কেমন রুক্ষ শোনাল।

'সম্প্রতি বক্তৃতা দিয়ে বেড়ানো। এই যুদ্ধটা যে আমাদের নয়

সেইটেই প্রচার-প্রমাণ করা। আমাদের যুদ্ধটা কী ও কার বিরুদ্ধে সেইটেই দিবালোকে প্রত্যক্ষ করে দেখানো। শুধু দেখানো নয়, ধনুকে জ্যা আরোপ করা, খড়্গকে নিয়ে যাওয়া হননের উদ্যতিতে!'

'সে তো খুব উঁচুদরের কথা হল, কিন্তু সংসার চলছে কি করে?'

'চলছে না। ছুটকো জার্নালিজম করি। অনটনের অন্ত নেই। কিন্তু তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানিনা সেই অভাবটা অনুভব করি না। আগে-আগে শুধু নিজের দারিদ্র্য দূর করতে চাইতাম, নিজের দুঃখটাই বেশি করে বাজত; এখন দেশের দারিদ্র্য দূর করতে চাই, তাই নিজের দুঃখটা আর দেখতেই পাইনা। আশ্চর্য, আমি কি করে যে এই মোড় ঘুরলুম, কি করে যে এই স্বাদ পেলুম জীবনের, বুঝতেই পারি না। তাইতো ভগবান মানতে সাধ হয় মনে-মনে। একদিন মনে আছে—'

'বলুন। ভাবছেন কী?'

'ভাবছি বলব কিনা।'

'বা, বলবেন বৈ কি।'

'একদিন মনে আছে তুমি আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে গাড়ি করে, আমি চুপচাপ রোয়াকে দাঁড়িয়ে রইলুম। মনে হল, শুধু মুহূর্তের জন্যে মনে হল, যেন একলাফে উঠে পড়তে পারি তোমার গাড়িতে, তোমারই মতো বেরিয়ে পড়তে পারি। তুমি আমাকে শান্তির বন্দর থেকে নিয়ে যেতে পার উত্তাল তরঙ্গমালায়।'

'কিন্তু, মনে রাখবেন,' তামসী হাসল: 'এ গাড়িতে কিন্তু এখন আপনি আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন। আর নিয়ে যাচ্ছেন শান্তির বন্দরে। কল্যাণী কেমন আছেন?'

চমৎকার আছে। দেখেই বুঝতে পারল তামসী। অবস্থা আরো নেমে গেছে নিঃসন্দেহ, কিন্তু অভিযোগ করছে না। তার স্বামীর প্রতি যে

অন্যায় করা হয়েছে তাতে প্রত্যক্ষ করছে সে সমস্ত দেশের প্রতি অন্যায়। স্বামীকে তাই সে যুদ্ধে যেতে দিয়েছে সেই অন্যায়ের নিবারকণে। আর এই যে সে বিশীর্ণ সংসার নিয়ে আছে এই তার সংগ্রাম। এই যে পিছন থেকে স্বামীকে পরোক্ষ প্ররোচনা জোগাচ্ছে এই তার অনুযাত্রা।

আগে-আগে নিখেকো ঠিকে ঝি ছিল একটা, এবার তাও তুলে দিয়েছে। এক হাতেই সৃষ্টির কাজ করছে, কিন্তু কেন-যেন সেই আগের অনাহ্লাদ নেই। নেই সেই বিরাগ-বিরক্তি। এ আর সামান্য সংসারের কাজ নয়, এ প্রায় যুদ্ধের আয়োজন। তার মোটা মজবুত আঙুলে কর্মের যে কর্কশ সাক্ষ্য ছিল, ভঙ্গিতে ছিল যে অধিকারের দৃঢ়তা, আজকে তাতে সে অর্থ-সঞ্চার করেছে। স্বাস্থ্যটা একটু ফিরেছে মনে হচ্ছে, আর ছেলেপিলে হয়নি। সজ্ঞান শ্রমে ও সংযমে, সহনে ও অধ্যবসায়ে জীবনে সে মূল্য নিয়ে এসেছে, আপাত-তুচ্ছতার আবরণ সরিয়ে। সমস্ত কাজ উপাসনা, সমস্ত কষ্ট উৎসর্গ। এ একটা কী অদ্ভুত আবিষ্কার করল তামসী।

আর, কল্যাণীই বা এ কাকে দেখছে। টিমটিমে, ম্যাটে, গাল-গলা-ভাঙা কুৎসিত একটা বুড়োটে মেয়ে, খালি পা, মাথার চুলগুলো ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা, পরনের শাড়িটা ধূলোওড়ানো। পাপের ছোপ লেগেছে মুখে, সারা গায়ে যেন কলঙ্কের ছিপটি। কে এই অনামুখী, বাসি উনুনের ছাই!

'চিনতে পাচ্ছ না?' জিগগেস করলে ভবদেব।

চিনতে পারছে বৈ কি। চিনতে দেরি হচ্ছে।

'তামসী। সেই যে—' কী ভাবে পরিচয় দেবে ভবদেব যেন হোঁচট খেল। বার্নিশ দিলে কথাটায়: 'এইখানেই ছিল কোথায় ঘাপটি মেরে, আজ বেরিয়ে এসেছে।'

'তা এখানে কেন ?' মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল কল্যাণীর।

তা এমন আর সে কী অন্যায় বলেছে! পরিচ্ছন্ন গৃহস্থের অন্তঃপুরে এ সব আবর্জনা কেন? আদর্শ থেকে অনেকে স্খলিত হয়ে পড়ে তা ঠিক, কিন্তু এ কী ভ্রষ্টতা! পাপের অনেক রকম চেহারা আছে কিন্তু এ কী কজ্জলবর্ণ নির্লজ্জতা। আপন ভগ্নীপতি, বোন যেখানে জীবিত, আর সেই বোনেরই গয়না নিযে সরে পড়া! এমন কাহিনী ডাস্টবিনে-নর্দমায়ও খুঁজে পাওয়া কঠিন। কাহিনী কে বলে। একেবারে আইনে-প্রমাণে জলজীয়ন্ত।

ভবদেব চাইল বটে কুযাশাটাকে সৌজন্যের হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে, কিন্তু সোহার্দের আর বোদ উঠল না সমস্ত দিন। তামসী গায়ে মাখল না এই অনাদর, প্রস্তুত হযে আছে সে অনেক অপভাষের জন্যে, আর, ভেবে দেখতে গেলে তার অভিমানের আছে কি। তা ছাড়া সে এ বাড়িতে ভবদেবের অতিথি, তার যত দিন খুশি থাকবে সে এখানে; যত দিন না সে একটা ধীর-স্থিব ভবিষ্যতের হদিস পায়। তার গায়ের ছাল-চামড়া লোহার আস্তর হযে উঠেছে, তাতে অপমানের ছুঁচ ফুটবে কি করে? দুরত্যয় নবকে দুর্জন সংসর্গে থেকে-থেকে সে কি সমস্ত দোষস্পর্শের অতীত হয়ে যায় নি? আঘাত-অতিক্রান্ত?

কল্যাণীর বড় মেয়েটি বড় হয়ে উঠেছে, তার সঙ্গে আলাপ জমাতে গেল তামসী। কাটা-ছাঁটা দুটো জবাব দিয়ে মেয়েটি কেটে পডল। ছোট ছেলে দুটো তার মুখের দিকে এমন ভাবে চেয়ে থাকে যেন সে খাঁচা-ছাড়া চিড়িয়াখানার জন্তু, ভয় পাবার জিনিস। হাত ধরে কাছে টানতে গেলে হাত ছাড়িয়ে নেয়। বলে, মা রাগ করবে।

পাশাপাশি দুটি ঘর, একতলা। ও-পাশের ঘরে কল্যাণী ভবদেবকে শাসাচ্ছে মৃদু অথচ স্পষ্ট গলায়।

'আমি ছেলেমেয়েদের বলব কি? আগের বার তবু গলা উঁচু করে বলতে পারতাম। যা হোক দেশের নামটা জুড়ে দিতে পারতাম এক ফাঁকে। কিন্তু এবারে বলব কি?'

'কিছুই বলবে না। শুধু বলবে, তোদের সেই মাসি। দেশের নামটা একান্তই জুড়ে দিতে চাও, বলবে অনেকদিন ধরে দেশভ্রমণ করে এসেছে। অধস্তন অপরাধীদের সেই নোংরা জেলটাও তোমার দেশ।'

'তোমার আদিখ্যেতা দেখলে গা জ্বলে যায়। আর লোক পেলে না, রাস্তা থেকে কুটুম ধরে আনলে। আর এমন কুটুম, সব সময় তটস্থ, কখন কী নিয়ে পালায়।' সঙ্গে হালকা একটু হাসি।

ভবদেবও হাসির ফোড়ন দিলে: 'তোমার আছে কত সোনাদানা!'

'কিন্তু ভগ্নীপতিটি তো আছে।'

ভবদেব গম্ভীর হয়ে গেল। সে-গাম্ভীর্য যেন প্রহার করল কল্যাণীকে। কল্যাণী চট করে সুর বদলাল। বললে, 'যার অধঃপতন হয়েছে তারই জন্যে ভয়, যে সূর্য আকাশ আরোহণ করছে তার জন্যে ভয় কি। ভাবছি, ছেলেমেয়েগুলো কী ভাববে! এরি মধ্যে পাশের বাড়ির জানলায় সুরু হয়েছে উঁকিঝুঁকি।'

'জানলা-দরজা বন্ধ করে দাও।'

'দরজাও? তার মানে ও থাকিয়ে বাসিন্দে হয়ে যাবে?'

'ভয় নেই। বেশি দিন থাকবে না। থাকতে পারে না। আর যদি থাকেই, রেখে দিতে পারনা? তোমার সংগ্রামের মন্ত্রে শোধন করে নিতে পারনা ওকে? ঘটাতে পারনা ওর পুনর্জন্ম? নোংরা জেলটাকে আবার তীর্থে বদলিয়ে দেয়া যায় না?'

'ভরসা হয়না আর ওকে। যে এত খারাপ, এত কু—' কল্যাণী

ছটফট করে উঠল: 'না বাপু, তুমি ওকে চলে যেতে বল। আমার এই সংসারের পবিত্রতা, আমার ছেলেমেয়ে—'

'মুখ ফুটে বলতে হবে না। নিজেই চলে যাবে।' ভবদেব লিখতে লাগল যেমন লিখছিল।

শোনা যাবেনা এমন দূরত্ব নয় ঘরটার। তামসী শক্ত হয়ে রইল।

বড বেশি অহংকার হয়েছে কল্যাণীর। ভুঁইফোড় থেকে হঠাৎ বনেদী হযে পড়েছে, ছিল কেউকেটা এখন একজন প্রায কেষ্টবিষ্টু। কিন্তু অত জাঁক ভাল নয়, গুমোর ফাঁক হযে যেতে পারে এক দিন। কে বললে সে চলে যাবে এক্ষুনি? সে এখানে থাকবে আট হয়ে। পষ্টাপষ্টি বললেও সে নড়বে না। সে হাড়ে মাংস গজাবে। থোকা-থোকা চুল লম্বা করবে পিঠ ছাপিযে। শবীরে আনবে রহস্যের ঝিলিমিলি। তার পরে একদিন রাত্রে দক্ষিণ থেকে যখন হাওয়া দেবে তখন সে ঢল-ঢল লাবণ্য নিযে খোলা চুলে বসবে গিয়ে ভবদেবের নিভৃতিতে। ভবদেব হাত বাড়িযে ধরবে সেই স্খলিত কেশগুচ্ছ। ধরবে যেন বিদ্যুৎপুঞ্জিত কালো ঝড়ের রাত্রিকে। অকস্মাৎ এতদিনে খুঁজে পাবে তার জীবনের তাৎপর্য। খুঁজে পাবে তার বিদ্রোহের প্রতিচ্ছায়া।

তখন কোথায় তুমি কল্যাণীদি? কোথায় তোমার দেশের দিকদেশ?

দাও না তোমার দুটো শ্রীমন্ত শাড়ি-জামা, দাও না মাথায একটু গন্ধতেল, দাও না ভালো-মন্দ দুটো খেতে পেট ভবে। আর গুরুগঞ্জনাহীন দাও না একটু বিশ্রাম। একটু তরতাজা হতে দাও, হাসতে দাও মন খুলে, কলরোলের সারল্যে। তারপর পাপীয়সীর ভেলকিটা একবার দেখ।

অত সাজগোজ তপজপেরই বা কী দরকার ? কে অতদিন ধরে বসে থাকবে বোকার মত ? দক্ষিণ থেকে আজই তো ঝিরঝিরে হাওয়া দিয়েছে। দীর্ঘকেশী না হতে পারলে কি চিত্তহারিণী হওয়া যায় না ?

'উঃ, সেই দুপুর না হতে কখন বেরিয়ে গেছেন, আর ফিরলেন এই প্রায় মাঝরাতে।' সেই দিন রাত্রেই ভবদেবের পাশের ঘরে গিয়ে তামসী কাঁদুনি গাইল : 'আমি সমস্তক্ষণ শুধু ছটফট করে মরেছি।'

শুনুক, শুনুক, পাশের ঘর থেকে শুনুক সব কল্যাণী।

'কেন বল তো ?' ভবদেব ঘর্মাক্ত পাঞ্জাবিটা খুলে ফেলল গা থেকে।

'সমস্তক্ষণ মুখ বুজে বসে থাকা যায় ? কাল থেকে আমি আপনার সঙ্গে বেরুব, ফিরবও আপনার সঙ্গে।'

'নিশ্চয়। একশোবার।' ভবদেব যেন একথাই শুনতে চাচ্ছিল এতক্ষণ।

'কিন্তু আজ ? এখন ? এখন কী হবে ?'

'কী হবে।'

'এখন আমাকে আপনি কবিতা পড়িয়ে শোনাবেন। কত দিন কবিতা শুনিনি আপনার মুখে।'

'কবিতা!' ভবদেব হেসে উঠল। 'কবিতা কোথায়! এখন বক্তৃতা।'

'না, না, যেমন করে একদিন আমাকে পড়াতেন, তেমনি করে আবার আজ পড়ান কবিতা। পায়ে পড়ি, সেই মায়াময় পরিবেশটা আবার আমাদের চারদিককার পৃথিবীর উপর নিয়ে আসুন।'

'মিছিমিছি ছেলেমানসি কোরোনা।' প্রায় অভিভাবকের সুরে ধমকে উঠল ভবদেব। 'সৈনিকের কাছে আর কোনো মায়াময় পরিবেশ নেই, শুধু রক্তাপ্লুত বাস্তবতা।'

'আপনি কী হৃদয়হীন !'

'য়্যাপেনডিক্সের মত হৃদয়কেও বাদ দিতে হয়েছে। কবিতাও তাই নির্বাসনে।'

'তা হলে আমি এখন কী করব?' কেমন নিঃস্ব শোনাল তামসীকে।

'তুমি? তুমি খেয়ে দেয়ে এখন ঘুমুবে।'

'আর আপনি?'

'আমার খাবার ঢাকা থাকবে, আমি একটা বক্তৃতা তৈরি করব।'

'লিখবেন?'

'হ্যাঁ, খুব একটা গরম বক্তৃতা। আর সেটা তোমার জন্যে।'

'আমার জন্যে?' তামসীর গা ঝিমঝিম করে উঠল।

'কাল বিকেলে একটা সভার বন্দোবস্ত করেছি, বিরাট সভা। আর তোমার বক্তৃতাটা হবে সব চেয়ে বড় আকর্ষণ। জ্বালামুখী বক্তৃতা।'

তামসী নিষ্প্রাণ গলায় বললে, 'কী হবে বক্তৃতা দিয়ে?'

'কী হবে? সমস্ত শহরে ঢ্যাঁড়া পড়ে যাবে কে এই ধ্বংসসাধিকা, কে এই বিপ্লবিনী? সভায় পুলিশ থাকবে, হয়তো সঙ্গে-সঙ্গে তোমাকে গ্রেপ্তার করবে। জেল হয়ে যাবে। জয় পড়ে যাবে দেশময়।'

দু হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল তামসী। বুঝতে পারল এক পলকে। ভবদেব আবার তাকে জেলে পাঠাতে চায়, পারে তো এই মুহূর্তে। জেলে পাঠিয়ে আবার নতুন অধ্যায় জুড়ে দিতে চায় তার জীবনে। বিপ্লবের রক্তে ধুয়ে নিতে চায় তার চুরির কলঙ্ক, চরিত্রহীনতার কালিমা। তা হলে মনে-মনে ভবদেবও তাকে মেনে নিয়েছে চোর বলে, অসতী বলে। সংস্কার-সংশোধনের জিনিস বলে।

তামসীর মাঝে ভবদেব কোনোদিন তামসীকে দেখেনি, দেখেছে

একটি বিদ্রোহের দীপশিখা। সেই দীপশিখা নিবে গিয়েছে চুপে-চুপে। অঙ্গারে আবার সে অগ্নিসঞ্চার করতে চায়, লৌহমলে আনতে চায় অপরাজেয় তীক্ষ্ণতা। যেমন রণধীরের বেলায় তামসী চেয়েছিল। বুকের ভিতরটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠল তামসীর।

ভবদেব হাসিমুখে বললে, 'না, না, তোমার অত ভয় পাবার কিছু নেই। বক্তৃতাটা আমিই দেব। তুমি শুধু শুনতে যেও।'

ভবদেব তখুনি বসে গেল কাগজ-কলম নিয়ে জ্বালামুখী বক্তৃতা লিখতে। কবিতাভিলাষিণী তামসীর দিকে ফিরেও তাকালনা। সে পেয়ে পেছে তার বিদ্রোহী চিন্তাকে, বিদ্রোহী ভাষাকে। তার আর প্রতিকৃতিতে দরকার নেই।

ত্রিশ

পরদিন সকালে কে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করতে লাগল। ঘুম থেকে উঠেই ভবদেব বেরিয়ে গেছে, কল্যাণী রান্নাঘরে। তামসী বাইরে তাকিয়ে দেখল, নারায়ণ। হাতে একটা পাকানো খবরের কাগজ।

দ্রুত হাতে খুলে দিল দরজা। উৎসুক উৎকণ্ঠায় প্রশ্ন করলে, 'উষসী এসেছে?'

নারায়ণ থ হয়ে রইল।

'উষসী কোথায়?'

'বলছি।'

তার আগে একটু ভূমিকা সেরে নেওয়া দরকার। নারায়ণ অনেক আগেই জেল থেকে বেরিয়েছে আর বেরিয়ে অবধি খোঁজ রেখেছে তামসী কবে ছাড়া পাবে, কোন জেল থেকে। তার হিসেবের একদিন আগেই তামসীকে ছেড়ে দিয়েছে এখানে, তাই ঠিক সময়ে তার নাগাল পায়নি। চমকে দেবে ভেবেছিল, কিন্তু নিজেই এখন চমকে উঠল। না, চেহারা দেখে নয়, তার থাকবার আস্তানা দেখে। পৃথিবীতে এ বাড়ি ছাড়া আর তার মাথা গোঁজবার জায়গা ছিল না?

মানেটা বুঝতে পেরেছে তামসী। ভবদেব যে দলে এসে ভিড়েছে সেই দলের সঙ্গে নারায়ণের দলের ঝগড়া। আদায়-কাঁচকলায়। প্রায় কেউ কারু মুখ দেখতে রাজি নয়। পরস্পর পরস্পরের কাছে দেশদ্রোহী। একজন যদি ভণ্ড, অন্যজন বাউণ্ডুলে।

আরেকটা মানের জন্য তামসী অস্থির হয়ে উঠল। বললে, 'তা হলে আপনার ওখানে যাব?'

'নিশ্চয়।' নারায়ণ দৃঢ়স্বরে জবাব দিল।

যেন তামসী তার দলের লোক। তার নিকটতব আত্মীয়। ভাবের আকাশ থেকে নেমে এসেছে বাস্তবেব বন্ধুরতায়। কৃত্রিমতা থেকে প্রাণবান সারল্যে।

মৃদুরেখায় হাসল তামসী। বললে, 'তা হলে আপনার ওখানেই উষসী আছে। চলুন।'

উষসীকে মুখ দেখাতে আজ আর তার লজ্জা নেই। উষসী বুঝুক কিছুকেই ঘৃণা করবার নেই, ভয় করবার নেই পৃথিবীতে।

কিন্তু নারায়ণ যে পা তোলেনা। মুখে স্থূল বিস্ময় এনে বললে, 'উষসী আমার ওখানে থাকতে যাবে কেন?'

'আপনার কাছে নেই?' আঁৎকে উঠল তামসী: 'তার মানে? তবে ও কোথায়?'

'তার নিজের জায়গায়।'

'সে আবার কী?'

'নিজের জায়গায় মানে নিজের বাড়িতে। তার স্বামীর কাছে।'

তামসী পাথর হয়ে গেল।

ব্যাপারটা অত্যন্ত সহজ ও সংক্ষিপ্ত। পুলিশ তাদেরকে ধরলে পর অনেক তদবির-তাগাদা করে উষসীকে প্রাণধন জামিনে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে। ছাড়িয়ে নিয়ে এসে খাঁচায় পুরে দরজা বন্ধ করে দেয়। টাকা খাইয়ে পুলিশকে দিয়ে ব্যাপারটা এমন ভাবে দাঁড় করায় যাতে উষসীর গায়ে দোষ না লাগে, উষসীর নামে শেষ পর্যন্ত মুচলেকা দেয় প্রাণধন। পুলিশ [illegible] তুলে নেয় উষসীর বিরুদ্ধে, তার ফলে সে পুরোপুরি পড়ে

গিয়ে প্রাণধনের খপ্পরে। এ একেবারে তার দুঃসহতম কল্পনার অতীত। যে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে ভেবেছিল সেই তাকে এখন চেপে পিষে ফেলছে।

তাই আপনাকে আমার চাই। জেল থেকে বেরিয়ে এসে অবধি শুনছি তার উপর অসহ্য পীড়ন চালাচ্ছে প্রাণধন। তার অমানুষিকতা ক্রমশ পৈশাচিকতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে কিন্তু এর এক্ষুনি প্রতিবিধান চাই। তাকে তিল-তিল করে মরতে দিতে পারিনা আমরা। সে জেল চেয়েছিল বটে কিন্তু এই অন্ধকূপ চায়নি। নির্যাতন সে কামনা করেছিল কিন্তু এমন আঘাত নয় যা তাকে মূল্য দেবেনা, সম্মান দেবেনা, একেবারে অনর্থক করে রাখবে। তাই আপনাকে আমার দরকার। আপনি আবার যাবেন প্রাণধনের বাড়িতে, আপনার হাতের ছোঁয়ায় খুলে দেবেন সেই বন্দীশালা, উষসীকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবেন। আপনি ছাড়া আর কারু সাধ্য নেই। আপনি—

'ছি ছি ছি।' শত কণ্ঠে ধিক্কার দিয়ে উঠল তামসী : 'এই আপনার বিপ্লব? আপনার মনুষ্যত্ব? লজ্জায় মাটির সঙ্গে আপনার মিশে যেতে ইচ্ছে করছে না?'

এমন একটা তিবস্কারের জন্যে প্রস্তুত ছিল না নারায়ণ। বিস্ময়ে একেবারে ম্লান হয়ে গেল। বিবর্ণস্বরে বললে, 'কেন, আমি কী করলাম?'

'আপনি কী করলেন? একটা বিবাহিত ভদ্র মেয়েকে তার স্বামীর আশ্রয় থেকে বের করে আনলেন আর এখন কিনা বলছেন, আমি কী করলাম! আপনাদের রাজনীতির মত আপনারাও এমনি দায়িত্বজ্ঞান-হীন তা বুঝতে পারিনি।'

অর্ধপথে নারায়ণ একটা নিশ্বাস রুদ্ধ করল। বললে, 'আপনি সমস্তটা

ভুল চোখে দেখছেন। উনি নিজের ইচ্ছায়ই বেরিয়ে এসেছিলেন, স্বামিত্বের অন্যায়ের প্রতিবাদে। সেই প্রতিবাদে আমি তার সহযোগী ছিলাম মাত্র। আর কিছু নয়। দায়িত্বের কথা যদি বলেন, তা আমি ত্যাগ করিনি। আমি বরাবরই লক্ষ্য রেখেছি কি ভাবে আবার উষসীকে উদ্ধার করা যায়।'

'লক্ষ্য রেখেছেন শুধু আমার উপর।'

'আপনার উপর ?'

'হ্যাঁ, রাজার আইন ভাঙা সহজ, লোক বাহবা দেয়। কিন্তু সমাজের আইন ভাঙা কঠিন, চারদিকে টিটিক্কার পড়ে যায়। বোঝা গেছে আপনার মুরোদ, আপনার বিপ্লবীত্ব। সমাজব্যবস্থা ভাঙবেন আপনারা! স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের ঠাট-কাঠামো বদলাবেন! মুখসাপটই শুধু আছে—' রাস্তায় নেমে এল তামসী।

'আপনি কী বলছেন ?'

'ঠিকই বলছি।' তামসী এক-পা এক-পা করে চলতে লাগল। বললে, 'একটা বিবাহিত মেয়েকে নিদারুণ ভয় করলেন। দেখলেন অনেক এখানে জোর-জুলুম লাগে, অনেক চোট-জখম, অনেক ধুলো-মাটি। তাই আর ও-সব ঝঞ্ঝাটে গেলেন না। দেখলেন কাছেই একটা বেছপ্পর কুমারী মেয়ে আছে, তারই দিকে নজর দেয়া যাক। বিপদ কম, সম্ভাবনা বেশি। তাই না ?'

'ছি ছি, আপনার মুখ থেকে এমন কথা শুনব ভাবতে পারতামনা।' সঙ্গে-সঙ্গে নারায়ণও চলছিল, থেমে পড়ল।

কণ্টকদৃষ্টিতে বিদ্ধ করল তামসী। বললে, 'উলঙ্গ সত্যকথা শুনলে এমনি মনে হয়ে বটে। কিন্তু বলুন তো, দৃষ্টিপাতটা একটু বেশী দীর্ঘ করেননি আমার দিকে ? কবে কখন কোন জেল থেকে বেরুব তার

পর্যন্ত দিন-ক্ষণ হিসেব করে রেখেছেন। অথচ যাকে একটা ভীষণতর জেলের মধ্যে ঠেলে দিলেন বাইরে থেকে, তার বন্ধ দরজায় আজো আপনার করাঘাত পড়ল না?'

'সমস্ত জিনিসটা আপনি ভুল চোখে দেখছেন—' বড় ক্লান্ত শোনাল নারায়ণকে।

'তাই আমাকে দেখেই আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বলছেন, আপনাকে আমার চাই, আপনাকে আমার দরকার। অথচ যে আপনাকে চেয়ে, আপনার উপর নির্ভর করে, সমস্ত শাখাশিকড় ছিঁড়ে-উপড়ে বেরিয়ে এল, তাকে আপনি অনায়াসে ত্যাগ করলেন, তার থেকে তুলে নিলেন সমস্ত দায়-দায়িত্বের সম্পর্ক। কেন? কিসে আমি উষসীর চেয়ে বেশি মূল্যবান হলাম আপনার কাছে? কেন তার জেলের দরজায় অপেক্ষা না করে দাঁড়ালেন এসে আমার জেলের দরজায়? আমার প্রতি কেন আপনার এই পক্ষপাত?'

নারায়ণ তার হাতের কাগজটার দিকে তাকাল শূন্যচোখে। বললে 'আমার পক্ষপাত আপনার জন্যে নয়, বিপ্লবের জন্যে। আপনাকে যদি এখন আমি চেয়ে থাকি বিপ্লবের জন্যেই চেয়েছি।'

'বলতে চান, উষসীর বিদ্রোহটা আমার চেয়ে কিছু কম?'

'মার্জনা করুন, ওরটা একটা সাময়িক বিক্ষোভ, অন্তঃপ্রেরিত বিপ্লব নয়। আর তোর ভাত খাবনা বলে আমাদের দেশের হাড়ি-মুচির মেয়েরা যেমন রাগ করে ঘর ছেড়ে চলে যায় এ কতকটা তেমনি। এ ঘর ছাড়ে, এ:কে ঘর থেকে কেউ ছাড়িয়ে আনেনা। তাই এর রাজনীতিটাই ভাবের রাজনীতি। কিন্তু আপনি—'

'থাক আর ব্যাখ্যানা করতে হবেনা। আমি জানি আমি কি। আমি চোর, আমি কলঙ্কী, আমি কুৎসিত। তাই আপনাদের মহান

সেই বিপ্লবের প্রত্যাশা আর আমার কাছে করবেন না। আমাকে এখন অনায়াসে ছেড়ে দিয়ে আপনারা আপনাদের নিজের-নিজের পথে যেতে পারেন।'

রাস্তার মোড় পেয়ে নারায়ণ দাঁড়িয়ে পড়ল। বললে, 'তা যাচ্ছি। কিন্তু আপনার কাছে এটুকু শুধু আমার অনুরোধ, আমার অন্তরের পবিত্রতাকে আপনি সন্দেহ করবেন না।'

আবার পবিত্রতা, দুর্ভেদ্য পবিত্রতা! অন্তরে-অন্তরে দগ্ধে যেতে লাগল তামসী। বললে, 'আমি নিজে অপবিত্র, তাই এখন আমার অপবিত্র সংস্পর্শই ভাল লাগবে। আচ্ছা, নমস্কার।'

কিন্তু নারায়ণ তক্ষুনি সরে পড়ল না। উৎসুক হয়ে বরং জিগগেস করলে, 'ওপথে কোথায় যাচ্ছেন?'

'কেন, ও-পথে কি রেলস্টেশনে যাওয়া যাবেনা?' তামসী ফিরল।

সব রাস্তায়ই ঘুরে-ফিরে রেলস্টেশনে যাওয়া যায়। কিন্তু স্টেশনে এখন কী!

'কলকাতা যাব।'

কলকাতার ট্রেন এখন ঢের দেরি। বরং যেটা অল্প কতক্ষণের মধ্যেই ছাড়বে সেটায় উঠলে উষসীর ওখানে যাওয়া যেত একটানা। তামসী বরং সেদিকেই রওনা হোক।

'কেন, উষসীকে উদ্ধার করতে?'

'সেটাও তো বড় কাজ।'

'কেন, সে কাজ বুঝি পবিত্র থেকে করা যায় না? তাই যে অপবিত্র, বেছে-বেছে তাকেই বুঝি সে কাজের ভার দিচ্ছেন! কেননা সে যে-কোনো ঝুঁকি নিতে পারে, যেতে পারে যে কোনো বিপদ যে কোনো পাপের মধ্যে—' তামসীর গলা বিষিয়ে উঠল।

নারায়ণ কথা বললে না।

'আর বীরত্ব দেখাবেন না। বরং প্রতীক্ষা করুন। দেখুন সত্যি সে সমস্ত চক্রান্ত ও অত্যাচার ডিঙিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে কিনা, না, গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। দেখুন তার বিপ্লবটা খাঁটি কিনা, মহৎ কিনা।'

তবু স্টেসনের দিকেই তামসী যাচ্ছে। বা, কলকাতা যাচ্ছি যে। তা যাকনা, কিন্তু এমনি খালি হাতে পায়ে কেন এই ছন্নছাড়ার পোশাকে?

উঃ, সেই ট্রাঙ্ক আর স্যুটকেশ দুটো কি কম জ্বালিয়েছে তামসীকে! প্রতিপদে বাধা, প্রতিচ্ছেদে অস্বস্তি। ও দুটো গেছে না বেঁচেছে তামসী। পরিপূর্ণ রিক্ততার অনুভূতি তার সর্বাঙ্গে হঠাৎ একটা মদিরস্পর্শ বুলিয়ে দিল।

'আর, এই ছন্নছাড়ার পোশাক কেন বলছেন?' তামসী হাসল: 'যাচ্ছিও সে একজন ছন্নছাড়ারই কাছে।'

নারায়ণ কি চমকে উঠল?

'কি ভাবেন আপনি আমাকে? আমি কি একেবারে নিরাশ্রয়? আমাকে দেখবার-শোনবার, উপকার করবার কি আর লোক নেই ভেবেছেন?' তামসীর চোখের কোণে বিদ্রূপ ঝলসে উঠল: 'আমি যেমন, আমার কুটুম তেমন। যেমন হাঁড়ি তেমনি সরা।'

এবার নারায়ণের ফিরে যাওয়া উচিত। তবু কে সেই ছন্নছাড়া নামটা সে জেনে যেতে চায়। দেখে যেতে চায় তামসীর অহংকারটাকে।

'কে আপনার সেই ছন্নমতি?' হাতের কাগজটা আঁট করে চেপে ধরল নারায়ণ।

'নাম শুনলে চিনতে পারবেন।'

'কে?'

'অধিপ মজুমদার। হ্যাঁ, সেই অধিপ মজুমদার'

যেন হেরে গেল নারায়ণ। এইবার তাকে ফিরতে হয় তার আপন কাজে। বিকেলে ভবদেবরা যে মিটিং করবে তা ভেঙে দেবার আয়োজনে। কিন্তু তামসীই তাকে ডাকল। বললে, 'অনেকক্ষণ বসতে হবে ইস্টিশনে। আপনার খবরের কাগজটা দিন। আজকের কাগজ তো?'

তামসীর হাতের মধ্যে কাগজটা গুঁজে দিয়েই নারায়ণ দ্রুতবেগে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রেল-স্টেশনের থার্ডক্লাশ মেয়েদের নোংরা ওয়েটিং-রুমে একটা শান-বাঁধানো বেঞ্চির উপর বসল তামসী। কতগুলি হিন্দুস্থানী মেয়ে কেউ বা কারুর উকুন বাছছে, কেউ বা কারুব ঘাড়-পিঠের ময়লা তুলে দিচ্ছে রগড়ে-রগড়ে। নানারকম ছেঁড়া-খোঁড়া মালামালে ঘরটা ঠাসা। আগাগোড়া অকথ্য অপরিচ্ছন্নতা। তবু সব কিছুব সঙ্গে তামসী আশ্চর্যরকম প্রতিবেশিতা অনুভব করলে। বেঞ্চিতে বসে সে খবরের কাগজটা মেলে ধরল।

ভিতরের পৃষ্ঠায় একটা খবর নারায়ণ নীল পেন্সিলের মোটা দাগে দাগিয়ে দিয়েছে। মেলে ধরতেই সব-কিছুর আগে ওটার উপর চোখ পড়ল।

ছাইয়ের মত বিবর্ণমুখে পড়তে লাগল তামসী। বুক দপ দপ করতে লাগল। খবরটা সাংঘাতিক।

একত্রিশ

খবরটা সাংঘাতিক।

ট্রেন ছাড়লে পর আবার খবরটা পড়ল তামসী। আরো একবার। বহুবার।

শুধু সাংঘাতিক নয়, ঘৃণাকর। অথচ ঘৃণা-লজ্জার আগে প্রথমেই লাগল কষ্টের মত, আঘাতের মত। মনে হল সাংঘাতিক।

রণধীর ইতিমধ্যে বেরিয়ে এসেছে জেল থেকে। বেরিয়ে এসে নিশ্চিত-নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে পারেনি এক জায়গায়। আবার জেলে যাবার জন্যে ছটফট-ছটফট করছে। কেউ তার ছিলনা যে আঁচলের হাওয়ায় তাকে একটু ঘুম পাড়িয়ে রাখে। মুখটাকে এ-কাৎ থেকে ও-কাৎএ ফিরিয়ে দেয়।

অনেক রকম চুরি-জোচ্চুরির কথা শুনেছে তামসী। চেকে সই জাল করে টাকা তুলে নেওয়া ব্যাঙ্ক থেকে, ফার্মের এজেণ্ট সেজে ভুয়ো মালের ওজরে টাকা নিয়ে চম্পট দেয়া, সোনা বেচতে এসে পেতল গছিয়ে হাওয়া হয়ে যাওয়া। আরো কত কি। ডাকাতির জলুস আছে এমন কিছু-বা না-ই সে ভাবতে পারত। কিন্তু চুরির মধ্যেও তো চেহারার ইতরবিশেষ আছে। সেই যে প্রথমে একটা আস্তানা খুলে বসেছিল বেকার যুবক-যুবতীদের চাকরি জোগাড় করে দেবে, নাম-রেজিস্টারির ফি বাবদ চাঁদা নিত দশ টাকা করে, সেই প্রবঞ্চনার মধ্যেও বা কিছু কৌলীন্য ছিল। কিন্তু এ কী অমিশ্র কদর্যতা!

রণধীর এক গণিকাকে মদের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে খাইয়ে অজ্ঞান করিয়ে তার গা থেকে গয়না খুলে নিয়েছে। কিন্তু নিস্তব্ধ মধ্যরাত্রি হলেও পালাতে পারেনি। হুঁসিয়ার মেয়েটার চীৎকারে চূড়ান্ত মুহূর্তে জেগে পড়ে আর-আর প্রতিবাসীরা। ধরে ফেলে রণধীরকে। প্রথমে হাজতে পোরে, শেষকালে এখন জেলে পুরেছে।

আবার জেল। পাষাণের চেয়েও পাষাণ সেই পাথরের দেয়াল! আবার সেই মুক্তির জন্যে দিন গোনা।

সেদিন সেই রাত্রে গা থেকে গয়নাগুলি যদি খুলে না রাখত তামসী, তা হলে কী হত? হয়ত অনেক আদর-আহ্বানের পরে তাকে মদ খেতে দিত রণধীর। রণধীর নিজের হাতে তুলে ধরলে হয়তো সে অমত-আপত্তি করত না। ছি-ছি, মদ পেত কোথায় রণধীর? মদ না পেত, বলত, চিনির সরবৎ করে দাও একটু। খাওয়া-দাওয়ার পরে হলে বলত, শাদা একটা সোডা আনিয়ে দাও, গরহজম হয়েছে। অগোচরে পানের মধ্যপথে কখন একসময় বিষ মিশিয়ে দিত। তারপর আদর-আহ্বানের অতিশয়তার এক ফাঁকে তাকে অনুরোধ করত—তুমি খাবে না একটুও? দ্বিরুক্তি করত না তামসী, পীতাবশিষ্টটুকু খেয়ে ফেলত এক চুমুকে। খেয়েই ঢলে গলে পড়ত বিছানায়। রণধীর খুঁটে-খুঁটে প্রত্যেকটি অঙ্গ বেছে-বেছে খুলে নিত গয়না। অব্যক্ত যন্ত্রণার এতটুকু একটা শব্দ বেরুত না তার মুখ থেকে। চিররাত্রির অন্ধকারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

ভাগ্যিস গা থেকে খুলে রেখেছিল গয়নাগুলো। ভাগ্যিস ঘুমিয়ে পড়েছিল বিভোর হয়ে। ভাগ্যিস তার চুরির পথটা প্রশস্ত করে রেখেছিল। নইলে—

সাপের মত একটা পিচ্ছিল আতঙ্ক তামসীর বুকের মধ্যে কিলবিল করে উঠল। যতই কেননা লাঞ্ছনা-লজ্জা হোক, সে কি মরতে চায়?

অকপট অপমানের মত মনে হল তার শরীরটাকে। নির্মল নিরাভরণতায় সেদিন সে নিরাবরণের নিমন্ত্রণ রেখেছিল। ঘুমের সমর্পণের মাঝে বা আকস্মিক অভিঘাতের প্রত্যাশা। সেই প্রত্যাশাটা এখন মনে হতে লাগল মুখের উপরে কুৎসিত কশাঘাতের মত। একটা যদি কোথাও আয়না পেত তামসী, নিজের মুখটা একবার দেখত। বিকার-বিকৃত কণ্ঠে জিগগেস করত নিজেকে, এখনো তোমার সাধ মিটল না? মদই খাবে, বিষ খাবেনা মদের সঙ্গে?

বিষ-নীল মুখটা একবার এখন দেখত সে দর্পণে!

কী দেখত?

দেখত, সে-ই সেই পথপ্রান্তের গণিকা। লুণ্ঠিতা, সর্বাপহৃতা। বিশ্বাস করে যাকে গৃহে, অন্তরে, সর্বভুবনে আশ্রয় দিয়েছিল সেই সর্বস্ব চুরি করে পালিয়ে গেল এক নিমেষে। আর এ তোমার শুধু বিত্ত-ভূষণ চুরি করল না, চুরি করল তোমার আগত দিনের স্বপ্ন, আগামী দিনের আশা। চুরি করল তোমার আরোগ্য-আরামের সম্ভাবনা। তোমার জীবনের প্রত্যয়।

তবে তুমি আর কী! তুমি তুচ্ছ, তুমি অকিঞ্চন। তুমি ঐ পথপ্রান্তের পণ্যাঙ্গনা।

কিন্তু ভাবো একবার ঐ নারায়ণের স্পর্ধাটা। খবরটা সংগ্রহ করে সযত্নে সঞ্চয় করে রেখেছে। যাতে একদিন তাকে ধূলায় বিধ্বস্ত করে দিতে পারে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে সাব্যস্ত করে দিতে পারে চিরজন্মের মত ব্রতনাশ হয়ে গিয়েছে তার, সে জাতিচ্যুত, স্বর্গস্খলিত। জলচ্ছায়ার পিছনে না গিয়ে চলে আসুক সে যজ্ঞাগ্নি-উৎসবে। যে আগুনের আরেক নাম সর্বশুচি। তার মানে আর কিছুই নয়, চেয়ে দেখ, আমি কত বেশি বিশুদ্ধাত্মা, কত বেশি বরণীয়। আমি না হই, বরং আমার

কাজ, আমার আদর্শ। আর তোমার মন যার দুয়ারে বাঁধা পড়ে আছে সে একটা কি! নরকের কীটের চেয়েও জঘন্য। অঙ্গ ছেড়ে তার চিন্তার স্পর্শটা পর্যন্ত কলুষিত। দেখবে? এই দেখ, নীল পেন্সিলে মোটা করে দাগিয়ে রেখেছি খবরটা।

সেই স্পর্ধার উত্তরে নিষ্ঠুর একটা প্রতিশোধ নেবার দুর্দাম ইচ্ছা হল তামসীর। ইচ্ছা হল সেও একটা কিছু অপকীর্তি করে বসে। জাগ্রত অক্ষরে খবরের কাগজে বেরোয় সে খবরটা। লাল পেন্সিলে মোটা করে দাগিয়ে পাঠিয়ে দেয় তা নারায়ণের কাছে। জাগ্রত চক্ষু মেলে দেখে একবার সে সেই পাপের প্রদীপ্তি। সেই জয়োল্লাস।

কিন্তু কী করতে পারে তামসী? কী তার ক্ষমতা।

আচ্ছন্নের মত পড়ে ছিল, উঠে তাকাল একবার বাইরে। দুশ্ছেদ্য অন্ধকারের মধ্যে ধাবমান ট্রেন ছাড়া আর কিছুই সে দেখতে পেল না।

না, পেল দেখতে। একটা অজানা অধঃপতনের দিকে একটা উৎপথযাত্রা। দেখুক নারায়ণ। দেখুক রণধীর। দেখুক জগৎসংসার।

'কোথায় যাচ্ছেন? কত দূর?'

মাঝরাতে জংশন-স্টেশনে গাড়ি বদল করতে হয়েছে তামসীর। সাইডিংএ পড়ে ছিল গাড়ি, লোক্যাল ট্রেন হয়ে ছেড়েছে শেষরাত্রে। টিকোতে-টিকোতে চলেছে প্রত্যেকটি স্টেশন ধরে-ধরে। কখন উঠেছে এ প্রশ্নকারিণী, কে জানে।

প্রশ্ন শুনে তাকাল তামসী। একটি বিধবা স্ত্রীলোক, পায়ে জুতো, ঘুরন দিয়ে ফিনফিনে কাপড় পরা। হাতে লেডিজ ব্যাগ, চামড়ার স্ট্র্যাপটা ঝুলছে কাঁধের উপর। কাপড়ের মত ব্লাউজও শাদা, হাতে-গলায় শাদা লেশ-এর সূক্ষ্ম কাজ করা। হাবেভাবে হাসিখুশির ঢিলেমি। ভরপুর চেহারা, যৌবনটুকু যাই-যাই করেও যেন মায়া করে থেকে

যাচ্ছে। ভাটার টানে জোয়ারের শেষ জল যেমন ছলছল করে।

'কলকাতা। আপনি?'

'আমি তো কলকাতাতেই কাজ করি। এখানে এসেছিলুম দেশের বাড়িতে। মার অসুখ, মাকে দেখতে। টাকা-পয়সা দিয়ে যেতে, চিকিৎসা-পত্রের ব্যবস্থা করতে। কিন্তু কাজের এমন ঝঞ্ঝাট, দুটো দিন কামাই করবার সুযোগ নেই—'

কী কাজ, জিগগেস করবে নাকি তামসী? যদি মাস্টারনী হয়, কোনো ইস্কুলে দিতে পারে নাকি ঢুকিয়ে? নিজেরো অলক্ষ্যে নিশ্বাস পড়ল তামসীর। জেলফেরৎ দাগীকে কে দেবে ইস্কুলের চাকরি? শুধু ইস্কুলের কেন, তার জন্যে নেই কোনোই সম্ভ্রান্ত জীবিকা। নেই বিশ্বাসের স্নিগ্ধছায়া। সুতরাং জিজ্ঞাসা করে লাভ কি?

'সঙ্গে কে আছে?' গায়ে পড়ে সুহাসিনীই প্রশ্ন করল।

'কেউ না।'

'জিনিসপত্র?'

'কিছু না। না, আছে, এই খবরের কাগজটা শুধু আছে। যত পচা, পুরোনো, বাসি খবর—' কাগজটাকে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে বাইরে ফেলে দিল তামসী।

বড় অদ্ভুত লাগছে সুহাসিনীর কাছে। রহস্য-রোমাঞ্চের কাছাকাছি। পায়ে সামান্য স্যাণ্ডেল নেই, হাতে-গলায় সোনা-রুপো দূরে থাক, কাঁচ-পুঁতি নেই, এক কাপড়ে পালিয়ে এসেছে মেয়েটা। নিশ্চয়ই বেরিয়ে এসেছে! দেখাচ্ছে তো কুমারীর মত। তবে সঙ্গে যদি লোক নেই তবে ও চলেছে কোন সর্বনাশের অতলে? বিপদে পড়ে খালাস হবার জন্যে চোরা-হাসপাতালে যাচ্ছে না তো? অভিজ্ঞ চোখে সুহাসিনী বিঁধতে লাগল তামসীকে।

'আপনার সাহস আছে বলতে হবে। ওয়েটিংরুমে না থেকে সারা রাত সাইডিং-এর গাড়িতে ঘুমিয়ে রইলেন। একে নির্জন, তায় অন্ধকার। যদি কিছু হত?' চোখে-মুখে আতঙ্কের ভাব ফোটাল স্থহাসিনী।

'যদি কিছু হত!' তামসী হাসল। 'যদি কিছু হয় তারি জন্যেই তো বসে আছি।'

বড় ভাল লাগল কথাটা। অন্তরঙ্গতা মাখানো। বেঞ্চি বদলে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল স্থহাসিনী।

গাড়িতে যখন এঞ্জিন লাগল তখনই প্রথম আলো জ্বলল। আর তখুনি আমি উঠলাম। তখনো বেশ খানিক রাত আছে। দেখলাম অঘোরে ঘুমোচ্ছেন, ধারে-পারে সঙ্গী-সাথী কেউ নেই। ভাবলাম, ডাকি, কিন্তু কত দুঃখের পর এই ঘুমটুকু না-জানি, তাই ভেবে ডাকলাম না। ভাবলাম গায়ে হাত দিযে ভয পাইয়ে দিই। হোক মেয়ে-কামরা, কিন্তু একা-একা ঘুমন্ত মেযেছেলে দেখলে অন্ধকারে তার গায়ে হাত দেবেনা এমন সবাইকে সাধুসজ্জন না পেলে নালিশ করতে পারেন কি?

'কিন্তু ভয় করেই বা লাভ হত কি বলুন? মাঝখান থেকে ঘুমটুকু মাটি হয়ে যেত। পথে যে বেরিয়েছে তার কি পথের কণ্টককে ভয় করলে চলে?'

কিন্তু কেন এ অভিমান? কেন ভোজের ঘবে ভাত নেই? হয়েছে কী? বাপ-মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে গোঁয়ারতুমি করে বেরিয়ে এসেছেন নাকি?

কেন, স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া হতে পারেনা? সিঁথিতে সিঁদুর নেই বলে? স্বামীকেই যদি অস্বীকার করতে পারি তবে তার দেওয়া এই

দাসত্বের শীলমোহরটা উড়িয়ে দিতে পারব না? বিশ্বাস করছেন না স্বামী আছে বলে? বেশ, তবে মনে করুন, চলেছি একটি স্বামীর সন্ধানে। মনের মানুষের তালাসে।

মনে-মনে মনমালা বদল করবেন বুঝি? সুহাসিনী আরো কাছাকাছি সরে এল। আরো যেন অন্তরের কাছাকাছি। কিন্তু পাখি শুধু ধরলেই তো চলবে না, পোষ মানাতে হবে খাঁচায় পুরে। সেই খাঁচা কই? আখড়া-আস্তানা কই?

তাই তো ভগবান আপনাকে মিলিয়ে দিয়েছেন হাতে ধরে। পথের প্রথম সূচনায় একটু কাজ-টাজ কোথাও দিতে পারেন জুটিয়ে? একটু মাথা গোঁজবার আশ্রয়?

আশ্চর্য, এতক্ষণে জিগগেস কবতে পারল তামসী। স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে যে-কাজ সুহাসিনী জোগাড করে দিতে পারবে তাতে শিষ্টতা-শালীনতার প্রশ্ন ওঠবার অবকাশ নেই। নেই অকারণ মনোভঙ্গের আশঙ্কা। আর সেই বা এমন কি অব্রণ-অক্ষত যে একটা খুব মর্যাদা-ওয়ালা চাকরি না হলে তার পোষাবে না? সমস্ত জেলজীবনের ব্যাধিবিকারগ্রস্ত বীভৎস ছবিটা মুহূর্তে ভেসে উঠল তার চোখের সামনে। সুতরাং তাকে শোভা পায়না এ নাক-বেঁকানো খুঁৎখুঁতুনি। সাময়িক আশ্রয় অন্তত তো পাবে। তাই বা কম কি। কঠিন-উদাসীন অচেষ্ট-অচেতন বিপুল কলকাতার কথা ভাবতে তার সর্বাঙ্গে ক্লান্তির জ্বর আসে—কোথায় সে ঘুরে বেড়াবে খালি পায়ে—কে দেবে তাকে বিশ্রাম, কে দেবে একটু বিস্মরণ? আর, তাই বা কত দিন?

'আপনি কী কাজ করেন?' দীননয়নে জিগগেস করল তামসী।

'আমি? আমি তো নার্স। নাম সুহাসিনী, সবাই বলে হাসিনী নার্স। করবেন আপনি নার্সগিরি?'

'সে তো খুব ভাল কাজ। কিন্তু ট্রেনিং লাগবেনা?'

'হাসিনী-নার্স দুদিনেই ট্রেনিং দিয়ে দিতে পারবে। এ শুধু হাসির ট্রেনিং। টাইটেল কি আর অমনি পেয়েছি?' সুহাসিনী হেসে উঠল।

সে-হাসির দোহার হল তামসী। বললে, 'ট্রেনিংএর পিরিয়ডটা থাকতে পারব তো আপনার কাছে?'

'নিশ্চয়।' সুহাসিনী তামসীর দুহাত টেনে নিল তার হাতের মধ্যে। 'তুমি আমার কলেজে-পড়া বিদেশিনী ছোট বোন। দিদির কাছে থাকবে না তো তোমাকে আমি পথে ভাসিয়ে দেব?'

বেশ একটা কলেজী-কলেজী ভাব আছে মেয়েটার মধ্যে। দুদিন ঘসে মেজে চেকনাইটা আরো তুলতে পারবে ফুটিয়ে। নিজে যেমন মাথার চুলে পিন দিয়ে রুমাল আটকায়, তেমনি ওর হাতে কখানা না-হয় খাতা-বই তুলে দেবে। আর একটা না-হয় বেঁটে ছাতা। চশমা লাগবে চোখে? দরকার নেই। চোখদুটো এমনিতেই বেশ বড়-বড় আছে।

কে জানে, কোনো খিটকেল না ঘটে। ছেঁড়াচুলে খোঁপা বাঁধার না দশা হয়।

নিজের ইচ্ছেয় আসবে, হাসিনীর কি। এ তো আর আনাড়ী ছোট খুকি নয়, প্রকাণ্ড দিগধেড়েঙ্গা মেয়ে। ঢং-ঢাঙাতি শেখাতে হবেনা তাকে।

'দেখো ভাই, কোনো ভেজালে পড়ব না তো?' কানে-কানে বলার মত করে ঝুঁকে পড়ে বললে সুহাসিনী।

'আমি যদি না জালে আটকা পড়ি, তুমিও ভেজালে পড়বেনা।' তামসী বললে বন্ধুনীর মত। 'তুমি দিদি, আমি বোন। আমি যেমন আমার কুটুম তেমন।'

দুজনে হাসতে লাগল।

বত্রিশ

হাসিনী-নার্সের ডেরা গৃহস্থ-পাড়ায়। যেমন তার পোশাকের শুভ্রতা তেমনি এই ভদ্রতার পরিবেশটাও তার মোহবর্ধক। বাড়ির মধ্যে এতটুকু তার বেচাল নেই। গম্ভীর সম্ভ্রমের সঙ্গে স্নিগ্ধ সুরুচির সামঞ্জস্য ঘটিয়ে চলা-ফেরা করে। আর-আর বাসিন্দেরা বুঝে উঠতে পারে না। আত্মীয়তার আঙিনার মধ্যে এসেই আবার নির্লিপ্ততার খিড়কি দিয়ে চলে যায়। সন্ধের সময় কোন-এক ডাক্তারের ক্লিনিকে গিয়ে বসে বলে—কিন্তু ফিরতে কোনো দিন রাত করে না। বাড়িতে বাইরের লোকের যাতায়াত নেই, দরজায় নেই টোকা-টুসকি। আলেখ্য শ্লেটের মত বেদাগ। কালেভদ্রে যদি কেউ আসে, দেশের থেকে ছোট-ছোট ভাই-ভাগ্নেরা আসে। আজ যেমন ছোট বোন এসেছে একজন।

'আমার মামাতো বোন হয়। পশ্চিমে থাকত। কলকাতার কলেজে পড়তে এসেছে।' পরিচয়টা চালু করে দিলে সুহাসিনী।

ঘরে ঢুকে গলা খাটো করে তামসী বললে, 'সাক্ষাৎ না বলে মামাতো বোন বললে কেন?'

'মুখে এসে গেল। এখন মনে হচ্ছে মাসতুতো বোন বললেই পারতাম।' ততোধিক গলা নামালো সুহাসিনী।

তামসী হেসে উঠল। ত্বরিত ভ্রূভঙ্গির নিচে স্মিতহাস্যের সমর্থন।

হাসবে না তো কি। অবাচ্য আশ্রয় মিলে গিয়েছে। অনাত্মীয় শহরে প্রথম আতপচ্ছদ। স্টেশন থেকে আসতেই পথে জুতো কিনে দিয়েছে, পদোচ্চতার প্রথম নিদর্শন। বাড়িতে এসে বাক্স থেকে খুলে দিয়েছে শাড়ি-ব্লাউজ, যত নাগরীপনার সজ্জাদ্রব্য। স্নানের জন্যে ঢাকা-ঘেরা বাথরুম, সরকারী কলতলা নয়। স্নানের শেষে খোস-খোরাক। খাওয়ার পরে গা-ঢালা বিছানা। তন্দ্রাবিজড়িত বিশ্রান্তি।

কে দিত তামসীকে? এত সহজে? স্টেশনের বাইরে প্রথম পা ফেলতেই? কে আছে তাব স্বজনবান্ধব?

আশ্চর্য, যখন সে নারায়ণের দিকে বিপরীত মুখ করে কলকাতা যাবার জন্যে পথ স্থির করলে, তখন সে কী ভেবেছিল, কোথায় গিয়ে উঠবে? দাঁড়াবে গিয়ে কোন গাড়ি-বারান্দার নিচে, কোন গ্যাসপোস্টের গা ঘেঁসে? আশ্চর্য, কিছুই সে ভাবেনি। ভেবেছিল কলকাতা গিয়ে পৌঁছুতে-না-পৌঁছুতেই কী না-জানি অঘটন ঘটে যাবে। জেলের দরজায় দেখতে পায়নি, হয়তো দেখতে পাবে স্টেশনের ফটকের সামনে। কে জানে, হয়তো বা প্রথম রাস্তার মোড় ঘুরতেই। তখনো যে মনে আশা ছিল, সাহস ছিল, বিশ্বাস ছিল। কলকাতাকে তখনো তাই মনে হয়নি নিরুদ্ধ-নিরুত্তর। একজন কেউ আছে এই অনুভবই তার রিক্ততার রৌদ্রে ছিল শ্যামল মেঘচ্ছায়ার মত।

কিন্তু এখন সে একেবারে বিশ হাত জলের তলে পড়েছে। কোথাও কোনো অবলম্বন নেই, নেই অস্ফুট তীররেখা। হাতের কাছে একটা খড়কুটো পেয়ে তাকেই তামসী আঁকড়ে ধরেছে। অগ্রটাই আগে ভাবা দরকার—একটুকু আশ্রয়, একমুঠো আহার—পশ্চাতের কথা ভাবা যাবে পশ্চাতে। এর মধ্যে পাওয়া যাবে হয়ত একটু অবকাশের রন্ধ্র, যেদিক দিয়ে পাওয়া যাবে বা পালিয়ে যাবার আকাশ, উঠে দাঁড়াবার জায়গা।

সন্ধেবেলা তামসী সাজগোজ করলে হাসিনী-নার্সের অধ্যক্ষতায়। সাদাসিধে পোশাকেও এমন প্রখর পারিপাট্য আনা যায় জানত না তামসী। হাতে বই-খাতা না থাকলেও ঠিক কলেজ-মেয়ে বলেই মনে হবে—থোকা-থোকা খাটো চুলগুলো চমৎকার কাজে লেগেছে।

হাসিনী আঁটলে তার রুমাল-টুপি। নির্ভাজ শুভ্রতায় নিষ্কলঙ্কতার প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়াল। দুশ্ছেদ্য গাম্ভীর্যের বর্ম তার শরীরে, সাধ্য নেই কেউ তাকে চক্ষু দিয়ে বা ছুঁয়ে যায়।

বেরুবার সময় একটু রসিকতা করল তামসী। বললে, 'আমার কলেজটা কি রাত্রে ?'

'হ্যাঁ।' গলার স্বরটা এতটুকু দুর্বল হলনা হাসিনীর। বাড়ির সবাইকে প্রায় শুনিয়ে বললে, 'রাত্রে স্টেনোটাইপিঙের কলেজ বসে, সেখানেই তোকে ভর্তি করে দেব। যাতে তাড়াতাড়ি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারিস, ভদ্র রোজগার করতে পারিস দুদিনেই।' অনুপস্থিত জনতার অশ্রুত সমর্থন নিয়ে তামসীর হাত ধরে রাস্তায় নেমে পড়ল।

গাড়ি নিল না। মৃদুগম্ভীর পায়ে জনাকীর্ণ ফুটপাথ ধরে দুজনে হাঁটতে লাগল পাশাপাশি। একই নীরব বন্ধুতায় দৃঢ়বদ্ধ হয়ে। একই চিহ্নধারিণী হয়ে। তামসী হাসিনীর লোক, হাসিনী তামসীর পৃষ্ঠপোষক—পরস্পরের প্রস্ফুট বিজ্ঞাপন হয়ে। চমকিত জনতা স্ফুরিত চোখে সবে যাচ্ছে সমুখ থেকে, কেউ-কেউ বা বিদ্ধ করছে ধারালো চোখে। দুজনের মুখভাবে কঠিন উপেক্ষা, প্রায় সংসারবিরক্তি। যেন কোন মহৎ কর্তব্যের আহ্বানে অপ্রকম্প পায়ে এগিয়ে চলেছে। এতটুকু চঞ্চল হবার, বিচ্যুত-বিচ্ছিন্ন হবার সময় নেই।

আসছে কি কেউ পিছনে? নিঃশব্দ পদচারে?

তামসীর মনে হল যেন সমস্ত শহর-বাজার শ্মশান হয়ে গেছে,

আলোর প্রসন্নতা মুছে গিয়ে নেমে এসেছে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। সে একা-একা হেঁটে চলেছে কঙ্কালাকীর্ণ মাঠের উপর দিয়ে, আর তাকে অনুসরণ করছে এক নিরবয়ব কৃষ্ণচ্ছায়া। চিনতে পেরেছে সে সেই প্রেতমূর্তিকে। সে এক আত্মীয়ের প্রেতাত্মা। তার নাম—

তার নাম পাপ। দুরিত-দুরাচার।

আত্মীয়ের প্রেতকেই কি বেশি ভয়?

তামসী তাকালো একবার হাসিনীর মুখের দিকে। মৃদুরেখায় হাস্য করল হাসিনী। উৎসাহব্যঞ্জক হাসি। তামসী কেমন চমৎকার পথোত্তীর্ণ হয়ে এসেছে। স্মিতস্নিগ্ধমুখে তামসী সে হাসির মান রাখলে। মানে হল এই, আরো কত দুরূহ পরীক্ষা অনায়াসে পার হয়ে যাব দেখো।

'এই আমার সেই ডাক্তারের ক্লিনিক। এসো। বসো এইখানটায়।'

চার দিকে দ্রুত চোখ বুলিয়ে অবস্থাটা বুঝে নিল তামসী। একটা হোটেল সন্দেহ নেই। চেয়ারে-টেবিলে আলাদা-আলাদা দল পাকিয়ে খাচ্ছে অনেকে। অদূরে পর্দা-ফেলা আলাদা কামরা আছে দু-সারে। ও গুলো বুঝি নেপথ্যচারিণীদের জন্যে। কিন্তু সেদিকে এগুলো না হাসিনী। বিশেষ একটি নির্জন কোণে রাস্তার দিকে মুখ করে বসল। তামসীকেও বসালো পাশে, তেমনি রাস্তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে। যাতে পাপের জ্যোতি স্পষ্ট করে মুখে পড়ে। বিজ্ঞাপনের ভাষাটা প্রগলভ হয়ে ওঠে।

পরিচিত বয় এসে হাসিনীর থেকে অর্ডার নিয়ে গেল।

মদ আনতে বললে বোধ হয়। একদিন এমনি এক হোটেলে চন্দ্রমা মদ খেতে দিয়েছিল তামসীকে। তামসী তা খায়নি। কিন্তু আজ যদি হাসিনী তাকে মদ দেয়, সে অনায়াসে তা খেতে পারবে। অন্তত খেয়ে

দেখতে পারবে মদটা খেতে কেমন। সেদিন সে এত শ্রান্ত, এত শূন্য ছিল না। ছিল না এত নিঃসঙ্গ, এত নিরর্থক। ছিল না এই পাপের আবৃত্তির মধ্যে।

বয় এসে দু কাপ চা দিয়ে গেল।

'এখানে মদ পাওয়া যায় না?' আশাভঙ্গ হয়েছে এমনি ভাবে প্রশ্ন করল তামসী।

'না। এটা শুধু চায়ের রেস্তরাঁ। কেন, এ সব চলে নাকি তোমার?'

'এ পর্যন্ত স্পর্শ করিনি। কিন্তু মনে হচ্ছে একটা অপূর্ব স্বাদ, অপূর্ব সংসর্গ থেকে অনর্থক বঞ্চিত করে রাখছি নিজেকে।' তামসীর চোখ দুটো চকচক করে উঠল।

ওসব চালাতে গেলে বন্ধ ঘরে বাসা নিতে হয়। চলে যেতে হয় হেঁজিপেঁজির দলে। এমনি শালীনতা বজায় রেখে সম্ভ্রমের সঙ্গে ব্যবসা করা যায়না। এই যে একটা অভিজাত আবহাওয়া তৈরি করেছি, মেনে চলছি গার্হস্থ্য সংযম, এটাই তো আসল আকর্ষণ, এরই জন্যেই তো মাননীয় মূল্য পাবার সুবিধে। তা ছাড়া, শারীরিক-আধ্যাত্মিক সব দিক দিয়েই এটা নির্বিঘ্ন। মদ খেয়েছ কি, রাস্তা থেকে কখন ছিটকে পড়েছ গিয়ে আঁস্তাকুড়ে।

একটা বদ্ধবায়ু দূষিত পঙ্ককুণ্ডের মাঝে বসে আছে তামসী। দু-দু কাপ করে চা খাওয়া হয়ে গেল—আর কতক্ষণ বসে থাকবে শূন্যচোখে?

যতক্ষণ কেননা বসো, রেস্তরাঁওয়ালা আপত্তি করবে না। হাসিনীর দৌলতে তার বেড়ে গিয়েছে আমদানি। কাছে থেকে ব্যাপারটায় রস পাবার জন্যে অনেকেই তৃষার্ত হয়ে ঢুকেছে তার দোকানে। অন্তত এক পেয়ালা চায়ে শুষ্ক কণ্ঠ সিক্ত করেছে।

কার জন্যে এমনি বসে আছে তামসী? সে কে? কার জন্যে তার এ আরম্ভ-উদ্যোগ? এ অনুধাবন? সে কোথায়?

মাত্র একটা ক্লিন্ন-কদর্য পাপকে স্পর্শ করেই কি তাকে স্পর্শ করা যাবে?

একজন স্থূলকায় প্রৌঢ় ভদ্রলোক হঠাৎ এসে বসল হাসিনীর মুখোমুখি। চকিতে একবার চোখ চাইল তামসী—না, অবিপ নয়। গালের উচ্চচূড়ে দলিত কতগুলি ব্রণ—সমস্ত মুখে লোলুপতার অবলেপ। নিচু গলায় কি কতক্ষণ আলাপ করলে হাসিনীর সঙ্গে, বাঁকা চোখের খোঁচা দিতে লাগল তামসীকে। কিছুক্ষণ পরেই অন্তর্হিত হয়ে গেল।

'একটা গাড়ি আনতে গেল—' হাসিনী বললে।

'এবার আমাদের গাড়ি চড়ে ঘুরতে হবে নাকি?' তামসীর দৃষ্টিতে একটা অব্যক্ত আতঙ্ক।

'এ যাত্রায় তুমি নও, আমি একলা। একলা মানে ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে। তোমাকে দিয়ে আমার দরটা শুধু বাড়িয়ে নিলাম।' হাসিনী সুহৃদ-সুজনের মত হাসল।

'তার মানে?'

'তার মানে তোমাকে পেতে হলে আগে আমার সাধন-ভজন কর! আমি যদি প্রসন্ন হই তবেই না বর পাবে। ঘোড়া ডিঙিয়ে কি ঘাস খাওয়া চলে?'

রসিকতার রেশটা বজায় রাখল তামসী। বললে, 'তবে বলতে চাও, যত দিন আছি তোমার গাধাবোট হয়েই থাকব, স্বাধীন প্রতিযোগিতা করতে পারব না?'

'পারবে কি গোড়াতেই? আড় ভাঙতে সময় লাগবে না? তত

দিন একটু ভাঙিয়ে খাই তোমাকে। এমনিতে তো আর ঘরভাড়া বা খাওয়া-খরচ নেবনা, তোমার দয়ায় দরদামটা একটু তেজালো করি।'

লোকটা ফণা-তোলা ফিটন নিয়ে এল। গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে লোকটাকে শুনিয়ে-শুনিয়ে তামসীকে উপদেশ দিলে হাসিনী। 'ট্রামে করে সোজা বাড়ি চলে যাও। নতুন লোক, বেশিক্ষণ বাইরে থেকোনা। কি, পারবে তো বাড়ি যেতে?' ব্যাগ থেকে হাসিনী মনিব্যাগ বার করলে।

পয়সা কটা হাত পেতে নিতে-নিতে চোখে গ্রাম্য নম্রতা এনে তামসী বললে, 'পারব।'

হাসিনী নার্স ও তার সঙ্গীকে নিয়ে ফিটন চলে গেল।

মুহূর্তে একটা কুটিল কুজ্ঝটিকা উড়ে চলে গেল সামনা থেকে। তামসী নিজেকে একবার দেখলে নিজের মধ্যে। শরীরের দৃঢ়তায় ও মনের প্রজ্বলিত প্রতিজ্ঞায় নিজেকে অনুভব করলে নতুন করে। খানিকটা পথ জোরে-জোরে হেঁটে নিল। ভাবল, চলে যাই অন্য দিকে, উড়ে পালাই।

এসপ্ল্যানেডে এসে সে দক্ষিণী ট্র্যাম নিলে। প্রমথেশবাবুর বাড়ির ঠিকানা তার জানা। সেখানে গেলেই কোনো সূত্রে সে ধরতে পারবে অধিপকে।

রক্তিম বাসনার মত নয়, লাঞ্চিত অন্তরঙ্গ বেদনার মত। কী মুখ নিয়ে সে দাঁড়াবে অধিপের কাছে? জয়ীর মত হাসতে পারবে তার মুখের দিকে চেয়ে? কেন পারবে না? জীবনকে যে সে বহুরাগিণীতে বাজিয়ে চলেছে—আশায় আর অপমানে, স্বপ্নে আর সর্বনাশে—সেই তো তার জয়। বাসনা নয়, বেদনা নয়, শুধু জীবনসাধন, জীবনের উদ্ঘোষণা। আমি যে বাঁচছি, যুদ্ধ করছি, এগিয়ে যাচ্ছি এতেই আমি অপরাজেয়।

কোন এক স্খলিত মুহূর্তে অধিপ তার পায়ের গোড়ালির উপরে—ঠিক কতখানি উপরে কে জানে—সামান্য একটু হাত রেখেছিল একদিন। সত্যি স্পষ্ট হাতে রেখেছিল কিনা তা মনে পড়ছে না। হয়তো হাত রাখবার একটা ইচ্ছা ফুটে উঠেছিল তার ভঙ্গিতে। ধমক দিতেই হাত সে সংযত করেছিল। কিন্তু সেদিন তামসীকে আশ্রয় দেবার প্রযোজনে যখন সে ব্যস্ত হাতে গৃহসংস্কার করছিল তখন তার দশ আঙুলে ছিল এই স্পর্শেরই সম্পৃহতা। অসুখের সময়টা সে ধবছে না। তখনকার ব্যাকুলতায় হয়তো বা সাময়িক ভাবাবেশ ছিল, সেই অস্থিরতা মনের মধ্যে স্থাযী হতে পাবছে না। একটি গূঢ-গোপন বলিষ্ঠ স্পর্শেচ্ছা তাকে যেন এখন অজ্ঞাতসারে আকর্ষণ করছে। শরীরের উত্তপ্ত অনাবৃতিতে লাগছে তা এখন পুলকোদ্গমেব মত।

এই সেই বাড়ি। কিন্তু ঘর-দরজা বন্ধ, অন্ধকাব মনে হচ্ছে কেন? শুধু কোণের একটা দিকে, হযতো বা চাকব-দাবোয়ানের এলেকায়, আলো জ্বলছে। সাহস করে সেই দিকেই পা বাডাল তামসী।

খবর যেটুকু পেল তা কোনো কাজের নয়। প্রমথেশবাবুর খুব অসুখ, সপরিবারে চেঞ্জে আছেন। সেই যে পূজোর সময় গেছেন এখনো ফেরেননি। তবে খবর পাওয়া গেছে অসুখটা নাকি বাডাবাডি যাচ্ছে ক'দিন থেকে। তাই এখন আব ওখানে পডে থাকবার কোনো মানে হয না।

আর অধিপ? অধিপবাবুর কোনো খবর জানেন?

তার খবর কে জানে? সে কি একটা মানুষ?

তবে আর কি। ফিরে যাও সেই হাসিনী-নার্সের আস্তানায়। তার শাদা কাপড়ের গোপন পাড় হয়ে থাকো। জমকালো অক্ষরে তার সাইনবোর্ড হয়ে। যাতে তোমাকে দেখিয়ে তার মান-মুনফা বাড়িয়ে

নিতে পারে। তোমার ভাড়া-খাজনার বিনিময়ে। যাতে তুমি নিষ্ক্রিয় লোভের জিনিস হয়ে ব্যবহৃত হতে পারো তার লাভের পসরায়।

তবু নিজেকে দুর্বল, অসহায় মনে হল না তামসীর। কেন, সে স্বাধীন হতে পারেনা ? স্বাধীন প্রতিযোগিতায় অতিক্রম করতে পারবে না হাসিনীকে ?

তেত্রিশ

কোথায় দাঁড়িয়ে আছি সেইটে দেখবার কথা নয়, কোন দিকে চলেছি সেইটেই দেখবার কথা। যে যাই বলুক, পিছু হটা নয়, যেতে হবে এগিয়ে। সতর্কতার মরুভূমি থেকে অভিজ্ঞতার কণ্টককুঞ্জও ভাল।

রাত্রে ঘুম আসে না তামসীর।

'একটা খুব সুন্দর সুখস্মৃতিব কথা ভাবো—দেখবে ভাবতে-ভাবতে ঠিক কখন ঘুম এসে গেছে।' পাশ ফিরতে-ফিরতে বললে হাসিনী।

সুখস্মৃতি! তামসী অন্তরের সুদূর অন্ধকারে অন্বেষণ করতে লাগল। রাত্রিব প্রথম যাম থেকে শেষ যাম পর্যন্ত। যেন অন্তহীন এক কণ্টকাবণ্যেব মধ্য দিয়ে সে হাঁটছে। বৃন্ত ধবছে কিন্তু ফুল খুঁজে পাচ্ছে না। বিকাশে সৌরভে, আপনার উদ্ঘাটনে, আপনি সম্পূর্ণ যে ফুল। খুঁজে পাচ্ছে না একটি নিটোল-নিবিড় নিচ্ছিদ্র মুহূর্ত। আপনার রঙে-রসে সমুজ্জ্বল।

'গায়ের জামা-কাপড় সব খুলে ফেল। আমার কাছে লজ্জা কি।' ঘুমে-জড়ানো গলায় হাসিনী বললে, 'দেহে-মনে সমস্ত বাঁধন-আঁটন আলগা করতে না পারলে ঘুম আসে না।'

হাসিনীর সেই শ্লথ-মুক্ত স্থূলচর্ম ঘুম তামসীর অসহ্য লাগতে লাগল। এই কি পরিতৃপ্তির চেহারা? এই কি সমুদ্রমন্থনোত্থিত অমৃত?

মাঝরাতে হাসিনীর একবার ঘুম ভাঙল বুঝি। বললে, 'কি, তোমার এখনো ঘুম এলো না? এসো গল্প করে ঘুম পাড়িয়ে দি।'

তামসী জানে, কি এই গল্প। যত বিকারাচ্ছন্ন যৌনলীলার বর্ণনা। নিরবয়ব নিষিদ্ধ কৌতূহলে তাকে ক্লিন্ন ও ক্লান্ত করা। বললে, 'না, ভগবানের নাম করছি।'

ছেলেবেলায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করত মনে আছে। বিশেষত, পরীক্ষার হলে ঢোকবার সময় বেড়ে যেত সেই আকুতি। ভগবান আছে কি নেই, ডাকলে ফল হয় কি না হয়, কোনোদিন জিজ্ঞাসা করেনি। ডাকতে ডাকতে মনে একটা স্নিগ্ধতা আসত, অনেকক্ষণ কাঁদার পর যেমন আসে। বাবা মারা যাবার পর আর সে কাঁদেনি বুক ভরে। অনিদ্রাক্রান্ত অন্ধকারে এখন সে সেই স্নিগ্ধতার কামনায় অধীর হয়ে উঠল। কাঁদবে? কিসের জন্য কাঁদবে? তার চেয়ে যাকে দেখা যায় না, যাকে পাওয়া যায় না সেই অগোচরবাসীকে সে স্মরণ করুক। ভাবুক আত্মস্থ হয়ে।

সকালে উঠে ছিমছাম হয়ে তামসী বাইরে বেরুবার উদ্যোগ করলে। হাসিনী আপত্তি করলে না। সকালে-দুপুরে বিজ্ঞাপন দিয়ে না রাখলে নৈশ প্রদর্শনী জমবে কি করে? শুধু বললে, 'ফুরফুর কোরো শুধু. উড়ে পালিও না।'

তামসী রাস্তায়-রাস্তায় এ-বাড়ি ও-বাড়ি খুঁজে বেড়াতে লাগল। কোথাও যদি একটা চাকরি পায়, একটু মার্জিত আশ্রয়। হদ্দ হল সে ঘুরে ঘুরে। কোথাও এতটুকু প্রশ্রয়-বিনয় মিলল না। যারা বা দুয়ার থেকেই প্রত্যাখ্যান করলেনা, তারা সবাই তার অতীত সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসু, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নয়। কুটিলগামিনী নদীর অতীত অপরিচ্ছন্ন বলে কি ভবিষ্যতে তার সিন্ধুসংযোগ হবে না? দেখুন আমার বর্তমান, কাজ আর ব্যবহার, দেখুন আমার ভবিষ্যৎ, একটা ভদ্র চাকরি না পেলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াব, অতীত আলোড়ন করে লাভ কি?

কে শোনে এই সব শূন্য কথা ? উপার্জনের পথ না পেয়ে রণধীর চোর হয়েছিল, সে হয়তো গণিকা হবে।

বারে-বারে বাইরে বেরোয়, বারে-বারেই আবার ফিরে আসে তামসী। হাসিমুখে বলে, 'ভগবানের ইচ্ছে নয় আপনার থেকে মুক্ত হই।'

'হ্যাঁ, ভগবানের ইচ্ছেটা অন্য রকম।' কড়ায়ের ভাজা মাছ খুন্তি দিয়ে একে-একে উলটিয়ে দিতে লাগল হাসিনী।

'কি রকম ?'

'আমাকেই এবার তিনি মুক্তি দেবেন। ভাজা মাছ ওলটাতে শিখে গেছ এতদিনে, তাই এবার রান্নাঘরে তোমাব পালা।'

ব্যাপারটা বিশদ করল হাসিনী। একটা রাঘববোয়াল জালে পড়েছে। তামসীকে সে রাখতে চায় একটা উল্লেখ্য টাকার বিনিময়ে। এই খোলা-বস্তি ছেড়ে চলে যেতে হবে কেতাদুরস্ত আধুনিক ফ্ল্যাটে, শালীনতার পরিবেশে। হাসিনী হবে তার পাচিকা-পরিচারিকা, মাইনে যা মিলবে তাতে পোষাবে এই পদভ্রংশ। বয়স আর বপু বাড়ছে বই কমছে না, তাই যদি বেলাবেলি পাকাপাকি হিল্লে হয়ে যায় সেইটেই বাঞ্ছনীয়। তামসীকেও তো থিতু হয়ে বসতে হবে এক জায়গায়। দিন থাকতে আল বাঁধতে পারলেই তো সোনার থাল মিলবে। আর বড়লোক ছোটবোন থাকতে কে অমন ছুটোছুটি করে !

তামসী এত দিন কুলীন পাড়ায় চাকরি খুঁজেছিল, এবারে নেমে এল নীচোন্ডবের এলেকায়। যে করে হোক, চাকরি একটা জোটাতেই হবে, পালাতে হবে হাসিনীর পাপাবর্ত থেকে। পিশুন পৃথিবীর সঙ্গে তার স্নেহহীন, সমাপ্তিহীন যুদ্ধ চলেছে। তবু, এই যুদ্ধে, সে নিজেও যে সেই পৃথিবীর পক্ষে, পৃথিবীর দলে। তার নিজের বিরুদ্ধেই তো তার

নিজের যুদ্ধ। ঠিকই হচ্ছে, এমনি করে পৃথিবী তাকে লাঞ্ছিত করুক, বিপর্যস্ত করুক, তবু পৃথিবীকেই সে সমর্থন করবে! এই তো তার পরীক্ষা, তার শুদ্ধিকরণ। এই যুদ্ধে যদি সে হারেও তবু তার অভিযোগ থাকবে না। তার পৃথিবীর জয়ে তারও জয় থাকবে অনুচ্চারিত। কেননা সে তার নিজের নয়, সে পৃথিবীর।

একটা কাঠের আসবাবের দোকানে সে চাকরি পেল। কাজ আর কিছু নয়, বিকেলের দিকে কয়েক ঘণ্টা চুপ করে এসে বসে থাকা। তার মানে, বিজ্ঞাপনপাত্রী হয়ে খরিদ্দার আকর্ষণ করা। সম্প্রতি দোকানের মালিককে যে আকর্ষণ করতে পেরেছে তাতে সন্দেহ কি। বাসা বদলাল তামসী, তার মানে হাসিনীর ডেরায় সে আর ফিরে গেল না। মালিকই তার এক ভাড়া-খাটা বাড়ির মধ্যে একটা পরিত্যক্ত ঘরে তাকে স্থান দিলে। বললে, 'কাজ ভাল হয়, প্রমোশন দেব। মাইনেতে তো বটেই, বাড়িতেও।'

তাকে শেষ পর্যন্ত শান্তিতে থাকতে দেবেনা, স্পষ্টাক্ষরে তা জানে তামসী। একদিন নিশ্চিত ভঙ্গিতে বাড়িয়ে দেবে স্থূল হাত। সেদিনের প্রাকমুহূর্ত পর্যন্ত সে অপেক্ষা করবে। নিজেকে অস্পষ্ট করে রাখবে, রাখবে কুহকবেষ্টিত করে। ছলনাময়ীর ছদ্মধারণ করে ব্যবধানটা লোভনীয় করে তুলবে। তাতেও ছাড়া না পায়, আঘাত হানবার সুযোগ না ঘটে, পরিষ্কার পালিয়ে যাবে। তখনকার কথা তখন। এখন তো একটু অন্তরাল, একটু আবরণ পাওয়া গেল। হাসিনীর উদ্যত মসীলেপন থেকে বাঁচাতে পারল মুখটা।

একদিন এই আসবাবের দোকানে এক নবদম্পতির আবির্ভাব হল। দরজার কাছেই চেয়ারের হাতলের উপর দুই হাত তুলে দিয়ে সচেতন ভঙ্গিতে চিত্রলিখিত হয়ে বসে ছিল তামসী, শুনলে, মোটর থেকে নেমে

স্বামী স্ত্রীকে জনান্তিকে বলছে : 'এ কি, মিস পাবলিসিটি এখানে এসে জুটেছে দেখছি।'

নবপরিণীতা স্ত্রীর নম্র নেত্রও আকৃষ্ট হল। সেও চমকে উঠল একটু। বললে প্রায় আত্মগতের মত : 'আরে, সেই তামসী দত্ত না? শেষ পর্যন্ত এই দশা?'

'কেন চেন নাকি?'

'চিনতাম এক কালে। এক হস্টেলে ছিলাম পাশাপাশি। ঝান্থ মেয়ে, তখন থেকেই বেরুত বাইরে।'

'এখন একেবারে সরকারী ভাবে বেরিয়েছেন। বস্তির গলির মুখে না দাঁড়িয়ে আসবাবের দোকান মিস পাবলিসিটি হয়েছেন। মানে, আরেকটি আসবাব হয়েছেন। আমি জানি ওর অনেক কীর্তিকলাপ।'

'কি, তা হলে ঢুকবে নাকি?'

স্বামী অভয় দিল স্ত্রীকে : 'কাঠ কি দোষ করল? কাঠের তো চরিত্র নেই।'

দু জনে দোকানে এসে ঢুকতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল তামসী। নবোঢ়ার মুখের দিকে চেয়ে অনুকৃত বিস্ময়ের ভঙ্গি করে বললে, 'আরে, সেই চন্দ্রমা সেন না? শেষ পর্যন্ত এই দশা?'

রাগবে ভেবেও রাগতে পারল না চন্দ্রমা। তামসীর দুই চোখের ব্যথিত কৃষ্ণিমা করুণ রাগিণীর মত হঠাৎ তাকে ছুঁয়ে গেল। বললে, 'ঢেউ আমার, আমি ঢেউয়ের নই। আমি জানতাম আমার সীমারেখা। তাই গণ্ডির মধ্যে জীবনের সুন্দর পর্যাপ্তি পেয়ে গিয়েছি। তুই?'

'সীমা ছাড়িয়ে যেতে না পেলে জীবনের উৎসব কোথায়? গণ্ডির বাইরে না গেলে কি সোনার হরিণ ধরা যায়?' তামসী হাসল।

'ধরতে পেরেছিস সোনার হরিণ?'

'ধরতেই যদি পারব তবে তাকে মায়ামৃগ বলবে কেন? অহর্নিশ শুধু তাকে খুঁজেই বেড়াচ্ছি।'

'তাই বুঝি বিয়ে করিস নি?'

'কোথায় পাব শাঁসালো-চাকুরে সজ্জন সচ্চরিত্র? দরিদ্রবন্ধু দেশভক্ত দিকপাল?'

'কেন, সেই অধিপ মজুমদার কি হল? চিবিয়ে ছিবড়ে করে ছেড়ে দিলে? কেন, আদালত করতে পারলিনে?'

অধিপের উপর এখনো চন্দ্রমার মনোভঙ্গের তাপ আছে। তামসী বললে, 'ওসব লোক ধূমকেতুর মত, ওদের নিযে কি সংসার করা চলে? অন্ধ ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পড়ে সাঁতার কাটা এক জিনিস, ঘটি করে জল তুলে বাথরুমে বসে স্নান করা আব এক।'

'বেশ তো, তেমন একটি গোলগাল ভালোমানুষ ধরলেই পারতিস। কেরানি কি ইস্কুলমাস্টার।'

'বিধির বিড়ম্বনায় আমি যে সীমাতিক্রান্ত। আমার জন্যে কোথাও যে কোনো বেষ্টনরেখা নেই। নেই কোনো বন্ধনতীর।'

'তাই বুঝি আছিস চিবন্তনী মিস পাবলিসিটি হযে।'

মূর্তিমতী মধ্যবিত্ততা, তুমি আছ মিসেস পাবলিসিটি হয়ে। তামসী ঘৃণার বদলে করুণা ফিরিয়ে দিল। প্রচার করছ তোমার ভীরুতা, অল্পজীবীতা, তোমার সংকীর্ণ আত্মবুদ্ধি। উচ্ছৃঙ্খলতার দীপ্তিতে নিজেকে বিকীর্ণ, ভস্মীভূত করে দেয়ার মধ্যেও হয়তো প্রাণের প্রয়োজন। জীবন যখন বহনদুষ্কর তখনই জীবনবাহকের বলিষ্ঠতা।

তবুও কতক জিনিস ওরা কিনল। অর্ডারি মালের বায়না দেবার সময় দোকানের মালিকের কাছাকাছি এসে সমবেশ বললে, 'মেয়ে-কর্মচারী রাখলে দোকানের বিক্রিপাটা ভালো হয় নাকি?'

মালিক বাধিতের মত হাসল। ভাবখানা এই, তার প্রমাণ তো হাতের কাছেই পাওয়া যাচ্ছে এখুনি।

'অনেকের কাছে এই ডেকোরেশনটাই বাধা সৃষ্টি করবে। আর কিছু না হোক, দোকানের সম্ভ্রান্ততা থাকবে না।'

'চাকরি থেকে তবে ছাড়িয়ে দেব নাকি?' বিশ্বাসভাজনের মত জিগগেস করলে দোকানী।

'সে আপনি জানেন। আপনার খ্যাতি, আপনার সুনাম, আপনারই লুক-আউট। এর আগে ভদ্রমহিলাকে দেখেননি কোনোদিন রাস্তায়? এক নার্সের সঙ্গে হেঁটে বেড়াত ফুটপাত ধরে?'

'কে জানে মশায়? দুঃস্থ জেনে চাকরি দিয়েছি, তার মধ্যে যে এত কোরকাপ আছে কে বলবে? দুনিয়ার যত খেমটা সব ঐ ঘোমটার নিচে।' দোকানের মালিক টিপ্পনি ঝাড়লে।

'নমস্কার।' নবদম্পতি যখন চলে যাচ্ছে তখন দুয়ারের সামনে এসে তামসী বললে, 'নমস্কার। কাঠেরও চরিত্র আছে বৈকি। কেউ সেগুন কেউ শেওড়া। কেউ চাকরি পাইয়ে দেয়, কেউ বা ছাড়িয়ে দেয় চাকরি থেকে।'

ঘুরে দোকানের দিকে মুখ করতেই দোকানের মালিকের সঙ্গে তামসীর চোখোচোখি হল। মালিক তার দিকে চেয়ে ঈষৎস্ফুরিত চোখে হাসল। ভাবখানা এই, তোমাকে চিনেছি এত দিনে, কিন্তু তোমার ভয় নেই, আমি আছি। কারু সাধ্য নেই তোমাকে এই চাকরি থেকে টলায়। এইবার আমাকে চেন।

নয়নলেহনের এই গ্লানিতে তামসী সংকুচিত হলনা। নির্ভয়ে সে-হাসি সে প্রত্যর্পণ করলে।

সমরেশদের বাড়িতে যেদিন মালগুলো পাঠান হল, সেদিন কি তার

পরের দিনই রাষ্ট্র হল কলকাতায়, জাপান যুদ্ধে নেমেই ডুবিয়ে দিয়েছে প্রিন্স অফ ওয়েলস। প্রশান্ত মহাসাগরে স্বরু করে দিয়েছে দুর্দান্ত দস্যুতা। দুর্বার প্রাবল্যে হানা দিয়েছে ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জে। হানা দিয়েছে মালয়ে, সিঙ্গাপুরে, বর্মায়।

অপরিমিত উল্লসিত হয়ে উঠল তামসী। ইংরাজ পরাস্ত হবে বলে নয়, মহাকালের মহামারণলীলা চোখের সামনে দেখতে পাবে বলে। ধ্বংসের দেবতা যখন পূর্ব দিগন্তে দেখা দিয়েছেন তখন তাঁর নৃত্যপদস্পর্শ পড়বে এবার ভারতবর্ষে। সে পবিত্র স্পর্শের জন্যে তামসী তার স্তব্ধ হৃদয় প্রসারিত করে দেবে। আস্থক নতুন মোহমুক্তি। আর কিছু না হোক, চূর্ণ হয়ে যাক চন্দ্রমা-সমরেশের সৌখিন আসবাব, শোভন-শালীন ভঙ্গুর সংসারকাপট্য। এই মিথ্যা প্রাচীর-গ্রন্থন, এই আপাতরম্যতা। ধ্বংস হয়ে যাক হাসিনীর স্খলগ্ন নিদ্রিত নগ্নতা, পরিচ্ছন্ন আবরণের নিচে নিজের পাপ অন্যের আত্মায় সংক্রামিত করবার কৌশলকলা। ভস্ম হয়ে যাক প্রচ্ছন্ন ভোগের প্রত্যাশায় দোকানের মালিকের ঐ নকল চাকচিক্য।

এই বিশ্বব্যাপী ধ্বংসের প্রসঙ্গে তামসী হঠাৎ নিজেকে অনুভব করলে ধ্বংসের দূতিকা বলে। প্রিয়ংকরী নয়, প্রলয়ংকরী বলে। তার আতীব্র আকাঙ্ক্ষাটাই যেন আকাশচারী অগ্নিদেবতার আকার গ্রহণ করেছে। হবনীয় বহন করবার জন্যে আসছেন সমস্তভুক।

দোকানীও যেন পালাবার পথ খুঁজে পায় না। বললে, 'দোকানপাট বন্ধ করে দেব এবার। চলে যাব দেশের বাড়িতে।'

তৃপ্তিভরা হাসি হাসল তামসী। বললে, 'জাহাজ ডোববার আগে ইঁদুরের মত সবাই-ই তো পালাচ্ছে দেখছি।'

'আপনিও চলুন আমার সঙ্গে। দেশের বাড়িতে নিরিবিলিতে থাকা যাবে দুজনে।'

'বহু আরাধনার পর এত বড় সুযোগ পেয়ে অমন তুচ্ছভাবে নিজেকে ধ্বংস করতে আর সাধ হয় না। মরি তো বড় করে মরি, ডুবি তো অগাধ অতলে ডুবে যাই। ছোট-ছোট নিশ্বাস ফেলে মনের এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে বাঁচতে চাইনা। একটা বড় আহুতির জন্যে প্রস্তুত হই।' তীব্র সুরে তার বাঁধা হয়ে গেছে, তামসীর এসেছে তাই স্ফুটবাক্য।

একটা কদর্থ করলে দোকানী। যুদ্ধের আওতায় নিশ্চয়ই মোটা রোজগারের গন্ধ দেখেছে, পিদিম ছেড়ে ধরবে এবার ঝাড়লণ্ঠন। উপায় নেই, সুখের চেয়ে স্বস্তি-শান্তি ভালো, দোকানী তার দোকানের দরজা আর জানলার ফাঁকগুলো ইটের গাঁথনি দিয়ে বুঁজিয়ে দিতে লাগল।

বাকি মাইনেটা এগিয়ে দিয়ে দোকানের মালিক জিগগেস করলে, 'এবার কোথায় যাবেন?'

'সমস্ত কলকাতা ভূতে-পাওয়ার মত উদ্ভ্রান্ত হয়ে পালাচ্ছে, এখন জায়গার অভাব কোথায়?' তামসী রাস্তার দিকে দীর্ঘ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল: 'দেখছেননা রাস্তা কেমন দূর কেমন ফাঁকা হয়ে গেছে।'

'আবার তবে সেই রাস্তায়ই হাঁটবেন নাকি?'

'বলা যায় না, আবার রাস্তা থেকে দোকানেও উঠতে পারি। যে রাস্তায় পায় না সে দোকানেও পায় না।'

বিকেলের বিধুর আলোতে কলকাতাকে করুণ লাগছে। পলায়নপর কলকাতা! ভয়োন্মোদ কলকাতা! যে দিকে পারছে মূঢ়চেতনের মত উৎকুণ্ঠ হয়ে ছুটছে। যতরকম যানবাহন আছে—উচ্চ থেকে নীচ, গরুর গাড়ি, ঠেলা, রিকস্‌া—সব চলেছে উদ্দাম চক্রাবর্তে। বাদবাকি পায়ে হেঁটে, উত্তাল উচ্ছৃঙ্খলতায়। কে কাকে প্রশ্ন করে, কে কাকে প্রবোধ দেয়। চারদিকে শুধু আতঙ্ক, অস্থৈর্য, অসম্বৃতি।

শান্ত, ধীর পা ফেলে-ফেলে এগুতে লাগল তামসী। অনেক দূর

হাঁটলে—হাঁটতে-হাঁটতে মনটাকে মুক্ত, দৃঢ় করে ফেললে। মনে হল আজ সে নিঃসঙ্গ নয়, নিরাশ্রয় নয়। আর কাউকে তার ভয় করবার নেই, ভিক্ষা করবার নেই। তার আপন জন এসে গিয়েছে তার নিকটে। পায়ের সঙ্গে-সঙ্গে পা মিলিয়ে চলেছে। সেই যে তার আগামী কালের আগন্তুক! স্থিরীকৃত মৃত্যু।

হাঁটতে হাঁটতে চলে এল সে দক্ষিণাঞ্চলে। প্রমথেশবাবুর বাড়ির দরজায়। শুনলে, অসুখ বাড়াবাড়ি হওয়াতে প্রমথেশবাবুরা ফিরে এসেছেন। এখন আবার প্রত্যাবর্তনের কথা উঠেছে। প্রমথেশবাবু ফিরে যেতে রাজি নন। নিশ্চিত ব্যারামে মরার চেয়ে অনিশ্চিত বোমায় মরা অনেক স্বস্তিকর। মেয়েরা আগেই পালিয়েছে, স্ত্রীকে নিয়েই দ্বন্দ্ব। এত বড় সঙ্গিন রুগীকে ফেলে যাওয়াই বা কেমন কথা, ওদিকে নরখাদক জাপানীর থেকে না-পালানোটাই বা কী বিবেচনা।

'কেমন আছেন আজকাল?'

'একটু ভালো।'

'আমি দেখা করতে পারি?'

'কী নাম বলব?'

'তামসী।'

লোকটা ফিরে এসে তামসীকে নিয়ে গেল ভিতরে, দোতলায়। পায়ের দিকে দূরের জানলা দিয়ে বিষণ্ণ আকাশের দিকে তাকিয়ে শুয়ে আছেন প্রমথেশবাবু। বড় ঘর, বিসর্পিত ছায়া মেলে ধীরে-ধীরে বিছানার পাশে দাঁড়াল তামসী। মৌন হয়ে তাঁর ক্লান্তকরুণ কণ্ঠের অপেক্ষা করতে লাগল।

জল-উদ্বেল গুহার আনন্দধ্বনির মত বলে উঠলেন প্রমথেশ: 'স্ফটিকাচল থেকে কি গঙ্গা নেমে এলে মা?'

তামসী থমকে রইল। আমি গঙ্গা?

বললে, 'চিনতে ভুল হচ্ছেনা আমাকে?'

'ভুল হবে কেন?' প্রমথেশ তাকালেন আচ্ছন্ন চোখে। 'তুমি প্রবাহিনী। তুমি স্রোতস্বচ্ছ। তাপহরা, তৃষ্ণাহরা—'

আরো এগিয়ে এসে প্রমথেশের শুষ্ক কপালে হাত রাখল তামসী। বললে, 'আমি তামসী। ভয়ংকরী। যে মহানিশা ঘনিয়ে আসছে তারই আমি অধিষ্ঠাত্রী।'

প্রমথেশ হাসলেন। বললেন, 'তুমি মনোহর তমোহর। অরুণোদয়ের প্রতিশ্রুতি। তুমি থাকো। তা হলেই সে আসবে।'

একটু ঝুঁকে পড়ে তামসী প্রশ্ন করল: 'কে আসবে?'

হঠাৎ আবার সজাগ হলেন প্রমথেশ। কপালের উপরে একটি স্নেহশীতলস্পর্শের স্বাদ নিতে-নিতে বললেন, 'না, মৃত্যু নয়। অধিপ।'

চৌত্রিশ

আবার কি পাখা গুটোলো নাকি তামসী? ঘরের আরামে আবার ঘন হয়ে উঠল?

'আমাকে শিগগির ভালো করে তোলো মা।' প্রমথেশ তামসীর উৎসুক হাত চেপে ধরলেন: 'সবাই এখন জাগছে, লড়ছে, আমিই শুধু অথর্ব হয়ে পড়ে থাকব এ বরদাস্ত করতে পারছি না।'

তামসী অকৃপণ হাতে সেবার ভার নিল। ক্রমে ক্রমে প্রায় সংসারের ভার। প্রমথেশের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী অনেক দিক থেকে যাচাই করে দেখলেন, মেয়েটির সম্পর্কে বিরূপ হতে পারলেন না। নম্রতায়, দৃঢ়তায়, সব চেয়ে উল্লেখ্য, নির্লিপ্ততায়, মেয়েটি অনন্যপূর্ব। ঔদাসীন্যের সঙ্গে সহিষ্ণুতার চমৎকার অন্বয় করেছে—অনুদ্বেগের সঙ্গে অস্পৃহা। মেয়েটিকে ভালবাসতে সাধ হয়, বিশ্বাস করতে জোর আসে।

বললেন, 'রোগের বিরুদ্ধেই হোক আর সকল রোগের আকর ইংরেজের বিরুদ্ধেই হোক তোমরা যুদ্ধ কর প্রাণপণে, আমি পালাই। মোটা মানুষ, সাইরেন শুনে সিঁড়ির নিচে নেমে বারে-বারে আর সরু হতে পারি না।'

'কোথায় পালাবেন?'

'পশ্চিমে। ছোট মেয়ের কাছে।'

'আর এই সমস্ত আমি একা সামলাব?'

'হাতে সাম্রাজ্য পেলে তাও বুঝি তুমি একা সামলাতে পারো। তোমাকে দেখিনি এ কদিন? রোগ আর বোমা দু-দুটো শক্রর সঙ্গে তোমার লড়াই করার তোড়জোড়?'

'তার মানে আমাকে তোসামোদ করছেন—'

'তারই মত শোনাচ্ছে বটে। কিন্তু যদি তুমি আজ চলে যাও তামসী, তবু বোধহয় কথাটাকে ছোট করতে পারব না। কাছে আছ বলেই খোসামোদ শোনাচ্ছে, দূরে গেলে শোনাত বন্দনার মত। কোনরকম পয়সা-কড়ি নেবেনা, মুখের স্তুতিটুকু দিতেও আপত্তি করব?'

'তারো চেয়ে বেশি দিচ্ছেন। দিচ্ছেন অন্তরের বিশ্বাস। কিন্তু ভয় হয়, ফিরে এসে না দেখেন আপনার সংসার আমি তছনছ করে ফেলেছি।'

'কার সংসার কে তছনছ করে?' প্রমথেশ-পত্নী দার্শনিকের মত বললেন। কিন্তু চোখের কোণে ক্ষীণ হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল।

'আপনি জানেন না, আমার হাতে শুধু সর্বনাশের মন্ত্র—'

'তা তো চোখের সামনেই দেখছি। কি করে একটা রুগ্ন মানুষকে আরোগ্য দিয়ে নির্মাণ করে তুলছ। কি করে নিরাশ-নিরানন্দ ঘরে আনছ মিলনের সম্ভাবনা।'

'মিলনের সম্ভাবনা?' তামসী মর্মমূল পর্যন্ত চমকে উঠল।

হ্যাঁ, পিতা-পুত্রের মিলনের সম্ভাবনা। তুমি ছাড়া এ অজোড়জোড়ন আর কারু সাধ্য নয়।'

তামসী প্রমথেশের কাছে গেল। একটু ব্যস্ততার সঙ্গে বললে, 'আপনার স্ত্রী পর্যন্ত চলে যাচ্ছেন।'

তাই কথা ছিল বটে। সবাইকে বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দিয়ে

কোনো নার্সিং হোমে চলে যাব। কিন্তু অযাচিত আশীর্বাদের মত তোমাকে যখন পেয়ে গেলাম—

'আমি কি নার্স?'

সন্দেহ ছিল নিশ্চয়ই। অধিপের ক্ষতব্যথিত শিয়রে তার সেবামূর্তি তিনি দেখেছেন বটে কিন্তু সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। বিশেষত আরোগ্যের তটসীমায় পৌঁছে দেবার আগেই তার সেই আকস্মিক তিরোধানটা তাঁর কাছে লেগেছিল প্রায় আঘাতের মত। কিন্তু তামসীর সেই তিরোধানের পর অধিপকে তো তিনি দেখেছেন। দেখেছেন কি ভাবে তিল তিল করে কী অসীম প্রত্যাশার মধ্যে সে ভালো হয়েছে, কী তীক্ষ্ণ অন্বেষণের মধ্য থেকে আকর্ষণ করেছে তার জীবনীশক্তি। দেখেননি হয়ত, অনুভব করেছেন। সর্বক্ষণ প্রশ্ন করেছেন মনে-মনে, কে এই প্রাণদায়িনী, কে এই অসাধ্যসাধিকা। যে শূন্যতার থেকে রচনা করতে পারে নবীন নক্ষত্র। আরোগ্য নয় তামসী, তারও চেয়ে বড় সৃষ্টি, নবজীবন।

তামসী খিল খিল করে হেসে উঠল। বললে, 'যাকে ফেলে চলে গেলাম সে অনেকদিন ভুগে আস্তে-আস্তে ভালো হয়ে উঠল—এইটেই আমাব নার্সিংয়ের প্রমাণ?'

'না, তার চেয়ে ভালো প্রমাণ পেয়েছি। দস্তরমত স্পষ্ট, লিখিত সার্টিফিকেট।'

সে আবার কি!

'একটা চিঠি। লিখেছে, নার্সিংয়ে নাকি তোমার ভালো ট্রেনিং আছে। পাকাপোক্ত কোন এক বহুদর্শী নার্সের সঙ্গে অনেক নাকি হাঁটাহাঁটি করেছ—'

কালো হয়ে উঠল তামসী। বললে, 'কে লিখেছে চিঠিটা?'

ক্কে দেখতে গেছে! নার্সের সঙ্গে বেড়াতে—এইটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট। শেষ পর্যন্ত পড়ার আর তাই দরকার হল না। ভাবলাম, আশ্চর্য, যেমনটি চাই ঠিক তেমনটিই পেয়ে গেছি।

'দেখি চিঠিটা।' তামসী তার ডান হাতটা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রসারিত করল।

'উড়ো চিঠি, আবার উড়ে গেছে।' স্মিতসৌম্য মুখে প্রমথেশ বললেন।

কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল তামসী। এটা-ওটা কাজ করতে-করতে অপ্রত্যক্ষভাবে বললে, 'আমিও তো অমনি বেনামী চিঠির মত। বেনামী জনতার মধ্যে থেকে কে এক অজ্ঞাতকুলশীল উড়ে চলে এসেছি এই অন্তঃপুরে—'

'সব উড়ে-আসা জিনিসকেই কি উড়িয়ে দেখা যায়?' প্রমথেশ তেমনি হাসলেন: 'কেউ-কেউ দিব্যি উড়ে এসে ঠিক জুড়ে বসে।'

'শেষকালে প্রহারেণ ধনঞ্জয়ের ব্যবস্থা?'

'ওটা জামাইদের বেলাতেই বলা হয়েছে মা, বধূদের বেলায় নয়।'

তামসীর গভীরনিস্থত রক্তে যন্ত্রণার মত একটা শিহরণ বাজল। এই কি শৃঙ্গারশিহর?

কোথায় আর সে যাবে! কোন পথ ধরে হাঁটবে সে আর কিসের অন্বেষণে! এই তো তার গম্য, এই তো তার প্রাপ্য—এই গৃহপ্রতিষ্ঠা, এই গৃহপ্রবেশ। ভাগ্যের বিরুদ্ধবাদিনী হয়ে আর কত কাল সে উদ্ঘাতিনী পন্থায় কালহরণ করবে? আর কেন সে ছায়ানুসারিণী, পাপানুসারিণী হবে? এই তার ভালো, এই তার যথাযোগ্য। এই বিলাস-অলস বিশ্রাম, এই রহস্যগূঢ় রমণীয়তা। কষ্টজীবীতার সকল অস্ত্রই সে বুক পেতে নিতে পারবে, শুধু নিতে পারবেনা কুসুমকার্মুকের খরশর?

প্রমথেশ বলেন, 'যদি আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা থাকে মা, তবে অভিলষিতলাভ অনিবার্য।'

তামসীর সমস্ত শরীরের শিরাতন্তুতে এ কিসের তীব্রতা? কোন অভ্রংলিহ আকাঙ্ক্ষার? কোন অবচনীয় আর্তনাদের?

হ্যাঁ, সে আসবে। তামসীই চিরকাল আগ্রহে তার পশ্চাদ্ধাবন করেছে—তার নাম নেই, ধাম নেই, বস্তুসত্তা নেই—শুধু এক মহান কামনা মৃত্যু পর্যন্ত তাকে আকর্ষণ করেছে। আর সে ছুটবে না, চঞ্চল হবেনা। প্রশান্ত প্রতীক্ষায় স্থির হয়ে থাকবে। এবার তার আসবার পালা। এবার সে আসবে বলবন্যার মত, খড়্গের আহ্বানে রক্তস্রোতের মত, যেমন তিমিরাবরণ ছিন্ন করে সদ্যসূর্যের রক্তরশ্মিতীর ছুটে আসে।

দরজায় কেউ ধাক্কা দিচ্ছে নাকি? বালিশের থেকে মাথা তুলে কান খাড়া করল তামসী। কেউ না, কিছু না। ও শুধু সুষুপ্ত মধ্যরাত্রির হৃৎপিণ্ডের শব্দ।

ভীষণ গরম পড়েছে। গাছের পাতাগুলো দেয়ালের ইটগুলোর মতই নিস্পন্দ। আকাশের বিমর্ষ উপহাসের মত জ্যোৎস্না উঠেছে। সমস্ত নীরবতা মৃত্যুলিপ্ত। শুধু একটা উন্নিদ্র কাক ভয়ার্ত কণ্ঠে সেই নিঃস্বতাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

দু-দুবার বাথরুমে গিয়ে মাথা ধুয়ে এসেছে তামসী। ঠাণ্ডা জল খেয়েছে আকণ্ঠ। ঘুম আসছে না। পুরাদমে পাখা চলছে। অবন্ধন করে দিয়েছে বেশবাস। খাট ছেড়ে মর্মরের মেঝের উপর মুক্তবক্ষে শুয়ে আছে, নিমজ্জমান সমর্পণের ভঙ্গিতে। একাকী ঘরে উচ্ছৃঙ্খল অন্ধকার। শুয়ে-শুয়ে, যাতে ঘুম আসে, ভাবতে চেষ্টা করছে সে গোপনলালিত সুখস্মৃতি। অপ্রকাশ্য অথচ অনাবৃত। স্মৃতি নেই, স্বপ্ন আছে শুধু। একদিন দেবিকাদের বাড়িতে দুপুরবেলা তার এক চমক ঘুম এসেছিল।

চকিতে দেখেছিল সে একটা অবেলাবিলীন সুনীল সমুদ্রের স্বপ্ন। নগ্ন নিঃসঙ্গতায় সে স্নান করতে এসেছে। সেই সমুদ্রতটে সে ছাড়া আর কোনো প্রাণচিহ্ন নেই, নেই তৃণতরু। ক্রমে-ক্রমে সে পরিধানমুক্ত হতে লাগল, ঝাঁপ দিল সেই উত্তাল অতলতায়। মনে আছে তামসীর, হঠাৎ মনে হল, কোথায় আর একবিন্দু জল নেই, তৃষাদগ্ধ শুষ্ক মৃত্তিকার উপর সে শুয়ে আছে। সে কি মাটি, না, এই মর্মর মেঝে? মনে আছে একটা লজ্জা আর ক্ষুধা ধীরে-ধীরে গ্রাস করল তাকে। দেখল মাটির ঘাস সহসা দীর্ঘাকার হয়ে তাকে নিবিড় করে লুকিয়ে ফেলল। ঘাসের সে আরণ্য আশ্লেষ এখনো তামসীর স্পষ্ট মনে আছে। মনের গহন অন্ধকারের মধ্য থেকে হঠাৎ সে এখন চমকে উঠল। সে কি ঘাস না পুরুষস্পর্শ?

রাত্রির স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে সাইরেন বেজে উঠেছে। কর্কশকরুণ দীর্ঘ আর্তনাদ। এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল তামসী। নিজেকে আগে সম্বৃত করবে, না, খোলা জানলাগুলো বন্ধ করবে বুঝে উঠতে পারল না। হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বালাল। ঠুলি-পরা অস্পষ্ট আলো। তবু সেই আলাতে যা সে দেখলে তা ইহজীবনে কোনোদিন দেখেনি।

সামনেই আলমারিতে-বেঁধা দাঁড়া আয়না। সেই আয়নায় দেখল সে নিজেকে। পলকপতনহীন চোখে বিমোহিত হয়ে রইল!

তাব এত রূপ, এত লাবণ্যলেখন! নিজের কাছেই এতদিন সে অজ্ঞাতযৌবনা ছিল, ছিল গূঢ়চারিণী। ভাবতেও অবিশ্বাস্য লাগছে। ক'মাসে কেমন উজ্জ্বল স্বাস্থ্য হয়ে উঠেছে তার, নতোন্নত দেহ লীলাবলয়িত হয়ে উঠেছে। নবীন নীরদের শান্ত শ্যাম শ্রী পুঞ্জিত হয়ে উঠেছে। বিলম্বিত একবেণীটা কেমন অসঙ্গত লাগতে লাগল। ক্ষিপ্র আঙুলে বন্ধন খুলে কেশদামকে সে মুক্তি দিলে। চুল দীর্ঘ, ঘন,

দলিতাঞ্জনচিক্কণ হয়ে উঠেছে। কুসুমপেশল বাহু, স্তবকাকার বক্ষ, কটাক্ষগর্ভ চক্ষু—অনন্যলক্ষ হয়ে নিজেকে দেখতে লাগল তামসী। সে পুরুষার্থসাধনীভূতা, সে মনোনয়ননন্দিনী। পারবে সে তপস্যায় জয়ী হতে, পারবে। নিশ্চয় পারবে।

তখনো বেজে চলেছে সাইরেন। প্রমথেশের ঘর নিচে। সেটাই আশ্রয়-ঘর। প্রমথেশ তামসীর জন্যে উতলা হয়ে উঠেছেন। দোতলায় তার শোবার ঘরে নির্বারিত বিস্মৃতিতে সে ঘুমিয়ে আছে বুঝি। শক্তি নেই নিজে ডাকাডাকি করেন। সাধ্য নেই নিজে গিয়ে করাঘাত করেন দরজায়। লোকজন আর সব গেল কোথায়? মরবে নাকি মেয়েটা?

নির্জন পার্বত্য দ্বীপে ছিল তারা সেই অর্ধ-নারী-অর্ধ-বিহঙ্গী জাদুকরীর দল। শ্রুতিলোভন সঙ্গীতে অসতর্ক নাবিককে পথভ্রষ্ট করে আনত। গ্রীক পুরাণে তারাই তো সাইরেন। জীবনাভিনয়ে তামসীরও কি সেই পাঠ? আর ঐ আর্তনাদ কি শ্রবণসুখকর? চিত্তহারী?

দর্পণারূঢ় প্রতিবিম্বের দিকে আরেকবার তাকাল তামসী। এ কে? সে, না, সেই হাসিনী নার্স?

ত্যক্ত বসন মুহূর্তে আহরণ করে নিল তামসী। স্রস্তচুল দৃঢ় খোঁপায় বদ্ধ করলে। বদ্ধ করলে পরিকর, হ্রস্ব শীর্ণ অঞ্চলে। ছিটকিনি দিলে জানলায়। কৌতুকোৎসুক আলো-কে সমাধি দিলে অন্ধকারে। ক্ষিপ্র পায়ে নিচে নেমে গেল।

মৃত্যু আজ তাকে সমক্ষসংঘাতে আহ্বান করছে। স্পর্ধিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। সে আহ্বান মেনে নেবে তামসী। নামবে সে সেই দ্বন্দ্বযুদ্ধে। সে রজনীরঞ্জিনী বাসকসজ্জা রচনা করতে বসেনি।

হ্যাঁ, সে আসছে। সে কি শুধু মৃত্যু, ধ্বংস, মহাপ্রলয়? না, সে সর্ব্বজয়ী ভারতবর্ষের স্বাধীনতা?

নিচের ঘরে প্রমথেশের সন্নিহিত হয়ে বসল তামসী। একটা অদ্ভুত প্রতীক্ষায় দুজনেই মূক হয়ে আছে। সেই নির্বোধ নৈশ কাকটাও আর ডাকছে না।

পঁয়ত্রিশ

প্রমথেশ বললেন, কংগ্রেস এবার কি করবে?'

বিছানা ছেড়ে এখন তিনি নেমে এসে ইজিচেয়ারে বসতে পারছেন। পাশে টুলে বসে তামসী কি-একটা সেলাই করছে। কোনো উত্তর দিলেনা। নিচের ঠোঁটের উপর ছুঁচটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরে হাতের সেলাইটা নাড়তে-চাড়তে লাগল।

প্রশ্নটা প্রমথেশ আবার পুনরাবৃত্তি করলেন। আগ্রহশূন্যের মত তামসী উত্তর দিলে, 'আপনার কী মনে হয়?'

উত্তরটা প্রমথেশের মোটেই মনঃপূত হলনা। মনে হল তামসী যেন এ সব বিষয়ে উত্তাপ হারিয়ে উদাসীন হয়ে যাচ্ছে। ভালো করে দেখলেন তাকে তাকিয়ে। অনর্গল আলস্যে-আরামে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে, শিশিরগদ্গদ প্রাতঃস্ফুট ফুলের মত। যেন উৎসর্গ নেই, নিবেদন নেই, শুধু ফুলদানির উপচার। শুধু গৃহসজ্জার আভরণ। সংসারশৃঙ্খলায় বড় বেশি তার উল্লাস, তার উদ্ঘাটন এখন বিলাসে-বিন্যাসে। তাঁরই প্রশ্রয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই বলে কি সে ধার হারাবে, তাপ হারাবে, হয়ে উঠবে নিষ্প্রাণ পটপুত্তলি? জাপানের ত্বরিত আক্রমণের আতঙ্ক এখন কমে যাচ্ছে, বিতাড়িতের দল প্রতারিতের মত ফিরে আসছে ক্রমে-ক্রমে। প্রমথেশের স্ত্রী পর্যন্ত ফিরে এসেছেন। তবু মেয়েটার চলে যাবার চেষ্টা নেই। যেন এ সংসারের সেই কাণ্ডারী, তারই মৌরসী

মালিকানা। এর সংস্কার-শোধনের সেই অধিনায়িকা। যেন আর কেউ আসবে তারই প্রতীক্ষা করার বিনিশ্চিত স্বত্ব বর্তেছে তাতে। সেই আকাঙ্ক্ষার তীব্রতাটা প্রকট হয়ে উঠছে তার উৎসুক দৈহিকতায়। ছি ছি, ব্যক্তিত্বের দীপ্তির চেয়ে শোভাসর্ব্বস্ব দেহটাকেই সে বড় করে ধরবে? অধিপের আসার চাইতে আর কোনো বড় আশার সে পদশব্দ শুনবেনা?

প্রমথেশ বিরক্তিতে ঝাঁজিয়ে উঠলেন। 'আমার কী মনে হয় না-হয় তা জিজ্ঞাস্য নয়, কথা হচ্ছে তুমি কী মনে করছ? তোমার উত্তরে অন্তত তোমার আজকের মনের গড়নটা বোঝা যেত।'

অত্যন্ত রুষ্ট প্রশ্ন। তবু তামসীর মনে আঁচড় পড়ল না। ভাবখানা এই, মনের গড়ন যাই হোক, দেহের গড়ন মনোলোভন হচ্ছে। আপনার সংসার আর নামঞ্জুর করতে পারবেনা আমাকে। অনির্দেশ্য কাল প্রতিপালিত হব। আমি আপনার কুলবর্তিকা।

শান্ত, নিস্পৃহ গলায় তামসী বললে, 'ব্রিটিশেব যুদ্ধোদ্যমে আপ্রাণ সাহায্য করবে।'

সাহায্য করবে! প্রমথেশের ক্ষীণ, মরা রক্ত জ্বলে উঠল অকস্মাৎ। তুমি এই কথা বলছ? সাহায্য করবে যাতে সে যুদ্ধে জিতে আরো জেঁকে বসতে পারে বুকের উপর। যাতে আমাদের দাসত্বটা অবিনশ্বর হয়ে থাকে। যাতে সমস্ত উত্থান-আন্দোলন চিরদিনের মত স্তব্ধ হয়ে যায়। বা, চমৎকার বলেছ। বলবেই বা না কেন? নিজে আরাম-জড়িমায় আচ্ছন্ন হয়ে আছ, তাই আর আঘাতসংঘাতের কথা ভাবতে পারছ না। ভাবছ, সমস্ত দেশের লোকই বুঝি অমনি দুর্বল, সহিষ্ণু, নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে। কিন্তু দেশের মেজাজ তোমার মেজাজের মতন আজ আর ঠাণ্ডা নেই। দেশ আজ উপবাসী, তীক্ষ্ণনখর। তোমার আর কি, কদিন পরে দেখব বসে-বসে সূঁচলো নখে দিব্যি রঙ লাগাচ্ছ—

তামসী স্নিগ্ধমুখে হাসল। বললে, 'মন্দ লাভ হবে না। ইংরেজকে তাড়িয়ে জাপানীর পদানত হবেন। শৃঙ্খলের স্বত্ব আমাদের ঠিক কায়েমীই থাকবে। আমাদের চিরাচরিত সেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।'

না, তবু ইংরেজ বিতাড়িত হোক। দুশো বৎসরের এই কঙ্কাল-স্তূপভার অপসারিত হোক একবার। পরের কথা পরে দেখা যাবে। এখন, যখন সুযোগ আছে, পুরাতন বনেদী ব্যাধি থেকে তো ত্রাণ পাই, তারপর দেখা যাবে তরুণ রোগের আক্রমণ। দূরমূলপ্রসারী বিষবৃক্ষকে তো একবার উচ্ছেদ করি, তারপর দেখব এই মৃত্তিকায় কি করে আর বিদেশী গুল্মের জন্ম হতে পারে। আমরা এবার যে পরশু হাতে তুলে নেব তার আস্য বিস্তৃত, তার কাজ পাতন আর ছেদন—যে আছে তার ছেদন, আর যে আসছে তার পাতন—তোমার হাতের ঐ ফুল-তোলা ঠুনকো বিলাসী ছুঁচ নয়।

নিচের ঠোঁটের উপর ছুঁচ চেপে ধরে দুষ্টু মুখে আবার হাসল তামসী। বললে, 'তবু নীতির দিকটা তো বিচার করবেন। যুদ্ধে পক্ষের চেয়ে নীতিরই মূল্য বেশি। আপনিই বলুন, বেশি নয়? ইংরেজ গণতন্ত্রের জন্যে যুদ্ধ করছে, আর আপনার ঐ অক্ষশক্তি—'

ইজিচেয়ারের সামনে টেবিল নেই। থাকলে তার উপর প্রবল কিল মেরে উঠে বসতেন প্রমথেশ। নীতি! তুমি নীতির কথা বলছ? যে জাত পরভোজী, পরস্বাপহারী, পরপীড়ক, তার আবার নীতির বালাই কোথায়? একটা মহাদেশের মত দেশকে যে স্বার্থস্ফীতির জন্যে খর্ব, খঞ্জ, পঙ্গু করে রেখেছে, তার নীতির কথা বলার আগে জিহ্বা যেন অসাড় হয়ে যায়—

'যাই আপনার দুধ নিয়ে আসি গে।' সেলাইটা হাতে নিয়েই মন্থর পায়ে চলে গেল তামসী।

আরো অনেক কথা বলতে ইচ্ছা ছিল প্রমথেশের। অনেক উত্তেজিত বক্তৃতা। বলা হল না। বুকের মধ্যে আকুলি-বিকুলি করতে লাগল। ক্লান্তের মতো চেয়ারে পিঠ নামিয়ে দিয়ে ঘড়ির দিকে তাকালেন। হ্যাঁ, তাঁর পথ্য খাবার সময় হয়েছে বটে। কাঁটার দিকে ঠিক লক্ষ্য আছে তামসীর। থাকবে না কেন? সে যে মূর্তিমতী শৃংখলা, মূর্তিমতী নির্মিতি।

সেদিন তামসী দেখল প্রমথেশ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অথর্ব পায়ে হাঁটতে চেষ্টা করছেন আর টলছেন। ব্যগ্র হাত বাড়িয়ে তামসী ধরতে গেল তাঁকে। প্রমথেশ চেঁচিয়ে উঠলেন: 'না, ধোরো না আমাকে। তোমার সাহায্য ছাড়াই আমি উঠতে পাবব, হাঁটতে পারব—'

'কোথায় যাবেন আপনি?' তামসী ধবে ফেলল।

'গতবার ডাণ্ডি-যাত্রায় সমুদ্র পযন্ত গিয়েছিলাম। এবার সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করে চলে যাব।' তামসীব হাতের মধ্যে কাঁপতে লাগলেন প্রমথেশ।

'লাভের মধ্যে এই, পড়ে মরে যাবেন।' আস্তে-আস্তে তামসী আবার তাঁকে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন।

না, এবার আমাকে ছেড়ে দাও। আমি চিরকাল ঘাসের উপর দিয়ে হেঁটেছি, এবার কাঁটার উপর দিয়ে হাঁটব। শাল-দোশালা চড়িয়ে গা বাঁচিয়ে চলেছি, এবার গায়ে তুলে নেব রিক্ততার শরাঘাত। কী দিলাম দেশকে? একটা পুত্র দিয়েছিলাম, তাও শেষে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। দেশের ব্রতে যাতে অমনোনীত হতে পারে তার জন্যে তাকে অমানুষ করে তুললাম। যেমন তোমাকে এখন চেষ্টা করছি। তাই তোমাদের দিয়ে আশা নেই, আমিই যাব। নেতা হবে বলে অভিমান ছিল, এখন দেখতে পারছি সামান্য সৈনিক হবার মত সুখ নেই। তুমি কী করবে?

তামসী চুপ করে বসে রইল।

'তুমি খবরটা এখনো শোননি বুঝি ?'

'শুনেছি।'

'কী শুনেছ ? ইংরেজ খুব জিতছে ? আর তাইতেই খুব উল্লাস করছি ?'

'না। ওয়ার্কিং কমিটির সবাইকে গ্রেপ্তার করেছে গভর্নমেণ্ট। মায় মহাত্মাকে পর্যন্ত।'

'এর পরেও তুমি ভাবছ তুমি চুপ করে বসে থাকবে ?'

তামসী ঢোঁক গিলল। শান্ত স্বরে বললে, 'যারা চুপ করে বসে থাকে, তারাও হয়তো সেবা করে, সংগ্রাম করে।'

বিশ্বাস করি না। সেদিন নীতির কথা বলছিলে না ? যদি নীতি কিছু থাকে তবে আছে শুধু এই মন্ত্রে—কুইট ইণ্ডিয়া, ভারত ছাড়ো। কত বড় সত্য কত বড ধর্ম নিহিত আছে এই সূক্তে। বাক্য যদি কোথাও সার্থক, সমীচীন হয়ে থাকে, তবে এই কুইট ইণ্ডিয়ায়। এ ঘর-বাড়ি তোমার নয়, তোমাকে আমি ভাড়াটে বসাইনি, পাট্টা-পত্তন দিইনি, তুমি অনুমতিসূত্রে দখলকারও নও। তুমি অনধিকার প্রবেশকারী। তোমার স্বত্ব নেই কাণাকড়ির। তুমি গায়ের জোরে বেদখল করে আছ। তুমি ফৌজদারিতে দণ্ডনীয়, দেওয়ানিতে উচ্ছেদ-যোগ্য। পরের খাদ্যে দাঁত বসিয়ে তাকে আত্মসাৎ করতে চাও কোন ধর্মবলে ? গায়ের জোরের পিছনে তোমার যুক্তি কোথায় ? অতএব, হে নীতিমান, সরে পড। যদিও দরকার নেই, তবু তোমাকে যে একটা মৌখিক নোটিশ দিচ্ছি তা আমাদের ভদ্রতা মাত্র। যদি এই নোটিশে না চলে যাও, তবে উলটো গায়ের জোরে তোমাকে দেশছাড়া করব।

এই নীতির উত্তর দিক উদ্ধতেরা। এর উত্তর নেই। নতি স্বীকার

করে সংকুচিত হয়ে আস্তে-আস্তে সরে পড়তে হবে। এই নীতিতেই জয় হবে ভারতবর্ষের।

'কিন্তু গায়ের জোরে পারবেন ওদের সঙ্গে?'

'নিশ্চয় পারব। লক্ষ-লক্ষ হাত মেলাতে পারলে মুহূর্তে ধ্বসে পড়বে ওদের সাম্রাজ্যের বনিয়াদ। ভেঙে পড়বে যুদ্ধজয়ের আয়োজন-আস্ফালন—'

'কিন্তু ফল কী হবে?'

'ফলের কথা তারাই ভাবে যারা তোমার মত বসে-বসে বুলি কপচায়, শূন্যগর্ভ ভাবের উপরে মেকি বুদ্ধির পালিশ ঘসে। আর যারা মরে তারা তর্ক করে না, গবেষণা করে না, দগ্ধ মশাল আরেক জনের হাতে পৌছে দিয়ে নিজে জলন্ত আগুনে ঝাঁপ দেয়। অহেতুক হোক, দেশের জন্যে কোনো মৃত্যুই অসার্থক নয়। আর অগণন অহেতুক মৃত্যু ছাড়া দেশ কখনো বন্ধনমুক্ত হয়েছে?'

সন্ধ্যার অন্ধকারে চুপ করে ইজিচেয়ারে বসেছিলেন প্রমথেশ। দূরে কোথাও ট্র্যাম বা মিলিটারি লরি পুড়ছে। রাঙা হয়ে উঠেছে পশ্চিম দিকটা। তামসী কোথায়? দোতলায় তার নির্জন ঘরে বসে বোধহয় বৃষ্টির জন্যে প্রার্থনা করছে। হে পর্জন্যদেব, আগুন নিবিয়ে দাও। একটা ট্র্যাম বা বা লরি পুড়িয়ে কী হবে?

পশ্চিম আকাশটা আস্তে-আস্তে ম্লান হতে-হতে মুছে গেল। দরজার বাইরে পরদার আড়ালে বারান্দায় কে যেন মৃদু পায়ে পাইচারি করছে। কী দরকারে দেখা করতে এসেছে বুঝি। দ্বিধা করছে কাউকে ডাকবে কি ডাকবে না।

'কে?' প্রমথেশই সম্বোধন করলেন।

'আমি।' আগন্তুক ভিতরে প্রবেশ করল।

'এ কে, অধিপ ?' প্রমথেশ সবল হাতে নিজের বুক চেপে ধরলেন : 'ফিরে এলি ?' উঠে ধরতে গেলেন ছেলেকে : 'আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা থাকলে সব জিনিসই তা হলে ফিরে আসে। তেমনি তবে ফিরে আসিবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা।'

'আসবে। আপনি অস্থির হবেন না।' অধিপ প্রমথেশকে বসিয়ে দিয়ে নিজে বসল একটা চেয়ার টেনে। বললে, 'সত্যি ফিরে এসেছি বাবা।'

অদ্ভুত চোখে তাকালেন প্রমথেশ। অধিপের এ কি সাজগোজ। যেন কোন আগুনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছে। ঝলসে গিয়েছে সর্বাঙ্গ। উন্মাদ জটিল চুল, দুই চোখে আতঙ্কপীড়িত অনিদ্রা। পরনে কালিঝুলি-মাখা ট্রাউজার্স। গায়ে হাতা-গুটোনো ছেঁড়া শার্ট। যেন কতদিন স্নানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই, নেই নিশ্চিন্ত শয্যার সঙ্গে। শরীর শুকিয়ে গিয়েছে আমসির মত। একটা দয়াহীন রুক্ষতা সমস্ত চেহারার উপরে কঠিন ছাপ ফেলেছে। মৃত্যুর জ্বালা দিয়ে ঢেকেছে যেন বাকি জীবনের আয়ুষ্কাল।

তবু, যাক, ফিরে এসেছে অধিপ। আয়। এবার তোকে নির্মল ঘুম দেব, দেব মেদুর নিভৃতি, শান্তশীতল গৃহচ্ছায়া। তুই তো জানিস না তোর জন্যে কী ধন আমি আহরণ করে রেখেছি। তার বিস্ময়-উজ্জ্বল উপস্থিতি দিয়ে তোর ঘর সে পূর্ণ করবে, স্নেহার্দ্র স্পর্শে মুছে নেবে তোর সমস্ত ক্লেদক্লান্তি। তুই জানিস না সে করুণার ধারাঙ্কুর।

'ফিরে এসেছি বাবা সেই প্রথম যাত্রাবিন্দুতে। যেখান থেকে আরম্ভ করেছিলুম, সেইখানে। বৃত্ত সম্পূর্ণ করেছি এতদিনে। এবার আর বেঁকবনা, ঘুরবনা, লক্ষ্যস্থলের দিকে ঠিক সোজা এগিয়ে যাব—তীরের মত, বুলেটের মত।'

প্রমথেশ অধিপের দুই হাত চেপে ধরলেন। ভয়ে না উৎসাহে কে বলবে।

'হ্যাঁ বাবা, আবার আমি কর্মক্রিয় বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছি। অজেয় আগুনে শোধন করে নিয়েছি নিজেকে। এই দেখুন।' পেণ্টালুনের কোন অদৃশ্য গহ্বর থেকে সে রিভলবার বার করলে। বললে, 'আপাতত কিছু টাকা চাই আপনার কাছে।'

দীপ্ত মুখে প্রমথেশ জিগগেস করলেন, 'কত?'

'পাঁচ হাজার।'

'কী হবে টাকা দিয়ে? আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ হবে?'

এবার বলদৃপ্ত রিক্ত হাতের বিপ্লব। জনকয়েকের বিপ্লব নয়, জনতার বিপ্লব। এবার আগ্নেয়াস্ত্র চেয়ে-চিন্তে চুরি করে জোগাড় করতে হবেনা, এবার হামলা দিয়ে লক্ষ হাতে ছিঁড়ে-কেড়ে ছিনিয়ে নেব ওদের থেকে। এবার আমাদের আসল অস্ত্র দেয়াশলাইর শীর্ণ কাঠির ক্ষীণ বারুদবিন্দু। আর ঐ এক বহ্নিকণা থেকেই অখণ্ড অগ্নিকাণ্ড। তবু টাকার প্রয়োজন আছে নানা কারণে—

'শুধু একটা ট্র্যাম বা লরি পুড়িয়ে কি হবে?' প্রমথেশের কণ্ঠে যেন আর কার প্রশ্ন অতর্কিতে ধ্বনিত হয়ে উঠল।

দুশো বছরের পত্রপুষ্পহীন মৃত অরণ্যে আগুন লেগেছে এবার। শুধু শাখা পুড়ছেনা, পুড়ছে দণ্ড-কাণ্ড, ভিত-বনেদ। যে যা পারছে তাই পোড়াচ্ছে। ভেঙে ফেলছে যত যুদ্ধকরণের আয়োজন। শুধু ট্র্যাম-লরি নয়, পুড়ছে রেলস্টেশন, পুড়ছে ব্রিজ, পুড়ছে আর্সেনেল। গণতন্ত্রের নামে যুদ্ধ হচ্ছে অথচ ভারতবর্ষ থাকবে দাসত্বের ভারবাহী হয়ে—এ উপহাসের মুখে নুড়ো জ্বেলে দিয়েছে—

'কিন্তু তোমরা তা পারবে?'

'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। মরতে তো পারব। অপমানের প্রহারে সমস্ত দেশ যদি মরিয়া হয়ে জেগে ওঠে একবার—'

'কিন্তু আমার মনে হয় এ আন্দোলন ওরা সহজেই বন্ধ করে দিতে পারবে। যখন বলপরীক্ষার প্রশ্ন, তখন সন্দেহ কি, ওদের বল বেশি।'

'আমাদের বলি বেশি। জানিনা বন্ধ করে দিতে পারবে কিনা। বন্ধ করতে পারলেও হাড়ে-হাড়ে বুঝবে এতদিনে, আমরা রাগতে পারি, আর রাগলে আমাদের ভঙ্গিটা কি রকম দেখায়। আগে-আগে আবেদন করেছি, পরে করেছি অভিমান, এখন সবল সাবালকের মত ক্রুদ্ধ হতে শিখেছি। এবার একবার আমাদের ক্রোধের উত্তাপটা ওরা দেখুক। দেখুক আমাদের মাত্রা উঠতে পারে কতদূর। এবার হাঁটতে শিখেছি, কদিন পরে ছুটতে শিখব, হামাগুড়িতে আর ফিরে যাওয়া নেই। দিন, দেরি করবার সময় নেই, টাকাটা বার করুন শিগগির।' দুর্বৃত্তের ভঙ্গিতে হাত বাড়াল অধিপ।

দেব, নিশ্চয়ই দেব। আরেকদিন এমনি পাঁচ হাজার টাকাই চেয়েছিলি আমার কাছে। দিইনি। সেদিন আর আজ! সেদিন চেয়েছিলি ইলেকশানে দাঁড়াতে, তাঁর মানে, নিজে দাঁড়াতে। আজ চাইছিস দেশকে দাঁড় করাবার জন্যে। প্রথম অস্ত্রপ্রহারের উদ্যতিতে। হাসিমুখে খুলে দেব আলমারি। লুট করতে হবেনা, ডাক করতে হবেনা বিভলভার।

কিন্তু অত টাকা কি মজুত আছে? হাজার দুই হতে পারে মেরে-কেটে। তার চেয়ে, আমি বলি কি, এক কাজ কর। এই রাতটা এখানে থাক্। খা, ঘুমো। কাল সকালে তোকে চেক দেব পুরো টাকার। ভাঙিয়ে নিবি ব্যাঙ্ক থেকে। সেই ভাল হবেনা? একটি রাত এক পলকে উড়ে যাবে।

রাতের অনির্দেশ্য অন্ধকার যেন ভয় দেখাল অধিপকে। সে উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। বললে, 'না, রাত কাটাবার সময় নেই। আমাকে চলে যেতে হবে এক্ষুনি। দিন, চাবি দিন। যা আছে তাই এখন নিয়ে যাই।'

স্নেহাভিষিক্ত চোখে প্রমথেশ তাকালেন অধিপের দিকে। দেব, সব দেব, কিন্তু চলে যাবি কেন? কোথায় যাবি? কী হবে ঐ প্রমত্ত প্রলযে ঝাঁপ দিযে? তাব চেয়ে, জীবনে সত্যিকাবেব বিশ্রাম নে এবাব। অনেক ঘুবেছিস উদ্ভ্রান্তেব মত, এবাব শান্তিব নিকুঞ্জে চলে আয়, চলে আয আনন্দেব বন্দবে। তোব জন্যে আমি গৃহ রেখেছি, রেখেছি অনিন্দ্যাঙ্গী গৃহলক্ষ্মী। অন্ধকাব আকাশেব অব্যর্থ শুকতাবা। তোব উৎসুক চোখেব স্থিব আশ্রয। তোব অভীষ্টপূর্তি। রেখেছি সৌভাগ্যবর্ধন ভবিষ্যৎ, কুসুমকোমল জীবযাত্রা। কোথায যাবি ঐ অগ্নিশিখাব ভস্মশেষে?

একটা পুত্র দিয়েছিলাম দেশকে, তাও আজ ফিবিযে নেব অক্ষণে? ধর্মভ্রষ্ট করব? অগ্নিহোত্রীব যজ্ঞাগ্নি নির্বাপিত কবব? আবাব?

মুখ ফুটে কিছুই বলতে পাবলেন না প্রমথেশ।

অধিপ আবাব তাড়া দিল। চাবি দিন শিগগিব। দেবি কবে ভাল কবছেন না।

'দাঁড়া, চাবি কি আমাব কাছে আছে? চাবি আছে তামসী কাছে। দাঁড়া, তাকে ডাকি।' বলে প্রমথেশ কলিং-বেলে আঙুলেব বাড়ি মারলেন।

কথাটার অর্থ যেন ভাল করে বুঝতে পারল না অধিপ। একটা প্রহেলিকার মত মনে হল। রিভলভাবটা উন্মুখ কবে বাখল।

ফিরে যাবে অধিপ। এসেছে কিন্তু ফিবে যাবে। তৃষ্ণাব জল

কণ্ঠের উপকণ্ঠে এসে শুকিয়ে যাবে। মেয়েটার মুখের দিকে আর কি করে তাকাবেন প্রমথেশ? তার এতদিনের প্রতীক্ষা এতদিনের প্রস্ফুটন নিষ্ফল পরিহাসে পরিণত হল। এর পর এই শূন্য পুরীতে মেয়েটাকে তিনি কিসের আশ্বাস দেবেন? কিসের প্রলোভন?

ঘণ্টায় আবার ঘা দিলেন প্রমথেশ। মেয়েটা দেরি করছে। সাজগোজ করছে নাকি?

হ্যাঁ, একটু যেন ফিটফাট হয়েই এসেছে তামসী। একটু যেন প্রস্তুত।

'দেখছ অধিপ এসেছে।'

'দেখেছি।'

'পাঁচ হাজার টাকা চায়। নগদ কত আছে?'

'মজুত দু হাজার। আর চলতি সংসাব খরচের খাতে—'

'দু হাজারই ওকে দিয়ে দাও। পাঁচ হাজারই আজ দিয়ে দিতাম। আদ্ধেকেরও বেশি বাকি থাকল। মরবার আগে বোধ হয় আর শোধ কবতে পারবনা। যদি আবার কোনোদিন ও এ বাড়িতে আসে—'

চাবি দিয়ে আলমারি খুলল তামসী। টাকাটা লম্বা একটা খামের মধ্যে মোড়া ছিল। বার করে নিয়ে ফের আলমারি বন্ধ করলে। খামটা বাড়িয়ে ধরল অধিপের দিকে।

থাবা মেরে অধিপ খামটা ছিনিয়ে নিল। যেন তার প্রয়োজন ছিল। কে টাকাটা দিচ্ছে, কি করেই বা দিচ্ছে, যেন তা দেখবার কোনই প্রয়োজন নেই। মনে-মনে প্রমথেশ বোধহয় অভাবিতেরই আকাঙ্ক্ষা করছিলেন। ভাবছিলেন বিস্ময়ের সূর্যোদয়ে বৈরাগ্যের তুষার হয়তো গলে যাবে মুহূর্তে। হতাশ হলেন সম্পূর্ণ। অধিপের ভঙ্গিতে ক্ষীণতম দ্বিধা বা জিজ্ঞাসা ফুটলনা। না এতটুকু কৌতূহল।

যেন সমস্ত বাধা সমস্ত মিনতি সমস্ত আহ্বান-আমন্ত্রণ সে সবলে উপেক্ষা করে বেরিয়ে যাবে এক্ষুনি।

'দাঁড়ান, আমিও যাব।'

দরজার পরদার প্রান্তটা অধিপের হাতের মুঠোয় আড়ষ্ট হয়ে রইল। যেন চিনেও চেনেনা এমনি মূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে অধিপ বলল, 'তুমি ?'

'আমি। যার জন্যে এতদিন একমনে প্রতীক্ষা করছিলাম তার দেখা পেয়ে তাকে ছাড়তে পারিনা।' তামসীর মুখে ও স্বরে সরল সত্যের স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্য ফুটে উঠল।

'তুমি—তুমি কোথায় যাবে ?'

'জানিনা। বিপ্লবের পথে যেখানে গিয়ে পৌঁছানো যায় হয়তো সেইখানে।' তামসীর সমস্ত ভঙ্গিতে সহজ প্রতীতি। স্বয়ংসিদ্ধ সত্যের স্থিরতা।

অধিপ অন্তরে-অন্তরে মথিত হতে লাগল। এমন নিশ্চয়-নিশ্চল সত্যকে কি বলে ফেরাবে, কি বলে প্রতিবোধ করবে ভেবে পেলনা। তবু দ্বন্দ্বাতীত হতে পারলনা। বললে, 'এখন, এই রাত, এখুনি যাবে কি ? আরেক দিন—আরেক সময়—'

'এখুনি, এই মুহূর্তে। দেখুন আমি তৈরি।'

দ্রুত দৃষ্টিতে অধিপ তামসীকে একবার দেখল আপাদমস্তক। চুল থেকে শাড়ির শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সে দৃঢ়ীকৃত। পায়ে স্ট্র্যাপ-বাঁধা জুতো আঁটা।

তামসী হাসল। বললে, 'গুণ-লাগা ধনুকের মত টান হয়ে আছি। সঙ্গে না নিন, পিছনে যাব। সময় কি বারে-বারে আসে ? ভারতবর্ষের পক্ষেও এই একবার হয়তো সময় এসেছে।'

অকস্মাৎ দশদিক আলোকিত হয়ে উঠল। যজ্ঞের জন্যে সমিধ সংগ্রহ করছেনা অধিপ? এই তো সে পেয়ে গিয়েছে নায়িকা—চণ্ডনায়িকা। ধূমাবতী, তামসীশক্তিস্বরূপিনী।

উদ্বেলতাকে গোপন কবল অধিপ। বললে, 'এসো।'

তামসী এগিযে গেল প্রমথেশের কাছে। স্নেহকরুণ চোখে তাকাল তাঁব চোখেব দিকে। বললে, 'যাবনা আমি? যাওয়া উচিত নয আমার? এই ঘবে বন্ধ হযে পড়ে থাকব? এই ঘব কি আমাব ঘব? এই সংসার কি আমাব সংসার? দেশ কি আমার দেশ নয়? বলুন, আপনি কি বাবণ কববেন? কিসেব জন্যে বাবণ কববেন? ছেলের কাছে আপনাব তিনহাজাব টাকাব ঋণ থেকে গেল ভাবছিলেন, আমাকে দিযে তা শোধ হযে যাবে না?'

প্রমথেশের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হযে এল। ব্যাকুল দুই হাত বাড়িয়ে দিযে তামসীব দুই হাত গ্রহণ কবে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। একটি নীড়ের স্বপ্ন দেখছিলেন, বিবামবিহীন বায়ুমণ্ডলেব নয। তাই এক কথায ছেড়ে দিতে বুকেব ভিতবটা টনটন কবে ওঠে বৈকি। তবু ছেড়ে না দেযাব কোন অর্থ হযনা। হযতো ছেড়ে দেযাটাই বুদ্ধিমানেব কাজ হবে। হযতো বিবত করতে পাববে ঐ বন্ধনহীনকে। নির্বিষ, নির্বিঘ্ন কবতে পারবে। উজান ঠেলে-ঠেলে নিযে আসতে পারবে নিশ্চিন্ত তীবের আশ্রযে। বন্যাশেষে শ্যামললাবণ্য ফসলের পর্যাপ্তিতে। এতদিন অকারণ অপেক্ষা কবেনি তামসী। রূপে-বসে বরবর্ণিনী হয়ে উঠেছে। এত অজস্রতা নিরর্থক হবে না। জানি যাচ্ছে ধ্বংসেব নান্দীপাঠে। ঐ ধ্বংসের থেকেই আনন্দেব দেহধাবণ।

যাচ্ছে শিবসংযুক্তা মহামায়া। অপর্ণা যাচ্ছে বাসরপর্ণশয্যায়।

নিজের দুই হাতের ভাবে যেন আব কারু ভার প্রমথেশ তামসীর

হাতে সঁপে দিলেন। বললেন, 'যাও। কোন ভয় করবনা। তোমার তপস্যার সিদ্ধি হোক এই শুধু আশীর্ব্বাদ করব।'

পা ছুঁয়ে প্রণাম করল তামসী। প্রীতমুখে হেসে বললে, 'এর চেয়ে আর বড় কি আশীর্ব্বাদ আছে জানিনা। কিন্তু কি যে তপস্যা, কিসে বা যে তার সিদ্ধি তাই বা কে জানে।'

অসম্পৃক্তের মত চলে গেল। অনায়াসে মিলিয়ে গেল বিরাট বেনামী অন্ধকারে।

রাস্তায় একটা গাড়ির ঝকঝক শুনলেন প্রমথেশ। কিন্তু, ওকি ওদের মিলিত হাসির উচ্ছল কলধ্বনি ?

টেবিলের উপর চাবির গোছাটা রেখে গিয়েছে তামসী। তার দিকে প্রমথেশ চেয়ে রইলেন শূন্যচোখে। মনে হল চাবি যেন বিকল হয়ে গিয়েছে। আর ঘুরবেনা। খুলবেনা আলমারি। মিশ খাবেনা কোনদিন। ঋণ শোধ হয়ে গিয়েছে তাঁর।

যে মেয়েটা অলক্ষিতে এসেছিল, আবার চলে গেল অতর্কিতে, সে কি মনোহারিণী বংশীধ্বনি, না, ঝঙ্কারবাহিনী ঝঞ্ঝা ?

ছত্রিশ

টাকা-শুদ্ধ্ তামসীর প্রসারিত হাত চোখের সামনে এখনো স্পষ্ট আঁকা আছে। সতেজ, সমর্থ, আবার সমর্পণের ব্যগ্রতায় সুকোমল। ছোঁ মেরে টাকাটা ছিনিয়ে নিল অধিপ। হয়তো পর মুহূর্তেই সে-হাত প্রত্যাখ্যানে কঠোর হয়ে উঠবে। কে জানে!

সে-হাতখানার দিকে এখন একবার তাকাল কৌতূহলীর মত। তার বাঁ জানুর কাছে দুর্বলের মত বিশ্রাম করছে। মোটরের ভিতরে পাশাপাশি বসেছে দুজনে, তামসীর ডাইনে অধিপ। বসেছে রহস্যধূসর নিস্তব্ধতায়। আরো একদিন যেন এমনি বসেছিল তারা। মনে তীক্ষ্ণ ইচ্ছা থাকলেও তামসীর হাত সে সেদিন ছুঁতে পারেনি। সেদিন সে দেখেছিল বুঝি কামনার চোখে, মিত্রতার চোখে নয়। সেদিন সে ছিল উচ্ছৃঙ্খলতার, বিপ্লবের নয়। নয় নির্মল নির্মুক্তির। তাই সেদিন তার সাহস হয়নি, প্রতিরোধের ভয় ছিল। আজ তার সাহসের অন্ত নেই, কোনো প্রত্যাঘাতকেই সে ভয় করেনা।

তামসীর দক্ষিণ হাত অধিপ তার বাঁ হাতের মুঠায় সম্পূর্ণ করে গ্রহণ করলে। কোনো মতান্তর নেই, অবিশ্বাস নেই। নিমগ্নের মত আরো নিবিড় করে গ্রহণ করলে সেই স্পর্শের আস্বাদান। যেমনটি ভেবেছিল তেমন যেন লাগল না। কী ভেবেছিল নিজেকে জিগগেস করল অধিপ। কী ভেবেছিল তাই বা সে স্পষ্ট জানে না কি? তবু, এ হাত যেন বড়

বেশি আর্দ্র, কাঠিন্যশূন্য। এ হাত যেন পরিচর্যার হাত, গৃহস্থজনের হাত, পাপস্খালনের হাত। অনেকক্ষণ ছুঁয়ে থাকতে-থাকতে মনে হয়না কিছু ছুঁয়ে আছে। যেন গলে গেছে, নিবে গেছে, ফুরিয়ে গেছে। তামসীর মুখের দিকে তাকাল অধিপ। চোখ বোঁজা, নীরব প্রার্থনায় সমাহিত। যেন মৃত চাঁদ সূর্যের কাছে তাপ খুঁজছে, তেজ খুঁজছে। আত্মদীপ্তিহীন অক্ষম চাঁদ। প্রত্যাশায় মলিন, অকর্মক।

'তোমার সঙ্গে যে আবার দেখা হবে ভাবতে পারিনি।' হাত ছেড়ে দিল অধিপ।

'আমি জানতাম। বিশ্বাস করতাম।' কালো চোখ আলো করে তামসী বললে। 'সকল জিনিসের বড় হচ্ছে বিশ্বাস, অনাসক্তি।'

'যে ভাবে পালিয়ে গেলে ভারতেও পারিনি আবার ফিরে আসতে পার কোনোদিন। এমন ভাবে, এই শারীরিক সত্যে।'

'যে পালিয়ে যায় সে আবার ফিরে আসে। একভাবে না একভাবে ঠিক ফিরে আসে।' তামসী বললে। খুব দূর শোনালনা তার কণ্ঠস্বর? কিন্তু সেই সঙ্গে সে কি অতর্কিতে আরো সরে এলনা অধিপের গা ঘেঁসে? তার চূর্ণালক কি অধিপের মুখের উপর উড়ে পড়লনা?

যেন অধিপই ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে নতুন রূপ নিয়ে। নতুন প্রার্থিতের চেহারায়।

অধিপই প্রত্যাগত। তার আদিম আকাঙ্ক্ষার নবীন প্রতিনিধি।

চঞ্চল হলনা অধিপ। তামসীর করতল আবার সে তুলে নিলে। মুকুলমৃদুল করতল।

এই হাতে কি সে বন্দুক ধরতে পারবে? আগুন লাগাতে পারবে? ছুরি বসাতে পারবে শত্রুর মর্মমূলে? ·

'কিন্তু আমার সঙ্গে কোথায় তুমি চলেছ?'

অসীম ওদাস্যে হাসল তামসী। নিমেষমাত্র দেখল, অচেনা ড্রাইভার অচেনা রাস্তা দিয়ে মোটর চালিয়ে চলেছে। বললে, 'তা কে জানে। আপনার সঙ্গে যাচ্ছি এই তো আমার যথেষ্ট।'

'আমি তো আর সেই আগের মত নেই।'

'কেউ থাকে না। আমিই বা কি আছি নাকি?'

'আমি চলেছি এখন ধ্বংসের পথে, মৃত্যুর পথে—'

'সে তো রাজপথ। প্রশস্ত, প্রশংসিত। আর আমি চলেছি যত অন্ধ অলি-গলি। ক্ষুধার পথ, পাপের পথ, প্রবঞ্চনার পথ—'

কেন পারবে না? খুব পারবে। সংহার করতে না পারুক, সংগঠন করতে পারবে। মিলিটারি লরিতে আগুন লাগাতে না পারুক, যারা আগুন লাগাবে, পূর্বাহ্ণে তাদের রক্তে আগুন ধরিয়ে দিতে পারবে। এই তো সেই ক্ষীণজীবনী মেয়ে, তবে একদিন তারই তিরোভাবের অন্ধকারে অধিপ তার পুরাতন পুরুষত্বকে আবিষ্কার করলে কি করে? ঐ মেয়েটাই কি তাকে একমুহূর্তে সুস্থ ও সচেতন করে দিয়ে গেল না? জাগিয়ে দিয়ে গেল না তার তেজোবল? মূল্যহীন, অর্থহীন মনে করে তাকে সে সেদিন যে অপমান করে গেল সে-অপমানে সে কি নতুন করে নিজের অধঃপতনটা উপলব্ধি করলে না? আর, নিজেকে তুলতে গিয়েই মনে হলনা দেশকে তুলে ধরি? দেশের মুক্তিতে নিজেকে মূল্যবান করি?

তবে কি করে বল, মেয়েটা পারবেনা—মেয়েটা অক্ষম, ভঙ্গুর!

ভিড়ের মধ্যে থেকে পথ চিনে চিনে আবার এসে যখন হাত ধরেছে তখন তাকে ঠিক টেনে নিয়ে যাবে অধিপ। কাজে লাগাবে। কোথায় ছিল এতদিন, কেনই বা ফিরে এল, প্রশ্ন করবেনা, তর্ক করবে না। সে ঘৃত না ক্লেদ, কি এসে যায়! 'অগ্নিদেব সমস্ত আহুতি গ্রহণ করবেন।

মোটরটা থামল এক গলির মুখে। ওদের দুজনকে নামিয়ে দিয়ে

তক্ষুনি অদৃশ্য হয়ে গেল। অধিপ বললে, এক বন্ধুর মোটর। আগের বার দেখেছি, পুলিশকে এড়াবার জন্য যখন কোথাও সাহায্য নিতে গিয়েছি, সবাই ভয় পেয়েছে, ভেবেছে অন্যায় করছি সাহায্য চেয়ে। এবার একেবারে উলটো। সবাই কিছু-না-কিছু করতে চায়, নিজে না করতে পারলেও পরোক্ষ সাহায্য করতে চায়, করাটাই ন্যায় বলে স্বীকার করে। সব দেশ যুদ্ধ করছে, আর আমি আমার দেশের জন্যে যুদ্ধ করবনা? মেজাজে এই ঝাঁজ লেগে গিয়েছে আজ। তাই টাকা পাচ্ছি হাত পাততেই, সৈন্য পাচ্ছি হাতছানি না দিতেই। দরকার হলে মোটরটাও আবার পাওয়া যাবে।

সহরের কোনো একটা নির্জন প্রান্তদেশ। নোংরা গলিটাতেই তারা ঢুকল। দুপাশে ঝেঁপে-পড়া নিচু খোলার চালে মুমূর্ষু বস্তি। সার দিয়ে দাঁড়ানো রোগ গ্লানি ক্লান্তি মূর্খতা পীড়ন শোষণ বঞ্চনা বেদনার প্রতিচ্ছায়া। প্রতিচ্ছায়া কেন, প্রত্যক্ষ ইতিহাস।

'এইখানে?' তামসীর স্বরে বিস্ময় ফুটে উঠল।

'এইখানে একটা ঘর নিয়ে আছি। আত্মগোপন করছি। কেন, আপত্তি আছে?'

'আপত্তি? এই তো আমাদের বিষয়, আমাদের অবলম্বন। এই নিপীড়িত জনতা। দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে এরাই তো অগ্রনায়ক। আর এদের জন্যেই তো সংগ্রাম।'

অন্ধকারে তামসীর মুখাভাস বোঝা গেলনা। তবু তার কথার দ্যুতি অনুভব করা গেল স্পষ্ট।

এইখানেই তো একদিন আপনাকে নিয়ে এসেছিলাম। মনে নেই? এই নিম্ন-নিমজ্জিত জনগণের সমাজে। দেখতে চেয়েছিলাম কত কঠিন এদের বন্ধন, কত গভীর এদের লাঞ্ছনা। সঙ্গে-সঙ্গে এও দেখতে

চেয়েছিলাম কোথায় আমাদের সত্যিকারের শক্তি, সত্যিকারের সম্ভাবনা। এ জায়গাটা তো তাই আমাদের সাময়িক ঘাঁটি নয়, এ আমাদের রাজধানী, আমাদের তীর্থক্ষেত্র।

সেদিন আমাদের ওরা চিনতে পারেনি, বুঝতে পারেনি। সন্দেহ করেছে, অবিশ্বাস করেছে। কেনই বা করবে না শুনি? সেদিন আমাদের গায়ে স্বার্থপরতার ধুলো লেগে ছিল। আমরা এসেছিলাম নিজের কাজে, ওদের কাজে নয়। ওদের কাজ দিয়ে নিজেদের কাজ বাগাতে। ওদের জোরে নিজেদের জোর দেখাতে। তাই জারিজুরি টেঁকেনি বেশিক্ষণ। ওদের লোকই মাথায় লাঠি মারল। বলল, বাইরের লোক দূরে থাকো। তোমাদের চরকার তেল এখানে খুঁজতে এসো না। যদি কোনদিন আমাদেরই একজন হতে পারো, প্রভুত্ব বা প্রাধান্য করবার জন্যে নয়, পরিচর্যা করবার জন্যে, যদি মিশে যেতে পারো এক জলের সমতলে, এক শিলার সংহতিতে, তবে সেদিন চিনব তোমাদের, ডাকব, হাতে হাত মেলাব। বুঝলে হে উপরতলার লোক, উপর-পড়া ফোঁপর-দালাল?

'আজ কি সেই দিন এসেছে?' প্রশ্ন করল তামসী।

'এসেছে।' ঘরে যাবার চিলতে গলির ফাঁকটা ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, তামসীকে অধিপ বাধা দিল হাত ধরে।

'আপনার সংগ্রামের সৈনিক এদের থেকেও সংগ্রহ করছেন তা হলে?'

'নিশ্চয়ই। সবাইর থেকে সংগ্রহ করছি। জানোনা, এ টোট্যাল ওয়ার—সর্বব্যাপী, সর্বগ্রাসী যুদ্ধ। আমাদেরই তাই সর্বনাশের সংগ্রাম। এই সংগ্রামে তাই সমান নিমন্ত্রণ সকলের। যে যেটুকু পারো, যার যতটুকু ক্ষেত্র, ধ্বংস করো, প্রচণ্ডাকার প্রতিবাদ জানাও।' হাতের মুঠে

যেন উত্তাপের বদলে দৃঢ়তা ফুটে ওঠে, অধিপ তেমনি জোরে হাতের চাপ দিলে।

ঘরের মধ্যে চলে এসেছে দুজনে। ছোট ঘর, দম আটকে স্তম্ভিত হয়ে থাকার মত। এক পাশে একটা দড়ির খাটিয়া, তার উপরে নামমাত্র বিছানা। দড়িতে টাঙানো কটা অনাদৃত কাপড়-জামা। একটা পিঠ-ভাঙা চেয়ারের উপর হেরিকেন জলছে। মাটির উপর একটা চট বিছানো—কতক্ষণ আগে কারা আড্ডা দিয়ে গেছে তারই চিহ্ন ছড়ানো চারদিকে। সিগারেটের টুকরো, চায়ের খুরি, খাবারের ঠোঙা। পলাতক ছন্নছাড়ার পরিবেশ।

হেরিকেনটা নামিয়ে রেখে চেয়ারে বসতে দিল তামসীকে। অধিপ নিজে বসল খাটিয়ার উপর। অন্তরঙ্গতা নিয়ে এল। নিয়ে এল ষড়যন্ত্রীর নিভৃতি।

এরাই তো আমাদের আসল সৈনিক, আমাদের অক্ষৌহিণী। যেখানে এরা কাজ করছে সেটা যুদ্ধোপকরণ নির্মাণের কারখানা। এরা ধর্মঘট করবে। যুদ্ধোদ্যমে আঘাত হানবে। আর, এই ধর্মঘট করিয়েই উত্তাপ-মান উঁচু করে তুলব। ও-পক্ষেরও মেজাজ নিশ্চয়ই তিরিক্ষি হয়ে উঠবে। লাগবে সংঘর্ষ। আর এই সংঘর্ষ থেকেই স্ফুলিঙ্গ। আমি—তুমি—আরো অসংখ্য—ঠিকমত ফুঁ দেব। আগুন লেলিহান হয়ে উঠবে। আর সেই আগুনে ভস্ম হয়ে যাবে কারখানা। এমনি করে, দিকে-দিকে—

শরীরের মধ্যে হঠাৎ একটা অস্থিরতা অনুভব করল তামসী। বললে, 'আজো ওরা আমাদের জন্যে লড়বে? ওদের নিজেদের জন্যে লড়বেনা?'

'ওদের নিজেদের জন্যেই তো লড়ছে। সমস্ত দেশের জন্যে লড়ছে। ওরা-আমরা কি আজ আর আলাদা নাকি? যে যেদিক থেকে পারছি

ইঁদুর তাড়াচ্ছি। যে ইঁদুর ধানচাল খেয়ে যাচ্ছে, সৎ গৃহস্থের যা কিছু কাপড়-চোপড় বিছানা-বালিশ সব দাঁতের সুখে কেটে কুটিকুটি করে দিচ্ছে। যত শাদা ইঁদুর—'

'কিন্তু আপনার কালো ইঁদুরের দল তো থেকে যাচ্ছে।' তামসী দুই চোখে একটি স্থির শান্ত দৃষ্টি প্রসারিত করে দিল: 'তাদের রংই শুধু আলাদা কিন্তু চরিত্র এক। সেই দাঁত, সেই বিষ, সেই ধূর্ততা। সেই কালো ইঁদুর তাড়াবেন না? এদের যখন ডাকছেন এরা ইঁদুরের বংশ নিয়ে তারতম্য করবে কেন—শাদা হোক, কালো হোক, সব নেংটি ইঁদুরের বিরুদ্ধেই এদের অভিযান।'

শোনো। দুশো বছরের পাপ কি একদিনে মুছে যেতে পারে? বন্যবৃক্ষ যখন মুক্ত রৌদ্রকে অবরোধ করে দাঁড়ায়, তখন তাকে অপসারণ করবার জন্যে তুমি হাতে কুঠার তুলে নাও। আগে শাখা-প্রশাখা কাটো, যত ছায়াপ্রসারী পত্রের আচ্ছাদন। যত তাড়াতাড়ি পারো রোদ আসতে দাও, আসতে দাও আকাশের আশীর্বাদ। পরে ক্রমে-ক্রমে দণ্ডে-কাণ্ডে কোপ মারো। আস্তে-আস্তে মুক্তির বিস্তার জেগে ওঠে।

কিন্তু শুধু দণ্ড-কাণ্ড কাটলেই কি চলবে? মূলোৎপাটন করতে হবে না? মাটির যে গভীর গহ্বরে শিকড় তার বাহুপ্রসার করেছে তার শেষ খুঁজতে হবে না? উচ্ছেদ করতে হবে না সেই গুল্মমূল? শুধু রৌদ্র হলেই কি চলবে? চাই না মাটির শস্যশক্তি? মুক্তি তো নঙর্থক, চাইনা সক্রিয়, অস্তিবাচক স্বাধীনতা?

বেধে গেল তর্ক। ঘোরতর মতান্তর।

তাই বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে? সময়ের শিথিল মুষ্টি থেকে সুবর্ণ সুযোগ ছিনিয়ে নেবনা? অধিপ উত্তেজনায় ফুটতে লাগল।

কিন্তু শুধু ধ্বংস করা বা উৎসাদন করাই তো বিপ্লব নয়। বিপ্লব মানে মন বদলানো, মানুষ বদলানো। দৃষ্টি বদলানোর দুঃসাহস। শুধু ভাব নয়, চরিত্র। শুধু জাগরণ নয়, উত্থান।

বুঝিনা অতশত। আগে মুক্তি চাই। চাই রুদ্ধ দুয়ারের উন্মোচন। পরে স্বাধীনতা। পরে বাতাসের অনাময়। বলো, তাই না? আগে আরোগ্য, পরে আয়ু।

একটু ভেবে দেখুন। হয়তো এক বন্ধন থেকে আরেক বন্ধনে চলে যাব। আজকের যে অসহায় সেদিনেরও সেই অসহায়। আজকের যে অপহারী সেদিনেরও সেই অপহারী। জেব বদলাবে কিন্তু জিভ বদলাবে না। চামড়া বদলাবে কিন্তু জাত বদলাবে না। দিন বদলাবে কিন্তু দিক বদলাবে না।

মিথ্যে কথা। গর্জে উঠল অধিপ। আগে চাই বিদেশীর বিতাড়ন। হাত-পা বাঁধা আছে থাক, আগে চাই বুকের থেকে জগৎদলন পাথর নামানো। সেই ভার সরে গেলে হাত-পার বাঁধন খুলে নিতে দেরি হবে না। বিদেশীর লৌহবন্ধন থেকে আত্মীয়ের বাহুবন্ধন ভালো।

আত্মীয়ের বাহুবন্ধন? সশ্লেষে হাসল তামসী। ধৃতরাষ্ট্রের বাহুবন্ধনে লৌহভীম চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

অধিপের সমস্ত শরীর রি-রি করতে লাগল। তর্কের বিকারে তামসীকে তার ঘৃণা করতে ইচ্ছা হল। ইচ্ছা হল শারীরিক সামর্থ্যে তার এই অন্যায় অনম্যতা ভেঙে পিষে থেঁৎলে দেয়। অন্ধ রাগে যাকে সুন্দর দেখায় মূর্খ তর্কে তাকে এমন কুৎসিত দেখাবে কে জানত। এত কাছাকাছি বসে, অথচ মনে হচ্ছে যেন বহু যোজনের ব্যবধান। মতের দূরত্ব কি মনকেও নিমেষে এমনি করে বিচ্ছিন্ন করে? কতক্ষণ আগে ঐ হাত কি করে কোমল মমতায় স্পর্শ করেছিল অধিপ, আশ্চর্য লাগছে

ভাবতে। আশ্চর্য লাগছে ভাবতে, তার স্বরে এত শ্লেষ, চাউনিতে এত জ্বালা, ভঙ্গিতে এত অবাধ্যতা ছিল!

'তবে আমার সঙ্গে তোমার আসতে চাওয়া বৃথা।' গা থেকে সমস্ত স্পর্শ ঝেড়ে ফেলে দেবার মত করে অধিপ উঠে দাঁড়াল। 'যেখানে মতের মিল নেই সেখানে মনেরও ছন্দোভঙ্গ। ছন্দোভঙ্গ যেখানে, সেখানে মহাকাব্য রচনা করা চলে না। তুমি ফিরে যাও।'

তামসী হাসল তার সেই অনাসক্ত হাসি। বললে, 'আমি কোনোদিন ফিরে যাইনা, আমি সব সময় এগিয়ে যাই। বসুন, রাগ করছেন কেন? কাজের সঙ্গে একটু চিন্তা মেশালে ক্ষতি কি?'

'আমার যা কাজ আর তোমার যা চিন্তা তার মধ্যে দুই মেরুর ব্যবধান।'

'তাতে কি, অক্ষদণ্ড তো এক। একই আবর্তনে তো আমরা ঘুরছি। পথে না মিলি পথপ্রান্তে তো মিলব। সেই প্রান্ত তো আমাদেব আলাদা নয়। তাই আজ কারু ফিরে যাওয়া নেই। আমারও নেই আপনারও নেই। বসুন, আপনার সঙ্গে আমি যেমন এসেছি, হয়তো আমার সঙ্গেও আপনি তেমনি এসেছেন। কত দূর যাব দুজনে এখুনিই তার হিসেব করতে বসবনা—'

দরজার দিকে যাচ্ছিল, অধিপ থামল।

'তবু পথের মোড়ে এসে হয়তো একটু দ্বিধা করতে হবে কোন দিকে সত্যিকারের পথ। ডান না বাঁ।'

'ককখনো না।' গর্জে উঠল অধিপ, 'দ্বিধা নেই, এক পথ এক লক্ষ্য। আমার এদিক-ওদিক নেই—আমি সিধে, আমি অকপট। চিহ্নমুখের দিকে আমি সরল শরক্ষেপ।'

'তবু দেখতে হবে সেইটেই আমাদের দেশের চিহ্ন কিনা। দেখতে

হবে কিসের জন্যে স্বাধীনতা, কাদের জন্যে। শুধু আমার-আপনার জন্যে, না, এইসব দলিত-দমিত দীন জনসাধারণের জন্যে ?'

দরজার কাছে দুজন লোক এসে দাঁড়িয়েছে। বস্তিরই বাসিন্দে। জানতে এসেছে খাবার কি সংস্থান হবে, শোবার কি বন্দোবস্ত। ও, হ্যাঁ, তর্কের কৌতুকে আহার-নিদ্রার কথাই ভুলে গিয়েছে। যেমন আসছে, হোটেল থেকেই ভাত-ডাল নিয়ে এসো গে, দুজনের মত। শোয়া ? ঘরের চারদিকে তাকাল অধিপ। এখানে সম্ভ্রম কোথায়, শিষ্টতা কোথায় ? পাশের ছোট কুঠুরিটা ছেড়ে দেওয়া যায় না ?

খুব যায়। ঐ ছোট ঘরটাতে আছে প্রায় সাত-আট জন ঠেসাঠেসি করে। ওদেরকে চারিয়ে দেয়া যায় এখানে-ওখানে। অনায়াসে। একটু কুকুর-কুণ্ডলী হবার মত জায়গা পেলেই ওদের রাত-কাবার। কষ্ট হবে তোমাদের, কিন্তু অনুপায়। না, কষ্ট কি, যখন আমাদের নিজের লোক, যে ভাবে পারি মাথায় করে রাখব। হ্যাঁ, টাকা নাও, খাটিয়া, কিছু বিছানার সাজপাট, একটা লণ্ঠন। দোকান-বাজার বন্ধ হয়ে গিয়েছে, আজকের রাতের মত চালিয়ে নিতে হবে চেয়ে-চিন্তে। ভাবনা নেই, অসুবিধে হবে না। সাহায্য যখন দিয়েছেন তখন আমরাও সেবা দেব সাধ্যমত। হ্যাঁ, কদিন কে আছি ঠিক কি। কিন্তু যতদিন আছি, থাকব তোমাদের পাশে-পাশে, চলব একজোটে। আর আমাদের বাসাবদল নেই। হ্যাঁ, টাকা নাও, যারা-যারা ঘর ছাড়ছ—ঘর ছাড়ার টাকা।

দুজনে খেয়ে নিল একসঙ্গে, মেঝের উপর বসে। অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তায় বিমুখ মনের মীমাংসা খুঁজল। একটু বা তরল হাসি, একটু বা লঘু পরিহাস, একটু বা সন্ন্যাস-সংসারের স্বচ্ছ বিশ্লেষণ। চোরাবালির উপর দিয়ে সতর্ক হয়ে হাঁটা। যেন কেউ কারু মতামতের

গভীরতায় না পা ফেলে। প্রতি মুহূর্তে গা বাঁচিয়ে চলা। ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে।

মধ্যরাত্রে গোপন সভা বসবে। এই বস্তিরই অভ্যন্তরে। দলের চাঁই দু-তিনজন থাকবে, থাকবে শ্রমিকদের মাথালরা কেউ-কেউ। সভা বসবে ধর্মঘট সম্বন্ধে। কাল থেকেই স্থরু করে দাও ধর্মঘট।

'পাশের ঘরে তোমার জায়গা হয়েছে। ঘুমিয়ে পড়। আমার সঙ্গে যখন এসেছ, তখন ভাল করে বোঝো কোথায় আসতে হয়েছে সত্যি, আরো কতদূর বা যেতে হতে পারে শেষ পর্যন্ত। সকালে উঠে যদি দেখি তুমি পালিয়ে গেছ, আশ্চর্য হবনা—'

'যাচ্ছেন কোথায় আপনি ?'

'একটা মিটিং আছে। বেশি দূর নয়। এই বস্তিব মধ্যেই। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুম যাও।'

মুখের কথায়ই কি ঘুম আসে ? শুয়ে-শুয়ে ভাবতে লাগল কি করে অধিপকে ফেরানো যায় এই সর্বনাশের নিষ্ফলতা থেকে। শক্তির অপপ্রয়োগকে কি করে নিবারণ করা যায়। তার উচ্ছ্বসিত পৌরুষকে কি করে চরম কল্যাণের পথে পরিচালিত করা যায়। অধিপের হাতেই যেন তার ভার, যেন তার হাতে অধিপের ভার নয়! যেন সেই অধিপের সঙ্গ নিয়েছে, অধিপকে সে নিজের সঙ্গে করে নিয়ে আসেনি! মনে-মনে হাসল বোধহয় তামসী। দেখা যাক কার ব্যক্তিত্বের জোর বেশি। কার দিকে দাবির প্রবলতা। আর ফিরে যাওয়া নয়। প্রতীক্ষার পরীক্ষা দেব নিঃশব্দে। জয় করব। আগুনে তাতিয়ে, বেঁকিয়ে আনব কঠিন লোহা। বেঁকিয়ে আনব নিজের দিকে। ভবিষ্যতের দিকে।

সভা সাঙ্গ করে ঘরে ফিরে এসে অধিপ অবাক হয়ে গেল। তামসী

তার নির্ধারিত পাশের ঘরে শুতে যায়নি। অধিপেরই খাটিয়ার উপর কুঞ্চিত-কুণ্ঠিত হয়ে শুয়ে আছে। এককোণে ভাঙা চেয়ারের উপর লণ্ঠনটা জ্বলছে মিটিমিটি।

ব্যাপার কি?

পাশের ঘরে গাদাগাদি করে তেমনি শুয়ে আছে ভাড়াটেরা। রাত অনেক, তবু অধিপ জাগাল একজনকে। সে বললে, তামসীই নাকি তাদেরকে ঘর ছাড়তে দেয়নি। একজনের লাভের জন্যে আটজনের বঞ্চনা—এ নীতির সে প্রশ্রয় দিতে পারে না। কিন্তু টাকা? তাদের যে টাকা দেওয়া হয়েছিল খেসারৎ বাবদ? তামসী বলেছে সে টাকা তাদেরই থাকবে। কেননা তারা তো ছেড়েই দিয়েছিল, তামসীই আবার তাদের পুনর্দখল দিয়েছে—লেনদেনে তাদের কোনো ত্রুটি নেই। তাঁকে যদি রাজি করাতে পারেন এখনো তারা প্রস্তুত।

ঘরে ফিরে এসে নির্ভুল হাতে দরজা বন্ধ করলে অধিপ। আলোর শিখটা একটু উঁচু করলে। মুহূর্তে চোখে যেন ঘোর লাগল। এরই মধ্যে, যতদূর সাধ্য, নোংরা ঘুচিয়ে ঘরের চেহারা ফিরিয়েছে। নতুন খাটিয়াটা দূরে এককোণে পেতে রেখেছে, অন্য শিয়রে। বিছানার বেশি অংশটা ওখানে বিস্তারিত করেছে। যত্ন ও পারিপাট্য দেখলে ভেবে নিতে দেরি হয় না ওটা অধিপের জন্যে। যেন অনাবৃত দড়ির খাটে, কঠিন রিক্ততার মধ্যে, শোয়ার কত কালের অভ্যাস তামসীর। যাই বলো, আশ্চর্য দুঃসাহস বলতে হবে, অধিপের নিজেরই ভয় করে উঠল। ভয়ের সঙ্গে-সঙ্গে প্রচ্ছন্ন একটু বা ঘৃণা, অনুকম্পা। হাতের নাগালের মধ্যে আলোটা রেখে দিয়েছে কেন? চরম ভয়ের মুহূর্তে জেগে উঠে আলোর কাছে ত্রাণ ভিক্ষা করবে? এখনো কি তার জেগে ওঠবার সময় হয়নি? এখনো কি লগ্ন আসেনি ভয় পাবার?

দরজা বন্ধ। আলো জ্বলছে নিশ্চিন্ত নির্লজ্জতায়। অধিপ নিস্পন্দ চোখে দাঁড়িয়ে। তবু অনাহত শান্তিতে ঘুমুচ্ছে তামসী। সে-শান্তিতে যেন অনেক শক্তি, অনেক উপেক্ষা, অনেক প্রত্যাহার। সে-নিঃশব্দতায় সে-নিশ্চলতায় পুঞ্জীকৃত প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞা। জ্বালা করে উঠল অধিপের। আলোর শিখাটা অতি সন্তর্পণে আস্তে-আস্তে ডুবিয়ে দিতে লাগল।

তবু এতটুকু নড়লনা তামসী। অঞ্চলের পাড় কাঁপলনা এতটুকু। লণ্ঠনের পলতেটা নামাতে-নামাতে অধিপ থামল এক পলক। অস্পষ্ট আলোকে তামসীকে হঠাৎ কি-রকম অদ্ভুত মনে হল। মনে হল কত পরিচিত অথচ কত দূরদেশী। কত কঠিন অথচ কত অসহায়। অন্তরে গভীর বেদনা থাকলে যেমন সৌন্দর্যময় শিল্পসৃষ্টির সম্ভব হয়, তেমনি তার মুখের এই শান্তি এই সৌন্দর্য এই শিল্পসৃষ্টি যেন কোন গভীর বেদনাব প্রতিচ্ছবি। আসলে সে হয়তো বিপ্লবিনী নয়, সে পুরুষ-কাব্যলোকের চিরন্তনী বিরহিণী।

না, থাক, আর কমাতে হবে না আলো। এমনিই ছিল। হ্যাঁ, এইটুকু, এই পর্যন্ত। স্থির পায়ে অধিপ এখন যাক তার নিজের খাটিয়ায়। হঠাৎ উলটো-মুখ হতেই সামনের দেয়ালে অস্পষ্ট ছায়া নড়ে উঠল। চমকে উঠল অধিপ। না, ও তার নিজের ছায়া। নিজের অন্তরের ছায়া।

নিজের খাটিয়ায় গিয়ে শুয়ে পড়ল অধিপ। মৃত্যু ছাড়া অভাবনীয় কিছু নেই এমনি শান্তিময় অনুভূতিতে নিজেকে শিথিল করে দিতে চাইল। কিন্তু কি অসম্ভব মশা! মেয়েটা তবু স্পন্দনহীনের মত পড়ে আছে কি করে? একটা মোটা চাদর দিয়েও আপাদমস্তক আবৃত করেনি। পায়ের খানিকটা, হাতের অনেকখানি, মুখ আর গলা

আঢাকা। তবে কি ও জেগে আছে? আসন্নবিকাশলজ্জায় মুদ্রিত করে আছে চক্ষু? না, দেহানুভূতিহীন হয়ে শবসাধনা করছে মনে-মনে?

শয্যারচনা যে করেছে সে পায়ের নিচে চাদর রেখে দিয়েছে ভাঁজ করে। যেন তার নিজের চেয়ে অধিপের প্রয়োজন বেশি। ভব্যতা-ভদ্রতা দূরে যাক, আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিল অধিপ। তারই প্রয়োজন বেশি, আত্মরক্ষার প্রয়োজন। শুধু মশার থেকে নয়, লণ্ঠনের আলোর ঐ ক্ষীণ হাতছানি থেকে। অন্ধকারে, নিজের মনের দেহের চেতনার অন্ধকারে, খুঁজে পাক সে নিষ্ঠুর অব্যাহতি, প্রশান্ত বিস্মরণ।

কিন্তু ঘুম না এলে নিস্তার কোথায়?

অসহ্য, এমন জনের সঙ্গে তার মনের মিল হবে না? পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে যে চলে এল সে হাতের সঙ্গে হাত মেলাতে পারবে না? যে একদিন দূরে চলে গিয়ে জীবনে মহান অর্থ এনে দিয়েছিল, সে আজ বন্ধ ঘরে হাতের নাগালের মধ্যে এসে জীবন অর্থহীন করে দেবে? জীবনের নির্জনতায় একান্তচারী হয়ে পরিব্রাজন করতে-করতে পেয়ে গেল তো পথসঙ্গিনী, কিন্তু হায়, সঙ্গ আছে তো পথ নেই, পথ আছে তো সঙ্গশূন্য। কত সমস্যা তার সামনে, কত সংকল্প। সকলের চেয়ে এই সমস্যাটাই তার কাছে এখন বড় হয়ে উঠল? কি করে একসঙ্গে এক পথে চলে যেতে পারে তারা। কি করে, যেমন প্রথম দরজা দিয়ে একসঙ্গে বেরিয়ে এসেছে তারা, তেমনি পৌঁছুতে পারে শেষ দরজায়। কি করে ভিন্নপন্থীকে ব্যক্তিত্ববলে বশীভূত করে নিয়ে আসতে পারে নিজ শিবিরে। রক্তে আন্দোলিত হতে লাগল অধিপ। মতের ঐ ঔদ্ধত্যকে অধীনীকৃত করা যায় না? চূর্ণ করে দেয়া যায়না মনের ঐ বিরুদ্ধতা? সব বাধা-বন্ধন দূর করে এক সমতলে একবাহী জলের প্রবলতায় মিলতে পারেনা তারা? এক রথ এক পথ এক পতাকা?

কিন্তু ও-পক্ষ থেকে এতটুকু ইঙ্গিত নেই কেন? অধিপ যখন দরজা বন্ধ করল তখন হাত বাড়িয়ে আলোটা ডুবিয়ে নিবিয়ে দিলনা কেন তামসী?

আজকেই কিনা অধিপের এত ভয়, এত স্পর্শসংকোচ। আজই কিনা তার ইঙ্গিতের প্রতীক্ষা। হ্যাঁ, সে জানে, জীবনের আগের পরিচ্ছেদ থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছে। তা ছাড়া এ তো আকস্মিকা ক্ষণজীবিনী নয়, এ যে তার অন্তরের অধিষ্ঠাত্রী। সেই থাকবে দূর হয়ে, পর হয়ে, পৃথক হয়ে? সে যে এক ডাকে চলে এসেছে, নেমে এসেছে এক ধাপে—এই কি যথেষ্ট ইঙ্গিত নয়?

চাদরটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে খাটিয়া থেকে নেমে পড়ল অধিপ। আস্তে-আস্তে এগিয়ে এল আলোর দিকে। আলোর শিখাটা আস্তে-আস্তে বাড়িয়ে দিল।

সুন্দর ঘুমিয়ে আছে তামসী। কোথায় শুয়ে আছে, মশা কামড়াচ্ছে কিনা, এ রাত ভোর হলে কোথায় যাবে, কোন লক্ষ্য নেই, জিজ্ঞাসা নেই। লক্ষ্য নেই, মধ্যরাত্রে শয্যা থেকে উঠে এসে আলো জ্বালিয়ে কেউ তাকে ব্যাকুল চোখে দেখছে কিনা। মুখের লাবণ্যটি যেন সুখস্বপ্নমাখা, যেন স্নিগ্ধ বিশ্বাস ও সহজ উৎসর্গের ভঙ্গিতে সমর্পিত। রসোৎসুকা রাগলেখা। কোমলা কামলতিকা। হৃদয়ে তুলে ধরলেই যেন ঘুচে যাবে সব অসাম্য, মুছে যাবে সব ব্যবধান। যে হৃদয়সংস্থিতা, ভাগ্যদোষে সে বহির্বর্তিনী হয়ে পড়ে আছে। বাহু বাড়িয়ে বুকের উপর তুলে নিলেই হয়। কোথায় কখন আর দ্বিধাদ্বন্দ্ব, কোথায় বা তখন বিচ্ছেদবিরোধ!

সেই আর্ত, অন্ধ মুহূর্তে ঈশ্বরকে একবার স্মরণ করল অধিপ। ভগবান, বল দাও, বীর্য দাও, বীরকে ব্রতভ্রষ্ট কোরো না। যে কাজ হাতে দিয়েছ, যে মহান আত্মোৎসর্গের কাজ, তার সাফল্য না দাও, তার

শুচিতাটুকু রক্ষা কর। আমার আদর্শ যদি বড় করেছ, আমাকেও বড় কর। স্বাদ চাইনা, স্নেহ চাইনা, চাইনা স্বর্গরাজ্য—আমাকে নিরিন্দ্রিয় কর। ত্যাগ করতে শেখাও—চরম ফলত্যাগ। যোগ্য কর, যুদ্ধের জন্যে যোগ্য কর। বল দাও সবার আগে নিজেকে বশীভূত করার। আমার বল থেকে তামসীও বল পাক। পাক দুর্নিবার দুঃসাহস। তার আদর্শের প্রতি অনুরক্তি। তাকেও তুমি ছোট কোরো না, অপমানিত কোরো না। আমাকে মুক্তি দিয়ে তাকে দাও স্বাধীনতা।

অধিপ নিজের বিছানার থেকে চাদরটা কুড়িয়ে আনলে। আলগোছে, করুণাধারার মত, তামসীর গায়ের উপর ঢেলে দিলে। আলোটা আগের মতই এখন কমিয়ে দিক। শুতে যাক তার নিজের খাটিয়ায়।

এ কি, আলোটা যে সম্পূর্ণ নিবিয়ে ফেলল অধিপ। এ কি!

চেরা বাঁশের সংকীর্ণ জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে টর্চের আলো এসে পড়েছে। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে ভীত কণ্ঠের অস্ফুট ডাক: 'অধিপদা, অধিপদা।'

ধড়মড় করে উঠে বসল তামসী। তার গায়ে চাদর, সামনে অধিপের ছায়া, ঘরের আলো নেবা, টর্চের এক ঝলক হলদে আলো দেয়ালে ছড়িয়ে পড়েছে। একি অঘটন!

'কে?' অধিপ নির্ভয়স্বরে প্রশ্ন করলে।

'আমি।'

স্বর শুনে চিনল তাদের দলের একজন পুরোনো যুবক।

তামসীকে বললে, 'আমাদেরই দলের লোক। বাইরে গিয়ে দেখে আসি ব্যাপার কি। তুমি ততক্ষণ আলোটা জ্বালাও।' জামা খুঁজে দিয়াশলাই বের করে দিল।

তামসী আলো জ্বালাল না। কান খাড়া করে রইল।

'অধিপদা, আজকের রাতের মত এখানে একজনের আশ্রয় হবে?'

'কেন? ব্যাপার কি?'

'ব্যাপার শুভ। জেল থেকে পালিয়ে এসেছে। আমাদের সঙ্গে ফের যোগ দিতে চায়।'

'জেল থেকে পালিয়ে এসেছে! জেল হয়েছিল কেন?'

'জেল হয়েছিল অবিশ্যি চুরির জন্যে। তা হোক। যখন ফিরে আসতে চায় তখন তাকে নিশ্চয় ডেকে নেব।'

'না, তা বোলো না। লোক খাঁটি কিনা দেখতে হবে। চোর যদি জেল থেকে পালায় তবুও তাকে সেই চোরই বলব। লোকটা কে? চিনি?'

'চেন বৈকি। আমাদের পুরোনো বন্ধু। রণধীর।'

'রণধীর?' একমুহূর্ত্ত স্তব্ধ হয়ে রইল অধিপ। যেন যথাযথ কঠিন হবার জন্যে। বললে, 'বিশ্বাস করিনা পালিয়ে এসেছে জেল থেকে। কেন, কিসের জন্যে পালাবে? মেয়াদ ফুরিয়েছে, ছাড়া পেয়েছে। ওকে জাননা তুমি, ও তো শুধু চোর নয়, ও মিথ্যাবাদী।'

'তা হোক। তবু যখন আসতে চায় আমাদের দলে—'

'না।' প্রায় গর্জে উঠল অধিপ: 'আমরা দল বুঝিনা, আমরা ব্যক্তি বুঝি।'

একি, সে কি আর কারু কথা বলছে? সেই কথাটা কি এখনো গেঁথে আছে তার বুকের মধ্যে? আর, তারই জন্যে সে কি খাঁটি হতে চেয়েছিল, চেয়েছিল অগ্নিশুদ্ধ হতে?

'পতাকা বুঝিনা, পতাকা বহনে মুষ্টির দৃঢ়তা বুঝি।' বলে চলল অধিপ: 'ফল বুঝিনা, উদ্দেশ্য বুঝিনা, বুঝি যুদ্ধ বুঝি অভিযান।'

'আজকের যুদ্ধে কেউ অযোগ্য নেই অধিপদা—'

নিশ্চয়ই আছে। যে চরিত্রহীন এ যজ্ঞে তার সমিধ হবার অধিকার নেই। আজকে দরকার বিশুদ্ধ ঘৃতের, আহুতি যাতে আকাশস্পর্শী হতে পারে।

কিন্তু এ পাবক তো পতিতপাবন। তাই না? যে মুক্তির জন্যে আমরা সংগ্রাম করছি তা পাপের থেকে মিথ্যার থেকে লজ্জার থেকে—সমস্ত কিছুর আকর ঘোরতর দারিদ্র্য থেকে মুক্তি।

'কিন্তু রণধীরকে তুমি চেননা। যার চরিত্র নেই তার নীতি নেই, আদর্শ নেই। এমন কুকাজ নেই যে সে করতে পারেনা। তুমি একটা ধর্মঘট বাধালে, ও হয়তো টাকা খেয়ে তাই ভণ্ডুল করে দেবার চেষ্টা দেখতে লাগল। হয়তো হয়ে বসল পুলিশের স্পাই, মালিকের আড়কাঠি। ওকে তুমি বিশ্বাস করতে পারনা।'

'যাই বলো, বড্ড বিপন্ন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে পথে-পথে। চাল নেই চুলো নেই—মাথা গোঁজবার একটু আশ্রয় নেই। একটা আতঙ্ক পিছু নিয়েছে চোখের দৃষ্টিতে সেই আতঙ্ক আঁকা। কতদিন না জানি খেতে পায়নি। ওকে যদি আমরা না দেখি না ডাকি—'

'টাকা চাও তো টাকা দিতে পারি।'

'টাকা কিছু আমি দিয়েছি। খাইয়ে দিয়েছি লুকিয়ে। কিন্তু আজকে ওর সব চেয়ে প্রয়োজন আশ্রয়। একটা নিঃসন্দেহ ভদ্র আশ্রয়।'

'ওর পক্ষে যেটা ভদ্র সেটা ভদ্রলোকের পক্ষে নিঃসন্দেহ নয়। আর কোনো বস্তি-টস্তিতে ঢুকিয়ে দাও গে।'

'সত্যি কথা বলতে, আজকে ওর সব চেয়ে বেশি দরকার তোমার সান্নিধ্য, তোমার সাহচর্য। যাতে ওর সংশোধন হতে পারে। যাতে ও চিনতে পারে বিপ্লবকে। বুঝতে পারে কাকে বলে আদর্শ, কাকে

বলে আত্মদান। তাই আমাদের ইচ্ছা ওকে তোমার জিম্মায় রেখে যাই। তুমি ওকে যোগ্য কর, যোদ্ধা কর—'

'অসম্ভব।' সমস্ত শরীরে প্রতিবাদ করে উঠল অধিপ: 'এখানে জায়গা কোথায়?'

'তোমার ঘরের এক কোণে মাটির উপর ও পড়ে থাকবে। তোমার সংস্পর্শে এসে ও আবার খুঁজে পাবে ওর নিজের প্রতিশ্রুতি। ও আবার নতুন হয়ে উঠবে। তুমিই ওকে ঠিক বাঁচিয়ে রাখতে পারবে, চালিয়ে নিতে পারবে, হয়তো বা ওরই মুঠোতে তুলে দেবে তোমার পতাকা। ও চোর, ও চরিত্রহীন, কিন্তু যে যাই বলুক, তুমি তো জানবে, ওরও মুক্তি চাই, চাই পুনর্জীবন। মোড়ের মাথায় ও দাঁড়িয়ে আছে গা-ঢাকা দিয়ে। তোমার কাছে সরাসরি এগিয়ে আসতে সাহস পাচ্ছে না। যদি বলো তো ডেকে আনি। এই তো দু পা—'

'অসম্ভব।' দৃঢ় গাম্ভীর্যে কঠিন হয়ে গেল অধিপ: 'আমার ঘরে একজন ভদ্রমহিলা আছেন।'

'ভদ্রমহিলা?'

'হ্যাঁ, আমাদেরই দলের একজন। সেনানায়িকা। চণ্ডনায়িকা বলতে পারো। তাঁর ধারে-কাছে ঐ পাপাত্মার স্থান নেই। সাধ্য নেই বুঝতে পারে তাঁর মহিমা। ঠিক ভুল বুঝে বসবে—'

কেন, ভুল বুঝবে কেন?

ও আগে জানত তো আমাকে। জানত পাপাশ্রয়ী বলে। একদিন দেখা করতে এসেছিল, নিরাশ নিরুদ্যমের মত অন্ধকার ঘরে বসে মদ খাচ্ছিলাম। আমার অখ্যাতির সঙ্গে আমাকে সেদিন ও সমান অপরিচ্ছন্ন করে দেখেছিল, একটুও আশ্চর্য হয়নি। আজকেও আমাকে এই অবস্থায় দেখে বিন্দুমাত্র আশ্চর্য হবে না। ভাববে বস্তির আড়ালে

ভদ্র মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করছি। বিপ্লবের নামে করছি মোহান্তগিরি।

'কি করে জানবে ও, এর মধ্যে কী ভাবে বদলে গিয়েছি আমি, উদ্ধার পেয়ে গেছি। ও হয়তো ভাববে ওরই মত কেবল ধাপে-ধাপে নেমে যাচ্ছি অতলে—' অধিপ একটু পায়চারি করে নিল।

কিন্তু ওকেও তো বদলে দেওয়া দরকার। ওরও তো উদ্ধার চাই। ওকেও তো দিতে হবে সেই অধিকার।

'রক্ষে করো।' ঘৃণায় অধিপের কণ্ঠস্বর আরো তিক্ত হয়ে উঠল: 'ওকে আশ্রয় দিয়ে একজন ভদ্রমহিলার সম্মান বিপন্ন করতে পারিনা। ওর নামহীন ভবিষ্যতের চেয়ে ভদ্রমহিলার সুনাম-সম্ভ্রম অনেক মূল্যবান।'

'তবে—আজকের রাতটা—'

আরো কটুস্বাদ করল কথার অর্থ। অধিপ গলা নামাল। 'টাকা দিচ্ছি, ওর পছন্দমত একটা বস্তি-টস্তি খুঁজে নিতে বলো গে। ছুটোছাটা দু-একটা পেয়েও যেতে পারে বা। তাতে লজ্জা নেই, নজিরেরও অভাব হবে না। এমনি অনেক ফেরারী আর দাগী জেলঘুঘুকে ওরা আশ্রয় দিয়েছে। অভাজন জনগণের সেবা করে বলেই তো ওরা গণতোষিণী।'

ভগবান, বল দাও, বীর্য দাও, দাও পুরুষকার। দাও দুরিতদলনের তেজস্বিতা। কঠিন না হলে তোমার বর্ম গায়ে আঁটব কি করে, হাতে কি করে ধরব তোমার বৈজয়ন্তী? কাঁচা মাটির কলসী বুকে ধরে কি নদী পার হওয়া যায়? মাটিকে পুড়িয়ে-পুড়িয়ে পাকা কর, কঠিন কর, কলসীকে জলশূন্য, জীবনকে লোভশূন্য কর। নইলে নদী, এই ভরা কোটালের নদী, পার হব কি করে?

আগন্তুককে বিদায় দিয়ে অধিপ একা ফিরতে লাগল ঘরের দিকে।

যা অক্লেশলভ্য তার দিকে প্রধাবিত কোরোনা। গম্যস্থল যদি বহুদূরবর্তী হয়, তবু পথচ্যুত কোরোনা। অসিচর্যার মাঝে যদি সহকারিণী পাঠিয়েছ তবে অসিধারাব্রত যাপনের ব্রহ্মচর্য দাও। আমাদের দেশকে বড় কর।

ঘরে এসে দেখল ঘর অন্ধকার। তামসী তখনও আলো জ্বালায়নি। অনড় আড়ষ্টের মত বসে আছে বিছানায়। কতক্ষণ পর-পর দেশলাইর বাক্সের গায়ে ঘসে-ঘসে একটা করে কাঠি জ্বালাচ্ছে, আবার নিবিয়ে দিয়ে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে মেঝের উপর।

সাইত্রিশ

কারখানার কুলিরা পরদিন সকাল থেকেই ধর্মঘট কবলে।

রাত্রির নির্জনে তপস্যা করে ভোরের শিশিরে অম্লান ফুল-ফোটার মত দেখাচ্ছে এখন অধিপের পরিতৃপ্তিকে। শুধু জয় নয় [illegible]র্য, আত্মশ্লাঘা।

বললে, 'এখান থেকে এবার আমি চলে যাব পশ্চিমে। পাটনা নয় কাশী। তুমি যাবে তো আমার সঙ্গে ?'

তবু এততেও যেন ইচ্ছা, তমসী সায় দেয়। যে যন্ত্রণা বুক থেকে নেমে গেছে আবার তাকে সাধ করে তুলে নেয় বুকের উপর।

তামসী চোখ নামাল। বললে, 'না। আমি এইখানেই থাকব।'

'এইখানে থাকবে ? মানে এই বস্তিতে ?'

'হ্যাঁ, এইখানে যখন এসে উঠলাম, এইখানেই আমার বাসা। মন্দ কি। আমিও বৃত্ত সম্পূর্ণ করলাম এতদিনে।'

'তোমার এখানে কি কাজ ?' চঞ্চল হয়ে উঠল অধিপ।

'আপনারই বা কি কাজ এখান থেকে চলে যাওয়ায় ?' তামসী কথার সুরে একটু ঠেস দিল।

'আমার যা কাজ সব আজকের কাজ। আজকের গরম লোহাকে আজকের শক্ত হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা। হাতের কাছে আজকের যেটুকু কর্তব্য তাই সহজ মনে সম্পন্ন করা, চোখের কাছে আজকের যেটুকু প্রলোভন তাই নির্বিচারে প্রত্যাখ্যান করা—'

'কিন্তু আমার কাজটা আগামী কালের।' তামসী সরলভাবে হেসে কথাটাকে স্বচ্ছ করলে : 'এই ধর্মঘটীদের বোঝানো, শেখানো— কেন তাদের এই ধর্মঘট, কার স্বার্থে, কোন উপস্বত্বের দাবিতে? যদি পারি তো এই ধর্মঘটটা ভেঙে দেব।'

হৃৎপিণ্ড বোধ করি একটা তাল ভুল করল। রক্তে যেন কে বিষ ঢেলে দিলে। বাঁ চোখের কোণটা কুঞ্চিত করে স্বরে বক্রতা আনলে। বললে, 'একা পারবে? সৈনিক সংগ্রহ করবে না?'

তামসী স্থৈর্য হারাল না। বললে, 'নিশ্চয়, সৈনিক সংগ্রহ করতে হবে বৈ কি। আপনাদের মত সৌখীন সৈন্য নয়, বাপের কাছে হাত পেতে যা সহজে পাওয়া যায় তা পিস্তল দেখিয়ে ছিনিয়ে নেবার সৌখীনতা—এ সৈন্য সত্যিকারের বীর, সত্যিকারের বিদ্রোহী। ভদ্রজীবন থেকে এরা বঞ্চিত, ভদ্র আদর্শ থেকে প্রত্যাখ্যাত। এরা আসছে নর্দমা থেকে, আঁস্তাকুড় থেকে, শ্মশানকুণ্ড থেকে—'

'থাকো তোমার ওসব ভূতপ্রেত প্রমথ-মন্মথদের নিয়ে। আমি চলি।' অধিপ তার জিনিস গুটোতে লাগল।

'এ একেবারে পালিয়ে যাচ্ছেন দেখছি!' কথার সুরটাকে বাঁকা করলে তামসী।

'পালিয়ে যাচ্ছি? আমি?'

'আমার থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন তা বলছি না। পালিয়ে যাচ্ছেন বাস্তবতা থেকে। আর যেটা বাস্তবতা সেটাই যুদ্ধক্ষেত্র।'

কী অসম আস্পর্ধা মেয়েটার! কি বোঝে, কী বলে! অধিপের ইচ্ছে হল সবলে ওর মুখ চেপে ধরে। দিনের আলো-কে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে নিয়ে আসে সেই রাতের পাথুরে অন্ধকার!

'মিথ্যে কথা।' গা ঝাড়া দিয়ে খাড়া হয়ে উঠল অধিপ। 'পালিয়ে

যাচ্ছ তুমি। চোখে আবার তোমার নতুন অঞ্জন লেগেছে—নীলাঞ্জন নয়, জ্ঞানাঞ্জন। চরম জ্ঞানোদয় হোক তোমার, এই আশীর্বাদ করি।'

'কারু আশীর্বাদ আমি চাইনা। টাকা চাই।' তামসী হাত পাতল। 'ডাকাতির লাভে আমারও নিশ্চয় কিছু অংশ আছে।' তামসী জানে রিক্ততার কী কষ্ট, কী লজ্জা!

সামান্য কিছু টাকা অনুকম্পার ভাব থেকে যেন অস্পৃশ্যের হাতে ফেলে দিলে অধিপ। বললে, 'তবু এইটুকু শুভকামনা জানাই যেন সত্যি-সত্যিই পালাতে পার সেই পাপ থেকে। যে পালাতে জানে সেই হয়তো জেতে। জানিনা।'

'আপনার উপদেশ মনে থাকবে।'

'আমার সঙ্গে যে আসতে চাওনি ভালই করেছ। রাত্রির নির্জনতায় জর্জর হবার আমার সময় নেই। বুঝলে তামসী, সংসারে কিছুই টেঁকেনা—খ্যাতি না, জনপ্রিয়তা না, প্রেম না, কামনা না, একমাত্র থাকে শুধু চরিত্র। সংগ্রামের অনম্যতা। তোমার আদর্শের জন্যে নির্মম ও নিরন্তর যুদ্ধ করে যাও। চরিত্রবতী হও। চরিত্রবান সৈনিক সংগ্রহ কর। আমরা মুক্তির জন্যে লড়ছি, তোমরা স্বাধীনতার জন্যে লড়ো। আমরা আগে শাদা সাহেব তাড়াই, তোমরা কালা সাহেব তাড়াও।'

রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিল অধিপ।

'আমি আর হয়ত ফিরব না। তবু এই যে আমি না-ফেরার দলে ফিরে গেলাম এ শুধু তোমার দৌলতে। টাকা কম দিয়েছি? যাতে তাড়াতাড়ি বাবার কাছে ফিরে যেতে পার তার জন্যে। আচ্ছা, চলি। নমস্কার।'

রিকশাতে চড়ে বেরিয়ে গেল অধিপ।

তামসী এদিক-ওদিক দেখতে-দেখতে ফিরে এল ঘরের মধ্যে। ঘরের মধ্যে এসেও এদিক-ওদিক দেখতে লাগল। পাপ? সে কি পাপের থেকে পালাচ্ছে?

আচ্ছা, কে সৃষ্টি করল এ পাপ? মানুষ? কী দুরপনেয় পাপ, মানুষ সৃষ্টি করা দূরে থাক, কল্পনাও করতে পারে না। যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনিই পাপ সৃষ্টি করেছেন। এক হাতে যিনি প্রেম সৃষ্টি করেছেন, আরেক হাতে তিনিই পাপ সৃষ্টি করেছেন। প্রকৃতি যাঁর এত সুন্দর এত মহিমাময় তাঁরই কল্পনায় পাপের এই বীভৎসতা কেন? একসঙ্গে দুজনকেই তিনি ভালবাসাতে পারেন না কেন? একদিকে অশ্রু রেখে কেন আরেকদিকে রাখেন অপমান আর অবহেলা? এক হৃদয়ে প্রেমের পদ্ম ফুটিয়ে আরেক হৃদয়ে কেন তিনি হলাহল ঢালেন? অনেকদিন ভেবেছে তামসী। বই পড়েছে। মনে হয়েছে ঈশ্বর সুন্দর সন্দেহ নেই, কিন্তু এই পাপ এই কদর্যতাও তাঁরই সৃষ্টি। পাপ তিনি সৃষ্টি করেছেন বটে কিন্তু স্পর্শ করছেন না, বেষ্টিত আছেন বটে, কিন্তু লিপ্ত হচ্ছেন না। অস্থির করে উঠল তামসীর। পাপ না ছুঁলে পাপীকে উদ্ধার করব কি করে? গলিত ঘায়ে হাত না দিলে তাকে নিরাময় করব কি করে?

আগে সেই নির্বিকল্প শক্তিকে ভাগ্য বলেছে, এখন বলছে ভগবান। অন্ধ নয়, অতন্দ্র। ইচ্ছাহীন নয়, ইচ্ছাময়। বলতে অন্তত ভাল লাগছে বলে বলছে। নইলে অধিপের সঙ্গে এক বাক্যে এক বস্ত্রে সে চলে এল কি করে? সে কি ভাগ্যের হাত ধরে, না, ভগবানের হাত ধরে? চলে এল অথচ পথের সমতা পেল না। কী আশ্চর্য অমিল এসে গেল তাদের মধ্যে, কী সুন্দর অন্তরাল। এক দিকে নিরোধ অন্য দিকে নিবারণ। গহ্বরের প্রান্ত থেকে ভগবান রক্ষা করলেন,

শূন্যতল শক্ত মাটি হয়ে উঠল। একজনকে দিলেন বীর্য, আরেকজনকে শক্তি। অনেক আশ্রয় তামসী হারিয়েছে জীবনে, কিন্তু এক আশ্রয় তার যায়নি। সে তার শুচিতার আশ্রয়। মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, কিন্তু ধ্রুবতারাকে এখনো যেন ঠিক চেনা যায়। আশা নেই কিন্তু একটি সাহস আছে অক্ষুণ্ণ হয়ে।

ভাগ্য দোষদর্শী। ভগবান সহিষ্ণু।

তামসী বাসা বদলাল, কিন্তু লক্ষ্য ছাড়ল না। কাছেই একটা বাঙালী বস্তিতে আলাদা ঘর নিল, যেখানে পরিবার নিয়ে আছে এখনো কেঁউ-কেউ। এত দুঃস্থ-নিম্ন তারা যে তামসীর এই নিঃসঙ্গবাসকেও সন্দেহের চোখে দেখবার মত সচেষ্ট নয়। সকলের সঙ্গে ভাব করলে তামসী, সবাইকে কাছে টানলে। কিন্তু শুধু লক্ষ্য নিয়ে বসে থাকলে তো চলবেনা, কাজ করতে হবে। এমন কাজ যাতে জীবন স্বচ্ছ হবে, বহনযোগ্য হবে। সে আবার কী কাজ! পতিতোত্থানের কাজ। উদ্ধার নয়, উত্থান। করুণা নয়, শ্রদ্ধা। দরিদ্রনারায়ণ নয়, দরিদ্রনরসিংহ।

কিসের জন্যে তোমরা ধর্মঘট করে আছ? কোন প্রলোভনে? শাদার বদলে হলদে, না, হলদের বদলে শাদা—তাতে তোমাদের কি? তোমরা তো সেই যে-কে-সে। হাত না বদলিয়ে এবার জাত বদলাবার যুদ্ধ কর। যুদ্ধ কর নিজের জন্যে, সকলের জন্যে, স্বাধীনতার জন্যে। যে লাঙল চালায় তার জমি, যে কল চালায় তার মুনফা। এজমালি পৃথিবীতে সকলে সমান সরিক, সকলের সমান দখল। কতকের জন্যে অনেকে নয়, অনেকের জন্যে কতক নয়, সকলের জন্যে সকলে।

নিজের দিকে তাকাও। নিচের দিকে তাকাও। নিজের নিশান নাও। নীচের নিশান উঁচু করে তুলে ধর। পরের গায়ের রঙিন জামার চেয়ে তোমার নিজের গায়ের চামড়ার দাম বেশি।

শুধু মুখের কথা বললেই তো হবে না, কাজ কর এসে। অপজাত-অধোগতদের মধ্যে কাজ কর। দলের লোক ডাকে তামসীকে, বলে, দলে চলে এসো। ভিড় বাড়াও। ভিড় ছাড়া কাজ করবে কি করে? এ তো একার কাজ নয়, বহুজনের কাজ। এক হাতে তো হাতী ঠেলা যায়না। দল দরকার, দলবল দরকার। বহু হাত লাগাতে হবে একসঙ্গে। পাথরও যে জগদ্দলন।

থমকে থেমে দাঁড়ায় তামসী। দল? দল তো উপরদিকের কয়েকজনের উপকারের জন্যে নিচের দিকের অনেক জনের উন্মত্ততা। শেষে দলকেই মনে হয় দেশ, বহুকেই মনে হয় বেশি। যা আমাকে ধারণ করে তা নয়, যা ধরে থাকি তাকেই মনে হয় ধর্ম। সে ভুলে পা দেবেনা তামসী। জনতার মধ্যে গিয়ে সে তার নিজের নির্জনতাকে হারাবেনা। নিজের আধ্যাত্মিকতাকে।

প্রায় সারা দিন টো-টো করে ঘুরে বেড়ায় তামসী। এখানে-ওখানে অলিতে-গলিতে, অপথে-বিপথে একজন অধঃপতিতকে সন্ধান করে। মনে হয় সেইখানেই বুঝি তার দেশ, সেইখানেই বুঝি তার ধর্ম। সেই প্রাপ্তির সমাপ্তিতেই বুঝি তার স্বাধীনতা।

চারদিকে রোষ-অসুস্থ মন শুধু ধ্বংসের কথা ভাবছে। ধ্বংসের পদ্ধতি-প্রকরণ নিয়ে দলে-দলে চলেছে প্রতিযোগিতা। কাকে ছেড়ে কাকে ধরবে, কাকে ধরে কাকে মারবে এই মারামারি। এরই মাঝে তামসী গঠনের স্বপ্ন দেখছে, নীড়নির্মাণের স্বপ্ন। নির্জনে নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয় তামসীর। তবু অবুঝের মত নির্লক্ষ্য পথে হাঁটে। সে গঠন করবে, নির্মাণ করবে। ভগ্নকে অভঙ্গ করবে। পতিতকে উত্তুঙ্গ। কলঙ্কিতকে বিজয়জ্যোতির্ময়।

যে যাই বলো, এই আমার কাজ।

সকলের থেকে চোখ সরিয়ে তামসী চুপি-চুপি তাকায় একবার আগাখাঁর প্রাসাদের দিকে। দেখে সেই দুর্বলকায় প্রবলতম বিদ্রোহীকে। শুধু ধ্বংসের কথাই ভাবেননি, ধ্বংসের সঙ্গে-সঙ্গে গঠনের কথা ভেবেছেন। এক হাতে ভেঙেছেন আরেক হাতে গড়েছেন, গড়ে দেখিয়েছেন কেমনটি আমার স্বপ্ন। একহাতে চক্র আরেক হাতে চরকা। একহাতে কংসের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন আরেক হাতে বস্ত্র জোগাচ্ছেন দ্রৌপদীকে। শুধু ভাবনির্মাণ করেননি, লোকনির্মাণ করেছেন। লোকচক্ষুর মত লোক।

সেও তেমনি একজন লোক নির্মাণ করতে চায়। তার হাতে তপস্বীর ইন্দ্রজাল নেই, কিন্তু একতাল কাদা থেকে মূর্তি গড়ে যে ভাস্কর, আছে তার হাতের সেই সেবা আর স্নেহ আর স্বপ্ন।

দিনে-দিনে আবার সেই কাঠি হয়ে পড়ছে তামসী। গায়ের চামড়ায় ছোপ পড়ছে কাগুজে বিবর্ণতার। চোখের কোল বসে গাল ভেঙে যাচ্ছে। গলা ঢিলে হয়ে আসছে, কোমর সংকুচিত। সেই লাবণ্য-উর্মিলা তামসী আর নেই। বেশে-বাসে নেই আর সেই ছন্দ-ছটা। পাঙক্তেয় থেকে চলে আসছে সে পরিত্যক্তের এলাকায়।

কেনই বা আসবেনা? অশন নেই, নেই সেই শারীরিক চারুচর্চা। সেই ললিত বিশ্রাম। সেই প্রগাঢ় উন্মীলন।

তবু তামসী সন্ধান ছাড়েনা। তবু সে প্রতীক্ষা করে। যদি কেউ পিছু নেয়। যদি কেউ এগিয়ে আসে অতর্কিতে।

"ওয়াকি"-তে চাকরি নেবে নাকি? কিংবা এ-আর-পিতে? কে জানে, চুরির দায়ে জেল হয়েছে খোঁজ পেলে হয়তো বা ঘাড়ধাক্কা দেবে। দরকার নেই। কিন্তু একটা তো কাজ দরকার, জীবিকার্জনের কাজ। উপবাসের উপকূলে বসে কতকাল আর মৃত্যুকে উপহাস করা যাবে?

এই বস্তিতেই কাজের সে হদিস পেল। সেলাইয়ের কাজ, বোনার কাজ। মহাজন সুতো দেয়, পশম দেয়, তারি থেকে নানান কছমের জামা করিয়ে নেয়। বোনার জন্যে মজুরি দেয় কাজ বুঝে।

সেলাই করতে বড় আনন্দ তামসীর। বিচ্ছিন্ন বিশৃংখল সুতো কেমন করে তার আঙুলের মাথায় আঁট ও আস্ত জামা হয়ে ওঠে তাই দেখবার প্রতীক্ষায় সে শিহরিত হয়। কেমন করে মাটি পুড়িয়ে ইট, আর থাকে-থাকে ইট সাজিয়ে কেমন অট্টালিকা।

সেলাইয়ের কাজ নিলে তামসী। যতক্ষণ পারে সেলাই করে, বা বোনে। নির্মাণ করে। আর থেকে-থেকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ক্যালেণ্ডারের দিকে।

ক্যালেণ্ডারে মহাত্মা গান্ধীর ছবি। ক্যালেণ্ডারে তারিখ বদলায়, মাস বদলায়, কিন্তু মহাত্মার মুখের হাসিটি ম্লান হয় না। বলে, বিশ্বাস কর, প্রতীক্ষা কর, সবার আগে প্রস্তুত কর নিজেকে।

মানুষে কী আশ্চর্য আস্থা মহাত্মার! সব মানুষই ভালো, পরিচ্ছন্ন, ঊর্ধ্ব দিকে আকৃষ্ট। যন্ত্রের চেয়েও বড় হচ্ছে মানুষ। যন্ত্রের দাস না হয়ে হবে সে যন্ত্রের দময়িতা, যন্ত্রের দণ্ডবিধাতা। যাতে যন্ত্রের ষড়যন্ত্রে মানুষ না স্বর্গচ্যুত হয়, যাতে যন্ত্রকে সে চালনা করতে পারে মানুষের মঙ্গলকরণে। যন্ত্রের চেয়েও বড় হচ্ছে জীবনমন্ত্র। বিশ্বাস করো মানুষের পুনরুজ্জীবনে। মানুষের ফিরে আসায়।

শুধু একজনই বোধহয় ফিরে আসবে না।

না-আসুক—একদিন জোর করে বলতে পারত তামসী। কত পাতা ঝরে যাবে, গজাবে আবার কত পাতা—কি যায় আসে! শুধু খাঁটি রাখতে হবে মাটি, মাটির তেজোবল। দেবিকার কথাটা গাঁথা আছে মনের মধ্যে। একজন সে মাটির স্পর্শে পুনর্নবীন হয়েছে—সে

অধিপ, সে অপ্রার্থিত। আর যে অন্তরের অন্তেবাসী তার কাছে এ-মাটি ধূলাবালি। এ মাটি অমেধ্য। যাকে সে বিপ্লবী করল তাকে সে চায় না; আর তারই জন্যে সে উদ্ভাবিত, যে স্থবির, পঙ্কমগ্ন। এ কি পরিহাস! একজনকে যদি সে ঘরছাড়া করতে পারে আরেকজনকে ঘরবাসী করতে পারেনা? তার সঞ্জীবনী মন্ত্র একের বেলায় ফলদায়ী হয়ে অন্যের বেলায় বন্ধ্য হবে? এক পথভ্রষ্টকে উদ্ধার করতে পারলে আরেক পথচ্যুতকে সে ত্রাণ করতে পারবে না? কে জানে? যে প্রত্যাখ্যাত হয় সেই হয়তো এগোয় আর যে অভীপ্সিত সে কোনদিন ফেরে না। যে দেয় সে ফিরে পায়না, আর যে পায় সে দেয়না ফিরিয়ে।

'যদি আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা থাকে মা, তবে অভিলষিত লাভ অনিবার্য।' প্রমথেশের সেই আশ্বাসবাণী মনের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

নিজের এই ছোট দরিদ্র ঘরটিকে বড় ভাল লাগল তামসীর। দড়ির খাট, দড়ির আলনা। দুটো মোড়া, চটের একটা আধশোয়া চেয়ার। কাঠের ন্যাড়া তাকের উপর গুটিকয় বই, কলাই-করা লোহার বাসন, থালা-বাটি-গ্লাশ। কোণে সরা-ঢাকা জল-ভরতি কুঁজো। খাটিয়ার নিচে দড়ির পা-পোষ।

একটি একাকী ঘরের বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল তামসীর। সেই কবে থেকে, যৌবনের যখন প্রথম কলিকা-কাল। আত্মীয়ের মত একটি অন্তরঙ্গ ঘর। নির্জন, কিন্তু নির্বারিত। এর আগে আরো অনেক সে একা থাকার ঘর পেয়েছে। কিন্তু কোনটাই এর মত তৃপ্তিতে ঘন, প্রতীক্ষায় পবিত্র নয়। এ তো ঘর নয়, এ তার হৃদয়ের তাপমণ্ডল।

ঘরের কিছু সংস্কার-শোধন দরকার হবে। সস্তায় একটা পাশালো তক্তপোশ পাওয়া যাচ্ছে সেটা কিনে নিলে হয়। বাড়িওলাকে বলে

ভিতরের বারান্দায় খানিকটা জায়গা ঘিরে নিয়ে রান্নাঘর করার দরকার। অন্ন ঘর থেকে রান্না কিনে খাওয়া তার আর পোষাবে না। নিজের হাতে পঞ্চ ব্যঞ্জন সে রান্না করবে। ভাত খেতে পাচ্ছে না বলেই এমন হাল হয়েছে তার চেহারার। কাঠামোতে আবার সে মাংস লাগাবে, আবার আনবে সে পুরন্ত বয়সের চাকচিক্য। একখানা হাত-আয়না ছিল, হাত থেকে পড়ে ভেঙে গিয়েছে। যেদিন প্রথম সে আঁৎকে ওঠে মুখের কঠিন কুশ্রিতা দেখে। ভেঙে গিয়েছে তো যাক। এবার সে দাঁড়া-আয়না কিনবে।

ছি ছি ছি! শুধু গলায় দেবার জন্যেই দড়ি জোটে না?

সংসার জুড়ে সবাই বিদ্রোহ করছে। প্রত্যেকের এই বদ্ধস্রোত সংকীর্ণ-মলিন জীবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। ভবিষ্যৎহীন বর্তমানের বিরুদ্ধে। ভবদেব, নারায়ণ—কল্যাণী, ঊষসী, সকলে। এমন কি মনসিজ পর্যন্ত। সেও তার ভঙ্গি বদলেছে, উচ্চারিত করেছে তার অসন্তোষ। জগৎ, তার দাদা, যে অগণিতের মধ্যে নগণ্য ছিল, সেও মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। পঙ্গু প্রমথেশও লাঠি ফেলে দিয়ে হাঁটতে সুরু করেছেন। যে পুত্রকে ফিরিয়ে এনেছিলেন তাকে আবার ঠেলে দিয়েছেন আগুনের মধ্যে।

শুধু রণধীরই মেনে নেবে এই বর্তমান? মসীলাঞ্ছিত জীবনের এই ঘৃণ্য অবমাননা? এর বিরুদ্ধে সে জাগবেনা, যুঝবেনা? সমরেশ তো তবু উন্নতি করছে, চন্দ্রমা উচ্চ পুচ্ছ অবনমিত করে ত্রাণ খুঁজছে পরিমিত পত্নীত্বের মধ্যে। কেউই থেমে নেই। বিপ্লব না হোক, পরিবর্তন তো হচ্ছে। শুধু একা রণধীরেরই কোন পরিবর্তন হবেনা? সেই শুধু পৃষ্ঠা ওলটাবেনা? সেই শুধু রূপান্তর খুঁজবে অবধারিত মৃত্যুর পরিণামে?

আচ্ছা, দেবিকা-নীলাচলের বদল হবে কিছু? নিশ্চয়ই হবে।

ইংরেজ যখন বিতাড়িত হবে তখন তাদের এই পেটোয়ারাও পিঠ দেখাবেন। লাল-ফিতে-আঁটা এই কালোসাহেবের পরিষদ। কে জানে। হয়তো এরাই আবার জেঁকে বসবে, মঞ্চের নিচের খুঁটি হবে—শ্যামের খুঁটি একেকটি। আগে গাছেরটা খেয়েছিল এখন তলারটা খাবে। তবু বদলাতে হবে মনোভঙ্গি, পশ্চিমমুখে না তাকিয়ে তাকাতে হবে পূর্বমুখে, দেশমুখে। মিস্টাররা সব শ্রী হবেন। মেমসাহেবরা শ্রীযুতা।

সন্ধ্যা লাগতে না লাগতেই রাস্তা-ঘাট ফাঁকা হতে সুরু করে। ডালহৌসি স্কোয়ারে বোমা পড়েছে। ট্রাম-বাস বেশি রাত চলাফেরা করে না। কি যেন অকস্মাৎ ঘটে যাবে সর্বত্র সেই উদ্ব্যস্ততা। রাস্তায় দূরে-দূরে স্থগিতগতি অভিসারিকার ইসারা। বন্ধনহীন আনন্দে ছুটে চলেছে রহস্যময় ট্যাক্সি। সময় ফুরিয়ে আসছে, যা পার, স্ফূর্তি করে নাও—চারদিকে এই পরাজয়ের শৈথিল্য, পলায়নের বিশৃঙ্খলা।

তামসীও তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরছিল, কে একটা লোক পিছু নিয়েছে সন্তর্পণে। হঠাৎ ফুটপাতের উপর সে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ফুটপাতের ধার ঘেঁসেই উঠে গেছে সিঁড়ি—দোতলায় মদের হোটেল। সিঁড়ি দিয়ে ভাবী পায়ে হুড়মুড় করে নামছে কতগুলি মাতাল, সঙ্গে তাদের দুটো পণ্যস্ত্রী। সেই দলের মধ্যে একজন রণধীর।

ভীষণ নেশা করেছে। একটা মেয়ের কাঁধের উপরে হাত রেখে এলিয়ে পড়ে জড়িয়ে-জড়িয়ে কি প্রলাপ বকছে। মেয়েটা নেশায় থমথমে হলেও এ প্রকাশ্য নির্লজ্জতায় কিছুটা কুণ্ঠা প্রকাশ করতে চাইছে, কিন্তু রণধীরের পক্ষে এ নির্লজ্জতাটাই যেন অহংকার, জগজ্জনকে দেখাবার মত। ত্রস্ত পায়ে সরে গেল তামসী। ভিতরে-ভিতরে কাঁপতে লাগল থরথর করে। পিছনের লোকটার থেকে কত দূর তার ব্যবধান দৃকপাত করল না।

মোড়ের থেকে ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে উঠল তাতে মাতালের দল। সঙ্গে সেই ছুটো হেটো মেয়ে। একটার কোলের উপর রণবীর ঢলে পড়েছে। ঢলে পড়েছে মৃত্যুর অতলে।

ট্যাক্সিটা চলে গেল।

তামসী কি তবু দাঁড়িয়ে থাকবে মূঢ়ের মত? বাড়ি ফিরবেনা? আলো জ্বালিয়ে দেখবেনা সেই বরাভয়ময় মহাত্মার মুখ?

টলতে-টলতে থামতে-থামতে বাড়ি ফিরল তামসী। পরাস্ত, পর্যুদস্তের মত। বিছানার পড়ে রইল অনেকক্ষণ। আলো জ্বালালনা, ঘর-মন অন্ধকার করে রইল। কান্না নেই কাতরোক্তি নেই—একটা ব্যর্থ ঘৃণা নিঃশব্দে তাকে ছিন্নভিন্ন করতে লাগল। কুরে-কুরে খেতে লাগল বুকের মধ্যে। শুধু ঘৃণা নয়, ঘৃণার চেয়ে বেশি—ক্রোধ, পারুষ্য, প্রত্যাহারের প্রতিজ্ঞা।

ঘরের মধ্যে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল তামসীর। শীত, তবু বাইরের রোয়াকে এসে একটু বসল। কোথাও এতটুকু তার আশ্রয় আছে কিনা তাকাল আকাশের দিকে। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নির্লজ্জ আকাশ। মৃত্যুর বার্তাবহ। পথ চিনে এখুনি হয়তো এসে পড়বে জাপানী বিমান। আবার ঢুকে পড়তে হবে নিঃসঙ্গতার বিবরে।

তাই হোক, বোমায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক কলকাতা।

চাঁদের আলো হলেও গলিটা অন্ধকার। হঠাৎ তামসীর গায়ের উপর টর্চের ঝলক পড়ল। একটা লোক গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে তার দিকে।

রাস্তার সেই পিছু-নেওয়া লোকটাই হবে হয়তো। কিংবা আর কোনো নিশাচর। দস্তুরমাফিক ভদ্রলোকের চেহারা। এত রাতে শীতে নির্জন গলিতে রোয়াকের ধারে চুপচাপ বসে আছে বলে ঠিকঠাক

ধরে নিয়েছে। যেন এমনি এক পথচারীর জন্যেই তার যত প্রতীক্ষা।

রাগে গায়ের রক্ত জ্বলে উঠল তামসীর। খালি পা, জুতো নেই, নইলে ছুঁড়ে মারত মুখের উপর। আচ্ছা, আরো এগিয়ে আসুক লোকটা। কদর্যতার স্পর্ধাটা একবার দেখি। আর—একটু। স্তোক দিয়ে ভিতরে নিয়ে যাবে। লোকজন ডাকিয়ে মেরে তুলো-ধুনো করে দেবে। ধরিয়ে দেবে পুলিশে। লাঞ্ছনার একশেষ করাবে। জগৎ-সংসারের কাছে রাষ্ট্র করে দেবে তার অকীর্তি।

লোকটা ইতি-উতি করতে লাগল। কাছে এসেও যেন একটু দূরে থেকে যাচ্ছে।

কোমলকণ্ঠে তামসী জিগগেস করলে, 'কি চান? কাকে চান?'

'তুমি—আপনি— এই একটু—এমনি এদিকে—সমস্ত রাত নয়—'

'আপনার ভুল হয়েছে। এটা গৃহস্থপাড়া। আর আমাকে যা ভাবছেন আমি তা নই।'

লোকটা থতমত খেয়ে গেল। বললে, 'মাপ করুন। না জেনে মনে কষ্ট দিলাম আপনাকে। চলে যাচ্ছি এখুনি।' পড়ি-মরি করে সরতে পারলে যেন বাঁচে। বললে, 'ওদিকে আর রাস্তা আছে?'

'নেই। বাড়ি ফিরে যান।'

'বাড়ি ফিরে যাব!' লোকটা যেন এমন অপূর্ব কথা শোনেনি কোনদিন।

'হ্যাঁ, বাড়ি গিয়ে মার কথা, স্ত্রীর কথা, মহাত্মা গান্ধীর কথা ভাবুন। দেখবেন ভালো হয়ে গিয়েছেন।' আশ্চর্য, তামসীর স্বরে রাগ নেই, জ্বালা নেই। বরং যেন মায়া, সহানুভূতি।

লোকটা আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল গলি থেকে।

আটত্রিশ

'বয় !'

একাকী কামরায় বসে জ্ঞানাঞ্জন মদ খাচ্ছেন। আপিস থেকে বাড়ি ফেরেননি। মোটর ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে ঢুকে পড়েছেন হোটেলে।

দাও আরো দু পেগ। একটু নেশা করার মত করে খাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

চিরকাল পরের সর্বনাশে প্রফুল্ল হয়েছেন জ্ঞানাঞ্জন। আজ বুঝি নিজের সর্বনাশে আনন্দিত হচ্ছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যই যদি যায় তবে কোথায় থাকবে তাঁর এই ধনপতিত্ব, স্ফীতোদর স্বার্থপরতা! না, তবু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তো যাক। একটা সাম্রাজ্য যাওয়ার আনন্দ তো কম নয়।

আশ্চর্য, তাঁর নেশা হয়েছে বুঝি।

নইলে নিজের সর্বনাশে উৎসব করছেন তিনি? তাঁর কি যাবে? কল-কারখানা, প্রভাব-প্রসার, এই মাংসল পরিপূর্তি? কিন্তু সেই সঙ্গে এত দিনের সাম্রাজ্য ছারখার হয়ে যাবে। সেই বনেদ খুঁড়ে ফেলে দিয়ে পত্তন হবে নতুন সভ্যতার, স্বকর্মকৃৎ স্বাধীনতার। চারদিকের এই প্রলয়-বিলয়ের মাঝখানে শুধু এই অনুভূতিটুকুই তাঁর অবলম্বন। সব যাবে, তিনি যাবেন, তবু দেশ স্বাধীন হবে—সর্বনাশের সমুদ্রের শেষে

দেখা যাচ্ছে ক্ষীণ তীর—সকলের মত তাঁরও যেন সেই শেষ আশ্রয়—তারই উৎসব-রাত্রি আজ।

জাপানীরা আজ মধ্যরাত্রে কলকাতায় অবতরণ করবে। এক তুড়িতে উড়িয়ে দেবে কলকাতা। কেমন দেখতে হবে না জানি সেই দৃশ্য! মদের গ্লাশের গহ্বরে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন জ্ঞানাঞ্জন।

সেই বুঝি তোমার স্বাধীনতার নমুনা? ইংরেজকে ছেড়ে জাপানীর পদসেবা। জাপানের সাধ্য কি সে ভারতবর্ষকে বশীভূত করে? জাপানী কি ইংরেজের মত শিল্পী, রূপদক্ষ? ইংরেজ কি ভারতবর্ষকে পৌরুষে জয় করেছে, মাত্র কায়িক বলপ্রয়োগে? কখনো না। ইংরেজ জয় করেছে চালাকি করে, আমাদেরকে বোকা-বুঝিয়ে। সর্ববিষয়ে সে আমাদের বড়, আমাদের মাননীয় এই ধাপ্পা দিয়ে। শুধু মাননীয় নয়, পালনীয়, পূজনীয়, অনুকরণীয়। বলেছে, তোমাদের ভাষা দাস-ভাষা, আমাদের ভাষা শেখ; তোমাদের পোশাক বন্য পোশাক, আমাদের পোশাক পরো; তোমাদের খাদ্য অসভ্যের খাদ্য, আমাদের খানা খাও। আমরা গদগদ হয়ে বলেছি, আহা, এমন ভাষা নেই, আ মরি, এমন পোশাক নেই, আর অহো, এমন খানা কি হাতে ধরে খাওয়া চলে! আমাদের এমনি করে মজিয়েছে যে আমরাই ওকে ভজনার জন্যে বাঁচিয়ে রেখেছি। কালোসাহেব বানিয়ে ভবিষ্যৎ চিরকালের জন্যে কালো করে রেখেছি। জাপানীর আছে কি সেই শিল্প-বুদ্ধি, সেই উচ্চম্মন্যতা? হয়তো শহরে ঢুকেই আস্তাবলের হোটেলগুলোতে গিয়ে গোস্ত-কাবাব খেতে স্বরু করবে, দল বেঁধে বলাৎকার করবে মেয়েদের, জুতোসেলাই, গাড়োয়ান, ফিরিওয়ালা কোন কিছুতে তাদের আপত্তি হবে না। সাধ্য নেই সে ইংরেজের মহিমা অর্জন করে। যদি সে পূজাই না পায়, তবে প্রসাদভোজী আমরা, কিছুতেই ওকে সহ্য করতে পারব না। ঠিক তাড়িয়ে দেব।

ভয় নেই, সুভাষ বোস আসছে। ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে আজ আর আজাদ হিন্দ স্টেশন থেকে সুভাষ বোসের বক্তৃতা শোনা হলনা। শহরের দেয়ালে-দেয়ালে আষ্টেপৃষ্ঠে আনাচে-কানাচে লেখ— কুইট ইণ্ডিয়া! গাছের পাতায়-পাতায় লেখ, পায়ের ধূলায় ধূলায় লেখ। সে কি বক্তৃতা! ওদের যদি 'ভি', আমাদের তবে 'কিউ আই'। ভারত শুধু ইংরেজ ছাড়বে না, জাপানীও ছাড়বে। কোনো ভয় নেই, কোনো সংশয় নেই। ভারতবর্ষের এক প্রান্তে গান্ধী, অন্য প্রান্তে সুভাষ।

তাই আজকে একটা পরমোৎসবের রাত নয়? জ্ঞানাঞ্জনের হয়তো সব যাবে, কিন্তু দেশের লোক তো পাবে। সে-পাওযাতে কি তাঁরও কিছু পাওয়া হবে না? তিনি যাই হোন, তিনিও তো দেশেরই একজন। তাই সব যাবে এ কথা কে বলে?

'বয়!' তীক্ষ্ণকণ্ঠে হাঁক দিলেন জ্ঞানাঞ্জন।

হোটেলের ছোকরা তটস্থ হয়ে কাছে দাড়াল।

আরো কাছে এসে দাঁড়াতে ইসারা করলেন জ্ঞানাঞ্জন। গলার স্বর ঈষৎ ঝাপসা করে জিগগেস করলেন, 'মেয়েমানুষ আছে?'

'আছে।'

'বাজারে বাজে জিনিস?'

'না হুজুর, একদম ফ্রেশ, ভদ্দরলোক।'

জ্ঞানাঞ্জন মৃদু হাস্য করলেন। বললেন, 'বাঙালী?'

'য়্যাংলো চান, তাও হাতে আছে। কিন্তু রেট বেশি। তাছাড়া আজকাল সোলজারদের আনাগোনা—'

'না, না, ওসব দোআঁশলা চাই না। শুধু মাতৃভাষায় একটু প্রেমালাপ করতে চাই। টাকা দিয়ে তো প্রেম কেনা যায়না, একটু না হয় ক্ষণস্থায়ী প্রেমালাপ কিনি।' শেষ দীর্ঘ রেখায় চুমুক টেনে নিলেন জ্ঞানাঞ্জন।

'এখানে আনব, না, বাইরে নিয়ে যাবেন? চেন্না-মারা ট্যাক্সি আছে আমাদের।'

'দাঁড়াও, নেশাটা আগে জমুক। নেশা না জমলে প্রেয়সীকে রূপসী বলে মনে হবে কি করে? মাত্র মুখের আলাপকে কি করে মনে হবে প্রেমের আলাপ? তার চেয়ে আগে আমাকে আরো দু পেগ হুইস্কি দাও। পাশের ঘরে এত হল্লা কেন? ডার্টি ন্যুইসেন্স!'

পাশের ঘরে বিরলে বসে একা কেউ খাচ্ছে না। সেখানে চার-চারজন বন্ধু স্থূলরীতিতে ইয়ার্কি-ফুর্তি করছে। কোনো রাজনীতি বা দার্শনিকতার ধার ধারবার তাদের সময় নেই। যতক্ষণ না হোটেল বন্ধ হয়, যতক্ষণ না পকেটে টান ধরে, ততক্ষণ তারা কোলাহল করবে। অসম্ভ্রান্ত হবার সখ হয়েছে কেন জ্ঞানাঞ্জনের? হয়েছে যখন তখন মেনে নিতে হবে প্রতিবেশীকে। প্রেমালাপ শুনতে হলে কিছুটা দুঃখের আলাপও শুনে যেতে হয়।

'আরেক রাউণ্ড নে মাইরি। তোর পায়ে পড়ি।'

'আর খাসনে, রণধীর। এবারে মারা পড়বি।'

'পড়ব তো পড়ব। তাতে তোর কি। কার জন্যে, কিসের জন্যে বাঁচব? একটা মেয়েকে ভালোবাসতাম—'

'আহা! ভালোবাসা রে ভালোবাসা! না ব্রাদার, ভালোবাসার কথা যখন বলছে তখন দে ওকে আর দু দাগ।' আরেকজনে কে সুপারিশ করলে। 'হ্যাঁ, তারপর—'

'জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখলাম দিব্যি কোন বড়লোকের রক্ষিতা হয়ে বসেছে। বাঁচতে গিয়েছিলাম, বাঁচাতে পারল না। ঠেলে আবার জেলে পাঠিয়ে দিলে। তারপর—' রণধীরের কণ্ঠস্বরে নতুন স্বাদ, অশ্রুজলের স্বাদ।

'আর এক পেগ পাবি। বেশি নয়।' বললে কাপ্তেন বন্ধু। 'আর টাকা নেই।'

'ইংলণ্ডের এরোপ্লেন নেই বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু তোমার টাকা নেই বিশ্বাস করতে পারব না।' বললে তৃতীয়জন। 'স্লিট ট্রেঞ্চের কণ্ট্র্যাক্ট নিয়ে তুমি আঙ্গুল হয়ে বসেছ।'

'বেশ, দু পেগ। কিন্তু বলে রাখছি আজ আর মেয়েমানুষ পাবিনে।' পকেটে হাত ঢোকাল কাপ্তেন।

'তোদের না হোক আমার একটা চাই।' বললে রণধীর। সামনের টেবিলের উপর মাথা এলিয়ে দিয়ে।

'ওর যে ভালোবাসা!'

সবাই উচ্চরোলে হেসে উঠল।

'হ্যাঁ, ভুলতে চাই সেই ভালোবাসা। আমার প্রথম যৌবনের সত্যিকারের প্রেম। এক পাপের পর আরেক পাপের পলস্তারা লাগিয়ে সেই ভাঙা প্রেমের ফাঁক বোজাচ্ছি। সেই বিশ্বাসঘাতকতার সিঁধ। আর বিশ্বাসঘাতকতা কি একটা?' রণধীর মাথা তুলতে যাচ্ছিল, টেবিলে আবার এলিয়ে পড়ল। তার নেপথ্যস্থিত সুস্থ আত্মা হঠাৎ যেন আর্তনাদ করে উঠল।

'নেভার মাইণ্ড ব্রাদার, নে, খা।'

'পিও সরাব পিও।' আরেকজন কে গান ধরলে করুণস্বরে: 'তোরে দীর্ঘ সে-কাল গোরে হবে ঘুমাতে।'

'এবার জেল থেকে বেরিয়ে আবার বাঁচতে গিয়েছিলাম। এবার গিয়েছিলাম দেশনেতা অধিপ মজুমদারের কাছে। অধিপদা আমাকে একবাক্যে প্রত্যাখ্যান করলেন।'

'কেন? কেন?' একসঙ্গে টেবিলের উপর অনেকগুলি চড় পড়ল।

'আমি অযজ্ঞীয় বলে।'

'তার মানে?'

'যজ্ঞের অযোগ্য বলে। তোমার টাকা নেই টাকা হতে পারে, বিদ্যা নেই বিদ্যা হতে পারে, স্বাস্থ্য নেই স্বাস্থ্য হতে পারে, কিন্তু চরিত্র যখন একবার নেই তখন তুমি আর চরিত্র ফিরে পেতে পারনা। দেশের হোমানলে আহুতি হবারও তোমার অধিকার নেই।'

'ভালই তো হল।' টিপ্পনি কাটল কাপ্তেন। 'মরতে হল না।'

'বাঁচতে পারলাম না!' নতুন-ভরতি গ্লাশটা রণধীর আঁকড়ে ধরল: 'বাঁচার মত করে বাঁচতে পারলাম না। তাই চলেছি এবার মৃত্যুর সন্ধানে। ভয় নেই মদে মরবনা, বোমায় মরবনা, মরব পাপে—সেই চরিত্রহীনতায়। যুদ্ধের যুগে পাপও আজকাল সম্ভ্রান্ত হচ্ছে—কিন্তু আমাদের কোনো দৈবযোগ নেই—পাপের বাজারেও আমরা সেই চিরকালের অভাজন। নইলে অধিপদা—'

'কেন, কী করেছে?'

'আমাকে তাড়িয়ে দিলেন চরিত্রহীন বলে। কিন্তু তিনি, নিজে—দাঁড়া, শেষ করে নি গ্লাশটা।'

একজন সিগারেট ধরিয়ে দিলে রণধীরকে।

'কিন্তু তিনি নিজে কী! তাঁর ঘরের মধ্যে লুকানো মেয়েমানুষ! বললেন কিনা, নায়িকা, চণ্ডনায়িকা। শোনো কথা। ভণ্ড নায়কের চণ্ডনায়িকা—' রণধীর টেবিলে আবার মাথা রাখল।

'তার মানে চণ্ডু খাচ্ছে আজকাল।'

সবাই আবার প্রবল শব্দে হেসে উঠল।

'এর পর রণধীরকে দিতে হয় একটি। অধিপের পালটা জবাব।'

'একটি মদালসা মদিরনয়না—' আবৃত্তির মত করে বললে একজন টেনে-টেনে।

'হ্যাঁ বাবা, চণ্ডু-চরসে চলবে না আমাদের, আমাদের মদো-মাতালই ভালো।' বললে তৃতীয়জন।

স্লিট ট্রেঞ্চের কণ্ট্র্যাক্টর সবাইর চোখের সঙ্গে চোখ মেলাল একবার। বললে, কিন্তু, মাইণ্ড ইউ, ওনলি ওয়ান।'

একটা ছোট ভাপসা খোপে কালচিহ্নহীন পাষাণমূর্ত্তির মত স্তব্ধ হয়ে বসে আছে তামসী। সর্বংসহা বসুন্ধরার মত। মূর্তিমতী তিতিক্ষা। হাসিনা-নার্সের থেকে পাঠ নেওয়া তার মিথ্যে হয়নি। পাপের সম্মুখে অগ্রসর হবার অক্ষুণ্ণ উপেক্ষা সে পেয়ে গেছে এত দিনে। অনেক ধৈর্য, অনেক প্রতীক্ষা দিয়ে তা তৈরি। এ একটা কঠোর শান্তির মত। দুঃখে যা উদ্বেল করে না, সুখে যা বিগতস্পৃহ করে। এ যেন অপরিহার্য নিয়তি। এ-পাপের সমুদ্রে ডুবতে হবে তামসীকে। পাপীয়সী সাজতে হবে। এ যেন তার সর্বস্বদক্ষিণ যজ্ঞ। এমন যজ্ঞ যাতে সর্বসম্পত্তি দক্ষিণা দিতে হয়! বিশ্বজিৎ যজ্ঞ। প্রেমের কাছে আবার পাপ কি? যিনি সর্বান্তর্যামী তাঁর কাছে নিবেদনে আবার অশুদ্ধি কি?

ভগবান, শক্তি দাও। আঘাত সহ্য করবার, অপমান সহ্য করবার ক্ষয়হীন ক্ষমতা দাও। অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য কর। কোমলেকঠোরে অচঞ্চল আত্মসংযমিনী হতে দাও। যাতে জয়ী হতে পারি। পাপপঙ্ক থেকে তুলে আনতে পারি সে মনোরত্নকে। যে কোনো কলঙ্কের যৌতুকে। ভগবান, তুমি কি চাও না, আমার প্রেম জয়ী হোক, পাপের উপর জয়ী হোক?

'ভালো মক্কেল আছে। চলুন।' তামসীকে লক্ষ্য করে বললে হোটেলের 'বয়'। অস্পষ্ট অথচ ত্বরিত স্বরে।

আরো দুজন বসে আছে অপেক্ষারতা। এরা তামসীর মত ছদ্মবেশিনী নয়। স্পষ্ট চিহ্নাঙ্কিত। এতক্ষণ এদের সঙ্গে সমাগোত্রতাই অনুভব করছিল তামসী, কিন্তু এখন মনে হল, এদের চেয়ে তার দাবিটাই অগ্রগণ্য। এদের চেয়ে সে বুঝি একটু বেশি ভদ্র, বেশি পরিচ্ছন্ন। ভালো মক্কেলের পক্ষে উপযুক্ত।

গাড়ি যেন ছেড়ে দেবে এমনি তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল তামসী। ঘরের দেয়ালে ভাগ্যিস কোনো আয়না নেই। থাকলে নিজের করুণ-কুৎসিত মুখটা দেখে খানিকক্ষণ হয়তো দ্বিধা করতে হত। গায়ের ছোট র‍্যাপারটার বিন্যাস নিয়ে দ্বন্দ্ব করতে হত মনে-মনে।

'ঐ ঘরে।' দু'হাতে প্লেট-গ্লাশ নিয়ে চলে যাচ্ছিল বয়, চিবুক তুলে ঘর দেখালে।

আধ-কাটা দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল তামসী।

'এই? এরি এত ব্যাখ্যানা? দিস ওল্ড হ্যাগ! এবি সঙ্গে প্রেমালাপ কবতে হবে? উইথ দিস বিচ?' চেয়ার পেরিয়ে মাথাটা পিছন দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে হেসে উঠলেন জ্ঞানাঞ্জন: 'মাই গুড গড। ওয়্যান ইজ ফানি।'

দু হাতে মুখ ঢাকল তামসী। যাতে জ্ঞানাঞ্জন না সত্যি চিনতে পারেন। যাতে না এতদিনে শোধ তোলবার সুযোগ পান।

বাতিল হয়ে গিয়েছে যখন, তখন এক মুহূর্তও আর দাঁড়ান উচিত নয়। ওদিকে আর কারু হয়তো ডাক পড়ে যাবে। ওদিকের ডাকের জন্যে আর অপেক্ষা করার সময় নেই। যে ডকিনী তার আবার নিমন্ত্রণ কি। সে ডাকাতি করে ছিনিয়ে আনবে তার মণিহার।

'দাও, টাকা নিয়ে যাও। পঞ্চাশ টাকা। ঐটেই আমার লোয়েস্ট চাঁদা।' জ্ঞানাঞ্জন হাত বাড়ালেন টেবিলের উপর দিয়ে। 'মন্দ কি,

প্রেমালাপ করতে চেহারা লাগে না। যাবেই যদি, তোমার নামটি বলে যাও। নাম কি বায়সী?'

দ্রুত পায়ে বেরিয়ে পাশের ঘরে দ্রুততর পায়ে অন্তর্হিত হল তামসী। যেন প্রায় আশ্রয় নেবার প্রয়োজনে। এবার আর তার ঘর ভুল হবার সম্ভাবনা নেই।

মাতালের দল স্তম্ভিত হয়ে রইল। এ যে প্রায় মেঘ চাইতে-না-চাইতেই বৃষ্টি দান। গাছে না উঠেই এক কাঁদি। আর, এ তো দেখি দিব্যি! রণধীরটার ভাগ্য ভাল।

'আপনাদের একজনের জন্যে দরকার শুনলাম। এঁর জন্যে বোধ হয়?' টেবিলের উপর মাথা রেখে মুহ্যমানের মত বসে ছিল রণধীর, তামসী নির্ভুল পায়ে তার কাছে এসে দাঁড়াল।

'না মাইরি, মুফৎ নিতে পারবে না রণধীর। লটারি হোক।' বললে একজন।

'কিংবা স্বয়ংবরা হোক। দময়ন্তীর যাকে পছন্দ।'

'পছন্দ হবে কি দেখে? টাকা না চেহারা? দুটোতেই আমি সমান ওস্তাদ।'

'বোসো না মাইরি বোসো। দু-এক পাত্তর হোক। অত তাড়া কিসের? আমাদের দরকারে কী এসে যায়? তোমার কাকে দরকার তাই বল।' কাপ্তেন হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল তামসীকে। দলাধিপতির অধিকারের বলে।

তামসী আরো এগিয়ে এল রণধীরের চেয়ার ঘেঁসে। হাসি-কান্না রাগ-বিরাগের ওপারে চলে এসেছে সে। প্রসারিত স্পর্শটা সহজেই অমান্য করে মুখে সান্ত্বনার মেকি হাসি টেনে সে বললে, 'আমাকে যার সত্যিকারের দরকার, আমারও দরকার তাকেই।' বলে রণধীরের

চেয়ারের হাতলটা সে ধরলে শক্ত করে। আত্মস্থিতের মত বললে, 'চেয়ে দেখ, আমি এসেছি।'

উদয়দিগন্তে সে যেন প্রাত্যূষিকা রশ্মিরেখা।

'শালা যে এখনো ঘুমুচ্ছে। এই শালা, ওঠ,' রণধীরের কাঁধ ধরে প্রবল ঝাঁকুনি দিলে তার নিকটের সঙ্গী: 'চেয়ে ত্যাখ, কে এসেছে। নিজে থেকে পছন্দ করেছে তোকে। তোর দরকারে নাকি তারও দরকার।'

'কই?' মাথা তুলে আচ্ছন্ন চোখে তাকালো রণধীর। বললে, 'বাঃ, এই তো, এত কাছে! আর আমি কিনা দূরে-দূরে খুঁজছি।' বলে তামসীর একটা হাত সে গভীর অবলম্বনের মত করে আঁকড়ে ধরল। বললে, 'তোমার নামটি কি বল না।'

'অত আদিখ্যেতায় দরকার নেই।' রাগে কণ্ট্র্যাক্টর-কাপ্তেনের শরীর ভিতরে-ভিতরে জ্বলতে লাগল। হোটেলে নতুন জিনিস আমদানি হয়েছে অথচ দলের মধ্যে প্রথমে তার ভাগে আসবে না। তারই জন্যে রাগ। গলার স্বরে তীব্র ঝাঁজ ফুটে উঠল: 'বলি চেহারা পছন্দ হবে, না, বাতিল করে দিবি?'

'কেমন ধস্কে গিয়েছে চেহারাটা, তাই না? নেশার চোখে ঠিক ধরতে পারছিনা। চেহারা দিয়ে আমার কী হবে? সব চেহারাই সমান। যাঁহা একুশ তাঁহাই একান্ন। আর যাঁহা একান্ন তাঁহাই একুশ।'

'কিন্তু টাকা? টাকার কথা জিগগেস করেছিস?' দাম্ভিক গাম্ভীর্যের সঙ্গে প্রশ্ন করলে কণ্ট্র্যাক্টর।

ফেরেববাজ মেয়ে টাকা নিশ্চয়ই বেশি হাঁকবে। নিজেকে অন্তত কৃত্রিম সম্ভ্রম দেবার জন্যে। যত বেশি বলবে ততই কণ্ট্র্যাক্টরের

আশা। অনায়াসে মুখ ভার করে বলতে পারবে, অত টাকার ক্ষমতা নেই আজকে। নির্বিবাদে নামঞ্জুর হয়ে যাবে রণধীর। এতটুকু প্রতিবাদ করবার জায়গা পাবেনা। পরের দয়ার উপর যে খায় তার আবার প্রতিবাদ কি! সামান্য কটা খুচরো টাকা তাকে না-হয় ভিক্ষে দিয়ে দেবে। রিকশাতে চড়ে আশেপাশের কোনো আটপহুরে শস্তা পল্লীতে গিয়ে আস্তানা গাড়বে।

সত্যিই তো, টাকা? টাকা কত নেবে? রণধীর বিহ্বল চোখে চারদিকে তাকাতে লাগল।

এক হাত হাতের মধ্যে, অন্য হাত পিঠের উপর রেখে রণধীরকে তামসী আকর্ষণ করলে। বললে, 'ওঠো, আমার ঘরে চল। টাকা লাগবে না। আমার কোনো দাম নেই।'

চোখে ঠিক নির্ণয় করতে পাবেনি। সব ছিল অস্পষ্ট ও রেখাহীন। কিন্তু কণ্ঠধ্বনি যেন নিয়ে এল কোন অপূর্ব পরিচয়ের জাদুমন্ত্র। মর্মমূল পর্যন্ত চমকে উঠল রণধীর। বললে, 'তুমি কে?'

ভয় পেল তামসী। বললে, 'আমি কেউ নই। আমি যা আমি তাই।'

তামসীর মাথাটা রণবীব জোর করে নিজের মুখের কাছে টেনে নিয়ে এল। বললে, 'সব ভোঁতা, ঘোলাটে লাগছে। বল, কথা কও, আমার কানে-কানে বল তুমি কে।'

'এখানকার সবাই আমাকে চিনেছে, আর তুমিই শুধু চিনলেনা?' তরল সরলতায় হেসে উঠল তামসী। বললে, 'ছাড়ো, আর কত মাতলামো করবে? আমার সঙ্গে বাইরে চলো, ঠিক চিনতে পারবে। দেখবে ঠিক জায়গায় তোমাকে নিয়ে গিয়েছি।'

রণধীরের নাকে এসে লাগল যেন তামসীর গায়ের গন্ধ—আত্মার গন্ধ।

'চিনেছি।' সহর্ষকণ্ঠে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রণধীর : 'তুমি অসি। বলো, তাই না ? তুমি সেই অসি না ?'

দশদিক ঝলকিত হল মুহূর্তে। হ্যাঁ, আমি মসী নই, আমি অসি। আমি খড়্গধার। আমার প্রখরতাই আমার পবিত্রতা।

তামসী চুপ করে রইল।

তার নমিত চক্ষুকে স্পর্শ করতে চাইল রণধীর। বললে, 'তুমি এইখানে এসেছ ? এই হোটেলে ?'

চোখ তুলল তামসী, নির্ভর-ভরা দুটি গভীর কালো চোখ। 'এইখানে না এলে তোমাকে ধরতাম কি করে ?'

'তুমি কোথায়, কতদূর নেমে এসেছ, অসি।'

'তুমি অত নিচেই তো আমাকে পেতে চাইলে। সমুদ্র তো অত নিচেই থাকে। দেখনি, পাহাড়ের জল কতদূর নেমে আসে সমুদ্রের জন্যে। নিচে থেকেই তো সমুদ্র মহান হয়।'

তামসীর হাত ও কাঁধের উপর শরীরেব ভর রেখে অবশ পায়ে উঠে দাঁড়াল রণধীর। বললে, 'তোমার ঘরে আমাকে জায়গা দেবে ?'

'তোমার জায়গার জন্যেই তো আমার ঘর। যাতে তোমারও জায়গা হয় তেমনি করেই আমার ঘর বাঁধা।'

'তুমি জান না অসি, আমার কত পাপ !'

'জানি বলেই আমার পাপেরও আর সীমা রাখিনি। কিন্তু, কিছু ভয় নেই, চলো। আমার ঘরেই আবার পাপমোচনের মন্ত্র আছে।'

সেদিন যখন এমনি সিঁড়ি দিয়ে নামে, রণধীরের পার্শ্বলগ্ন মেয়েটা কুণ্ঠাক্লিষ্ট হয়ে সরে-সরে যাচ্ছিল। কিন্তু আজ পরিপূর্ণ সমর্পণ অকুণ্ঠকায়ে গ্রহণ করল তামসী। রণাঙ্গন থেকে যেন কোন আহত সৈনিককে নিয়ে যাচ্ছে স্নেহ নিভৃত সেবাশিবিরে।

'মামলাটি মাইরি ভাল ছিল।' পিছনের মাতাল বন্ধুদের একজন বললে।

'চোখ রাখিস একটু। মামলাটি যেন না বেতঁদবিরে মারা যায়।'

ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি চলে এল তারা—তামসী আর রণধীর। রণধীর আর তামসী। যা ছিল ঘর তাই এখন বাড়ি।

ঘর খুলে আলো জ্বালাল তামসী। দড়ির খাটিয়ার উপর পরিচ্ছন্ন বিছানা পাতা। রণধীরের হাত ধরে টেনে এনে বিছানার উপর বসিয়ে দিল। বললে, 'তোমার শরীর সুস্থ নেই, তুমি শুয়ে পড়। ঘুমোও।'

'আর তুমি?'

'আমি ঐ চেয়ারটাতে বসে বাত জাগব তোমার শিয়রে।'

'রাত জাগবে?'

'হ্যাঁ, পাছে আবার পালিয়ে যাও চুপিচুপি।'

'আর পালাবনা। তোমার ঘরে বা গায়ে আর কিছুই নেই যা নিয়ে পালাতে পারি।'

'তোমাকে আর এই ঘর বা ঘরণীর রূপসজ্জা দেখতে হবেনা। আলোটা নিবিয়ে দি।'

'কিছু খাবেনা?'

'তুমি জাননা, কত খেয়েছি আজ। পেট ভীষণ ভরে আছে।'

'আলো নেভাবে যে, অন্ধকারে ভয় করবেনা?'

তামসী মনে-মনে হাসল। বললে, 'আর ভয় কি? আজ তো সব সমান-সমান। কোনোদিকেই আজ আর পাপ-পুণ্য অপমান-অভিমান নেই। ঘর অন্ধকার করে দেব, ভাবব, সত্যিই পেয়েছি কিনা, না, সব অন্ধকারের মতই মিথ্যে?' আলো নিবিয়ে দিল তামসী। 'মাঝে-

মাঝে যদি তন্দ্রা আসে, তন্দ্রা ভেঙে মাঝে-মাঝে তোমাকে স্পর্শ করে দেখব, সত্যিই তুমি কিনা, না, আর-কেউ।'

অনেকক্ষণ বেহুঁসের মত পড়ে ছিল রণধীর।

ডাকলে: 'অসি!'

'কেন?'

'অনেকক্ষণ সুন্দর ঘুমোলাম। কী শান্তি তোমার ঘরে! এত শান্তি পেলে কোথায়?'

'শান্তি?'

'পবিত্রতা। তুমি আমাকে কঠিন মিথ্যা কথা বলেছ, অসি। তোমাব পাড়াটা দরিদ্র হলেও ভদ্র, পরিচ্ছন্ন। আব তোমাব এই ঘর আর বিছানা, তোমার হাতের এই স্পর্শ, পবিত্র তীর্থস্থান। ঘরেব বাতাসটি পর্যন্ত সুস্বাদু। এ কেমন কবে সম্ভব হতে পাবে?'

চুপ করে রইল তামসী।

'অন্ধকার হলেও আমি সব বুঝতে পারছি স্পষ্ট। তুমি এই অন্ধকারের মতই অমল, অকলঙ্ক। আমিই পাপী, কলুষিত। আমরা সমান-সমান নই। আমি অনেক নিচে পডে। অনেক নিচে পডে। তুমি তোমার প্রেমে সেই অনেক নিচেই নেমে এসেছ। হাত ধরে তুলে নিতে এসেছ আমাকে।'

'না, তোমার হাত ধরে সামনে চলতে এসেছি। আমরা চিরদিন সমান-সমান। এক সমতলে। এই সামনে চলাতেই আমাদের মুক্তি।'

'আমার মুক্তি নেই।'

'সমস্ত দাসত্ব থেকেই মুক্তির সাধনা আমাদের—অভ্যাসের দাসত্ব থেকে। কোনো বন্ধনই আমরা মানবনা যা জীবনকে ছোট করে, শীর্ণ করে—'

'আমার সর্বাঙ্গে কাদা—'

'আমি তো দেখি, রক্ত। জীবন সংগ্রামে আহত সৈনিকের আঘাতের চিহ্ন। কিন্তু ভয় কি, নির্মল কাজের মধ্যেই মিলে যাবে আরোগ্য।'

কথাগুলো শুনতেও কেমন নতুন লাগছে। স্নিগ্ধ আবেশে চোখ বুজল রণবীর। বললে, 'আমারও শাপমোচন হবে? তুমি বিশ্বাস করো, অসি?'

'যেমন বিশ্বাস করি আজকের রাত্রি প্রভাত হবে। প্রতিদিন প্রভাতে আমাদের এই পুরোনো পৃথিবী নতুন হচ্ছে। তেমনি করে নতুন হব আমরা। জীবনে নতুন পৃষ্ঠা ওলটাব।'

'আমি—আমিও নতুন হব?'

'হবে। মাটিতে নতুন ঘাস গজায়, গাছে নতুন পাতা আসে। নতুন শিশুর দল তাদের হাসিতে-কলরবে নতুন ভবিষ্যৎ ঘোষণা করে। অহরহ চলেছে এই নতুনের নামজারি। আমরাও নতুনের খাতায় নতুন নাম-পত্তন করব। আমাদের সমস্ত দেহটি নতুন হয়ে উঠবে।'

'তুমি বিশ্বাস কর, অসি? কর?' প্রশ্নটা শোনাল আর্ত-আকুতির মত।

'করি, বিশ্বাস করি।' গভীরনিস্থত শান্তির বাণীর মত শোনাল তামসীকে। 'কাজ করি, ক্লান্ত হই, কূল হারিয়ে ফেলি। আবার এই বিশ্বাসের আলোতে পথ চিনে ঘরে ফিরে আসি। এ আলো নেবে না, কাঁপে না, ক্ষয় হয় না। এ আলোতে জীবনের পরমধন খুঁজে পাই।'

দুজন ধীরে-ধীরে আবার স্তব্ধ হয়ে গেল। শরীরহীন গভীর স্পর্শে সেই বিশ্বাসের তাপ যেন পরস্পরের দেহে সঞ্চার-সঞ্চয় হতে লাগল।

সূর্য উঠছে। বিরাট নভোমণ্ডলে বিপুল সমারোহ পড়ে গিয়েছে।

পুরাতনী পৃথিবী নবনবীনা হচ্ছে। আসছে বৃহদ্ভানু, বিভাবসু। যে লোকসাক্ষী, লোকচক্ষু—যে লোকপ্রকাশক।

ভোরের আলোতে দুজনে পরস্পরের চোখের দিকে তাকাল—নতুন দৃষ্টিতে। নতুন বিশ্বাসের শক্তিতে। মুগ্ধের মত, তৃপ্তের মত, শক্তিশালীর মত। তারপর দুজনের মিলিত দৃষ্টি পড়ল গিয়ে সামনের দেয়ালের দিকে। মহাত্মা গান্ধীর দিকে।

তামসী বললে, 'মানুষে যাঁর মরণহীন বিশ্বাস তাঁকে বিশ্বাস করি।'

এমন যেন প্রত্যাশা করেনি রণধীর। এমন উচ্চারণ, এমন উদ্ঘাটন। কিছুক্ষণ সে নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইল। চেয়ে রইল সেই সৌম্য-সহাস্য সরল-শান্ত আননমণ্ডলের দিকে। তামসীর একটা হাত নিজের ডান হাতের মধ্যে টেনে নিল। চেপে ধরে রইল সবলে। যেন বললে, বিশ্বাস করি।'